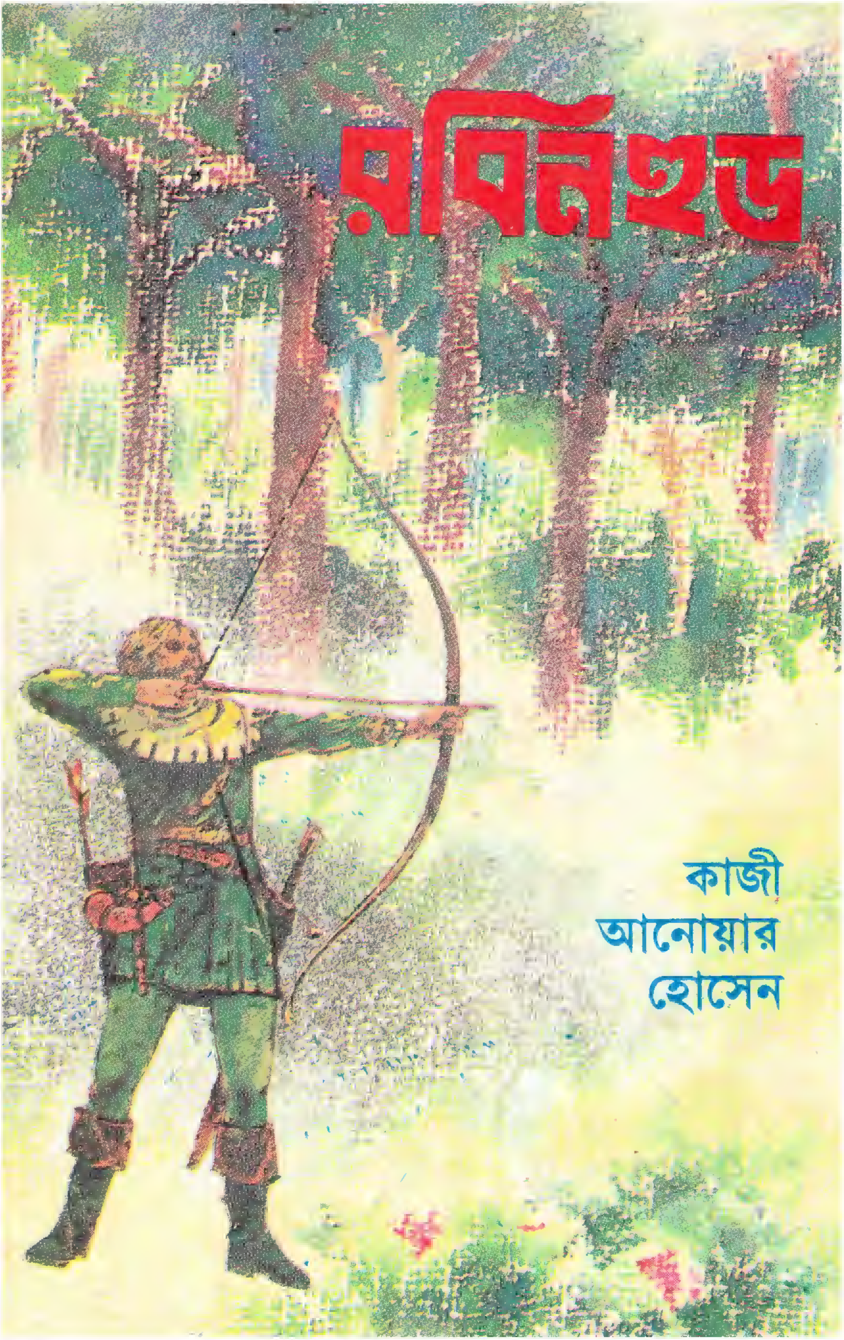
রবিনহুড
কাজী
আনোয়ার
হোসেন

রবিনহুড

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্বঃ লেখকের
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৭৯
প্রজাপতি সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯২, ফেব্রুয়ারি ৯৪
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
(সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান)
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

উৎসর্গ

বাংলাদেশের

মহৎহৃদয় কিশোরদের

জন্যে—

সূচি ঃ

কিভাবে রবিন দস্যু হলো—৭

লিটল জন—১৭

আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড—২৩

উইল স্কারলেট—৩০

মিজ দ্য মিলার—৩৭

নটিংহামের শূটিং ম্যাচ—৪৩

উইল স্টিউটলির ফাঁসী—৫১

শেরউডের ভোজ—৫৯

আবার শেরিফ শেরউডে—৬৬

অ্যালান-এ-ডেল—৭৫

সন্ন্যাসী টাক—৮২

দুখী নাইট—৮৯

সুন্দরী মেরিয়ান—১০১

ঋণ পরিশোধ—১০৬

রানীর সম্মানে—১১৬

পালাচ্ছে রবিন—১২৯

গাই অফ গিসবোর্ন—১৪১

বন্দী হলো রবিন—১৫৩

রাজা এলেন শেরউডে—১৬৬

রবিনের শেষ তীর—১৭২

ভূমিকা

রবিন হুড বলে সত্যিই কি কেউ ছিল?

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যদিও জন্ম-বৃত্তান্ত কিছুই পাওয়া যায় না, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রবিন হুড বলে যে সত্যিই কেউ একজন ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যিই সে অত্যাচারী নর্মান শাসক আর অর্থলোলুপ ধর্মযাজকদের অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দস্যু হয়েছিল, খ্যাতি অর্জন করেছিল গরীব-দুঃখীর বন্ধু আর অত্যাচারীর যম হিসেবে। সেকালে অসংখ্য গান রচিত হয়েছিল তার বীরত্ব ও মহত্ত্বের আশ্চর্য সব কীর্তি-কাহিনী নিয়ে। লোকের মুখে-মুখে ফিরেছে সে-গান কয়েক শতাব্দী ধরে।

সেই শেরউড জঙ্গল আজও আছে ইংল্যাণ্ডের নটিংহামশায়ারে—যদিও লোকালয়ের সম্প্রসারণে অনেক ছোট হয়ে গেছে তার আকার। আজও আছে সেখানে 'ব্লু বোর সরাইখানা'—যদিও আমার বিশ্বাস, এটা আধুনিক কোন ব্যবসায়ীর উদ্যমের ফসল, সেই আদি ব্লু বোর নয়। রবিন হুডের কবর খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার বিশ্বস্ত অনুচর লিটল জনের কবর পাওয়া গেছে বলে দাবি করছে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড। এর মধ্যে ডার্বিশায়ারের হেদারসেজ গ্রামে যে কবরটি পাওয়া যায়, তাতে অস্বাভাবিক লম্বা মানুষের অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব থেকে অনুমান করা যায়, লিটল জন বলেও সত্যিই ছিল কেউ।

কিন্তু তাই বলে এ-বইয়ের প্রতিটি ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্য মনে করার কোন যুক্তি নেই। লোকের মুখে মুখে ঘুরলে গল্পের যা হয়—নিজ নিজ কল্পনার রঙ চড়াতে কসুর করে না কেউ—রবিন হুডের বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছে। অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে এতে—কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা অতিরঞ্জিত, আর কোন্‌টা যে সর্বৈব কাল্পনিক, জানার উপায় নেই আমাদের।

জেনে লাভই বা কি, বলুন? তারচেয়ে আসুন, বাস্তব জটিল জীবনের কর্মব্যস্ততার কোন অবসরে অদ্ভুত এক স্বপ্নের জগতে কিছুক্ষণের জন্যে বিভোর হয়ে হারিয়ে যাই।

কাজী আনোয়ার হোসেন

১০-১২-৭৯

এক

কিভাবে রবিন দস্যু হলো

গভীর গহীন এক বিশাল জঙ্গল। নাম শেরউড ফরেস্ট। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে দ্রুত, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে এক যুবক। পরনে সবুজ পোশাক, মাথায় নীল রঙের হুড, কাঁধে প্রকাণ্ড এক ধনুক, পিঠের তূণে বিশ-পঁচিশটা তীর। চলার ছন্দে দুলছে কোমরে ঝুলানো খাপে পোরা ছোট্ট ছোরাটা।

পথের দুপাশে দাঁড়ানো প্রকাণ্ড উঁচু ওক গাছের ফাঁক দিয়ে জঙ্গলের বেশ কিছুটা অংশ দেখা যায়। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো যুবক। একদল হরিণ ছুটে চলে যাচ্ছে। চট্ করে একটা হাত চলে গেল ওর ধনুকের কাছে। অপর হাতে তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিতে গিয়েও সামলে নিল সে নিজেকে। না। এটা রাজার সংরক্ষিত জঙ্গল, ওগুলো রাজার হরিণ। ওগুলোর একটা মারলে চোখ উপড়ে নেয়া হবে, কান কেটে দেয়া হবে, এবং আরও এমন সব ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়া হবে যার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল। বেআইনী কিছু করে বসা ঠিক হবে না।

আবার হাঁটতে শুরু করলো যুবক। কিছুদূর এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। ওর জানা আছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিছুটা এগোলে অনেকখানি ঘুরপথ এড়ানো যাবে। তাছাড়া জঙ্গল ওর ভাল লাগে। ভাল লাগে জংলী পাখির কল-কাকলি। এদিকটায় এখানে-ওখানে হলি আর হেজেলউডের ঝোপঝাড়। পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে, হঠাৎ কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'অ্যাই! দাঁড়াও! রাজার জঙ্গল মাড়াচ্ছো যে? কে তুমি? কোথায় যাওয়া হচ্ছে অমন বীরদর্পে?'

ঘুরে দাঁড়ালো যুবক। দেখলো পাঁচ-ছয়জন লোক বসে আছে একটা মস্ত ওক গাছের নিচে, পান-ভোজনে ব্যস্ত। ওদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়েছে ওকে দেখে। এক নজরেই চিনতে পারলো যুবক এদের। জঙ্গল-রক্ষী। সসম্ভ্রমে সালাম করলো সে।

'আমার নাম,' মৃদু হেসে বললো যুবক, 'রবার্ট ফিযুথ। যদিও বেশির ভাগ লোক আমাকে ডাকে রবিন হুড বলে। যাচ্ছি নটিংহাম শহরে।'

'কেন? কি কাজ তোমার নটিংহামে?'

'ওখানকার শেরিফ একটা শূটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক বড় বড় তীরন্দাজ আসছেন। আমিও চলেছি আমার তীর-ধনুক নিয়ে।'

হো হো করে হেসে উঠলো লোকটা। 'বলে কি পুঁচকে ছোঁড়া! বড়দের একটা ধনুক কাঁধে নিয়ে বেড়ালেই কি তীরন্দাজ হওয়া যায়?' আবার হাসলো একপেট। 'ও ধনুকে ছিলা পরাবার ক্ষমতা আছে নাকি তোমার? লক্ষ্যভেদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'আরে দূর!' বলে উঠলো ভোজনরত একজন গার্ড। 'দুধের বাচ্চা···ধনুকটা একটু বাঁকা করেই দেখাক না খোকন!'

টিটকারি শুনে রাগে লাল হয়ে গেল রবিনের মুখটা। জ্বলে উঠলো দুই চোখ।

'বেশ তো!' বললো সে, 'তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল তীরন্দাজ, এসো না, বাজি হয়ে যাক। দেড়শো গজের মধ্যে যে-কোন লক্ষ্য ভেদ করে দেব আমি।'

'কি বাজি ধরবে? কত আছে তোমার কাছে, ছোকরা?' সকৌতুকে জানতে চাইলো দাঁড়ানো লোকটা। হাতে ধরা রূপোর পাত্র থেকে মদ খেল এক ঢোক। রবিন বুঝলো, এই লোকটাই রক্ষীদের দলনেতা।

'বিশ মার্ক,' জবাব দিল সে।

'বেশ!' ভুরু কুঁচকে উঠলো দলনেতার। বোঝা গেল রেগে গেছে সে এই অল্পবয়েসী যুবকের ঔদ্ধত্য দেখে। হঠাৎ একটা আঙুল তুললো সে বহুদূরের একটা ঝোপের দিকে। 'ঐ যে তোমার টার্গেট। লাগাও দেখি?'

রবিন চেয়ে দেখলো কোত্থেকে দৌড়ে এসে ঝোপটার পাশে থমকে দাঁড়িয়েছে একদল হরিণ। টের পেয়েছে কাছে-পিঠে মানুষের উপস্থিতি। সবার আগে রয়েছে একটা বিশাল শিং-অলা পুরুষ হরিণ। নাক ওপরে তুলে গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করছে, অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে সামনের একটা পা ঠুকছে মাটিতে।

কোন কথা না বলে ধনুকটা নামাল রবিন কাঁধ থেকে, বাঁকা করে ছিলা পরালো তাতে, তারপর তূণ থেকে বেছে বের করলো পছন্দসই একটা তীর। ওর সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি দেখে টের পেয়ে গেল সবাই, যে-সে লোক নয় এই যুবক, অল্পবয়সী হলে কি হবে, প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে ওর গায়ে. আর রয়েছে তীর-ধনুকের ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা। বাঁকা হয়ে গেল বিশাল ধনুকটা। ডান হাতটা চলে এসেছে কানের পাশে। পরমুহূর্তে মৃদু ঝংকার উঠলো ছিলায়। বাতাসে শিস কেটে ছুটলো তীর। সবাই দেখল, লাফিয়ে শূন্যে উঠলো বড় হরিণটা, তারপর ধড়াশ করে পড়লো মাটিতে। ঠিক হৃৎপিণ্ডে গেঁথে রয়েছে তীরটা।

কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে রইলো বনরক্ষীর দল, তারপর প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন উঠলো ওদের মধ্যে। হাসিমুখে রক্ষী-প্রধানের দিকে ফিরলো রবিন। হাত বাড়ালো।

'দিন। বিশ মার্ক পাওনা হয়েছি আমি।'

বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো লোকটার মুখে। বললো, 'দিচ্ছি। তবে বিশ মার্ক নয়। তোমার আসল পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব আমি।' কুৎসিত চাতুরীর একটা ভাব খেলা করছে ওর চোখেমুখে। 'তোমার কি পাওনা হয়েছে জানো? আইন ভঙ্গের উপযুক্ত সাজা। রাজার হরিণ মেরেছো, নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার এই অপরাধের শাস্তি কি?

সেটাই দেয়া হবে তোমাকে।' নিজের লোকদের ইঙ্গিত করলো সে, 'ধরো, ধরো ব্যাটাকে!'

মুহূর্তে বুঝে নিল রবিন ওদের কথায় রেগেমেগে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কি ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে। ছুটে পালাবার জন্যে পা বাড়ালো, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর দু'জন জঙ্গল-রক্ষী, তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো আরো দু'জন। মাটিতে পেড়ে ফেলে ঠেসে ধরা হলো ওকে, বেঁধে ফেলা হলো হাত-পা।

'যাক, হাতে নাতে ধরা গেল এক হারামজাদাকে!' বললো রক্ষী-প্রধান। 'হরিণ চুরি যাচ্ছে, অথচ বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও চোর ধরতে পারছি না–খেপেই উঠছিল শেরিফ। আজ শান্ত করা যাবে তাকে।'

কথা শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো রবিনের। নিজের কর্মতৎপরতার প্রমাণ দেখাবার জন্যেই ওকে হরিণ মারার ফাঁদে ফেলেছে লোকটা। এখন ওকে নটিংহামে নিয়ে গিয়ে চালান দিয়ে দেবে হরিণ-চোর হিসেবে। নর্মান শেরিফের কাছে কাকুতি মিনতি করে যে কোন লাভ হবে না, ভাল করেই জানা আছে ওর। ওর কথা কানেই তুলবে না সে। ও চোর হোক বা না হোক, কিছু এসে যায় না অত্যাচারী নিষ্ঠুর শেরিফের–দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার সুযোগ সে কোনমতেই হাতছাড়া করবে না, যাতে ওর ভয়াবহ পরিণাম দেখে সাবধান হয়ে যায় অন্য সব স্যাক্সন প্রজা।

রক্ষী-প্রধানের কথা শুনে হৈ হৈ করে উঠলো সব ক'জন রক্ষী। প্রস্তাবটা খুবই পছন্দ হয়েছে তাদের। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলো হরিণটার চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়া দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ছোকরাকে শহরে। ব্যাস, লেগে গেল ওরা কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রবিনকে হরিণের উত্তপ্ত পিচ্ছিল চামড়ার খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে বেঁধে ফেলা হলো বাইরে থেকে। মাথাটা শুধু বেরিয়ে আছে ঠিক যেখানে হরিণের মাথা ছিল সেই জায়গা দিয়ে।

রাগে দুঃখে জ্বলছে রবিনের কলজেটা। এইসব নীচ বিশ্বাসঘাতকদের কাছে সে প্রমাণ করতে গিয়েছিল ধনুর্বিদ্যার দক্ষতা! চোখের সামনে ভেসে উঠছে নটিংহামের বাজারটা। নিজের চোখে দেখেছে সে ওখানে এক হরিণ-চোরের শাস্তি। বেচারা ক্ষুধার জ্বালায় মেরেছিল হরিণটা। লোকটার যন্ত্রণাকাতর চেহারা, গোঙানি আর নিরুপায় ছটফটানি মনে আছে স্পষ্ট। সেই একই ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে ওর নিজের কপালে, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠছে সে বারবার। বাকি জীবনটা অন্ধ আর পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার কথা কল্পনাও করা যায় না। বারবার শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বাঁধন আলগা তো হলোই না, বরং এঁটে বসলো আরও।

'এখন এ ব্যাটাকে শহরে নিয়ে যাওয়ার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল একজন গার্ড।

মাথা চুলকালো রক্ষী-প্রধান, তারপর বললো, 'আধ মাইল দূরে জনা তিনেক স্যাক্সন কাঠুরেকে কাঠ কাটতে দেখেছিলাম না? তুমি এক কাজ করো, ডিকন। দৌড়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো ওদের। টানা গাড়িটাও সাথে করে আনতে বলবে, যাও।'

ছুটে চলে গেল ডিকন। খানিক বাদেই ফিরে এলো টানাগাড়ি সহ কাঠুরেদের নিয়ে।

'তোলো এই ব্যাটাকে গাড়িতে,' হুকুম করলো রক্ষী-প্রধান কাঠুরেদের উদ্দেশে। 'তারপর টেনে নিয়ে চলো শহরে।'

তিনজন কাঠুরের মধ্যে দুজন দ্রুত এগিয়ে এলো হুকুম পালন করতে, তৃতীয়জন এগোলো অনেকটা যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে। পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত নিম্নবিত্ত লোক এরা। প্রথম দুজন বৃদ্ধ, কিন্তু তৃতীয়জন বছর তিরিশেক বয়সের শক্ত সমর্থ এক

যুবক। কেউ কোন কথা বললো না, তিনজন মিলে রবিনকে টানাগাড়িতে তুলে নিয়ে চললো শহরের দিকে।

আধ মাইলের মত গিয়ে একটা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পড়লো গাড়ি। জোরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে, কাত হয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক, রবিনের বস্তাবন্দী শরীরটা অসহায় ভঙ্গিতে গড়িয়ে গিয়ে একবার ধাক্কা খাচ্ছে গাড়ির এদিকে, একবার ওদিকে। আর তাই দেখে হাসিতে ফেটে পড়ছে জঙ্গল-রক্ষীরা।

গাড়ির পিছন পিছন হাসাহাসি করতে করতে হাঁটছে ওরা, হঠাৎ একলাফে সামনে এগিয়ে গেল রক্ষী-প্রধান। ধনুকটা মাথার ওপর তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলো কম-বয়েসী কাঠুরের কাঁধের ওপর।

'অ্যাই, হারামজাদা!' চেঁচিয়ে উঠলো রক্ষী-প্রধান, 'ঠিক মত টানছিস না কেন? স্যাক্সনী বেয়াড়াপনা দেখানো হচ্ছে, না?' এই বলে দমাদম আরো কয়েকটা কিল ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার ঘাড়ে মাথায়।

রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যুবক কাঠুরে, চট্ করে ডান হাতটা চলে গিয়েছিল ওর কোমরে গোঁজা ছোরাটার বাঁটের ওপর, কিন্তু বৃদ্ধ একজনের সাবধানবাণী কানে যেতেই সরিয়ে নিল হাতটা।

'উইল, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো, বাপ!' কাঁপা গলায় বলে উঠলো বৃদ্ধ, 'শান্ত হও। জঙ্গল-রক্ষীদের রাগানো ঠিক না।'

'ঠিকই বলেছে বুড়ো হাবড়া,' কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো রক্ষী-প্রধান। 'আমাদের রাগিয়ে দিলে প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা আছে। হয়েছে এবার। জান-প্রাণ দিয়ে টানো তো এখন, স্যাক্সন কুত্তার বাচ্চারা।' আবার এক পশলা কিল ঘুসি বর্ষণ করলো লোকটা তরুণ কাঠুরের ঘাড়ে মাথায়। বাধা দিল না তরুণ, পিঠ বাঁকা করে ঘাড় গুঁজে সহ্য করে নিল নির্যাতন, একান্ত বাধ্য ভৃত্যের ভঙ্গিতে আবার টানতে শুরু করলো গাড়ি। কিন্তু রবিন লক্ষ্য করলো, ধক্ ধক্ করে জ্বলছে যুবকের চোখ।

বেশ অনেকদূর এগোবার পর একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল ছোট্ট একটা গ্রাম। একটা বাড়ির দরজার দু'পাশে লতা-ঝোপ দিয়ে সাজানো।

'সরাইখানা!' খুশি হয়ে বললো একজন রক্ষী। 'এখানে থেমে দু'ঢোক মদ খেয়ে নিলে কেমন হয়? উহ্, পিপাসায় একেবারে শুকিয়ে গেছে বুকটা।'

একবাক্যে রাজি হয়ে গেল বাকি সবাই। ছোট্ট সরাইখানার সামনে থামানো হলো টানাগাড়ি। নিজেদের জন্যে মদের অর্ডার দিল রক্ষীরা।

সরাইখানার সামনে মদের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিল রক্ষীরা, এমনি সময় ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঐ দেখো কারা আসে!'

দেখা গেল, আরো পাঁচজন জঙ্গল-রক্ষী আসছে এই দিকেই, তাদের সামনে হাঁটছে দু'জন হাত বাঁধা লোক।

'বাহ্ বাহ্!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো রক্ষী-প্রধান। 'জমেছে ভাল। ওরাও দুটো ডাকাত ধরেছে দেখা যাচ্ছে! মোট হলো তিনটে...খুশিতে নাচবে আজ শেরিফ! ওহে, কিভাবে ধরলে ওগুলোকে?'

ওরা জানে এই জঙ্গলেরই কোথাও কয়েকজন দুর্ধর্ষ দস্যু থাকে, রাজার হরিণ মেরে খায়, পথিকদের সর্বস্ব লুট করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওদের কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। কিভাবে ধরা পড়লো জানার আগ্রহে সবাই এগিয়ে গেল অগ্রসরমান দলটির দিকে। শক্ত বাঁধন কেটে যে রবিন হুড পালাতে পারবে না, সে ব্যাপারে ওরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত; আর অনুমতি ছাড়া স্যাক্সন কাঠুরেরা যে এক পা নড়তে সাহস পাবে না, এটাও জানা কথা; কাজেই এদিকে লক্ষ্য রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করলো না।

কিন্তু ওরা কয়েক পা এগোতেই এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ছুট লাগালো বুড়ো

কাঠুরে, যে সাবধান করেছিল তরুণকে। দুটো বাড়ির মাঝখানের সরু রাস্তা ধরে পাখির মত উড়ে যাচ্ছে সে। দ্বিতীয় বৃদ্ধ হাঁ করে চেয়ে ছিল রক্ষীদের দিকে, টেরও পেল না কিছু, বোকার মত হাসাহাসি দেখছে ওদের, নিজেও হাসছে।

যুবক উইল ওর বাপের পিছন পিছন ছুটতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে চাইলো রবিনের দিকে। কথা বললো না রবিন, পাছে শুনে ফেলে রক্ষীরা, কিন্তু মিনতি ফুটে উঠলো ওর চোখের দৃষ্টিতে। এক হাঁটু ভাঁজ করে ঠেলাগাড়ির পাশে বসে পড়লো উইল, কোমর থেকে ছোরাটা বের করে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কেটে দিল সমস্ত বাঁধন।

মুক্ত হলো রবিন। ওর ধনুক আর তীরভরা তূণ রাখা ছিল গাড়িরই একপাশে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অপরাধের প্রমাণ হিসেবে শেরিফকে দেখানোর জন্যে। চট্ করে সেগুলো হাতে তুলে নিয়েই ছুটলো সে উইলের পিছন পিছন। উইল ততক্ষণে বেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সরু রাস্তাটা ধরে।

'হব্! হব্!' দৌড়াতে দৌড়াতেই চেঁচিয়ে উঠলো উইল। 'দৌড়াও! পালাও শিগগির!'

ডাকটা কানে যেতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন এদিকে ফিরলো বৃদ্ধ কাঠুরে, সঙ্গী-সাথী সব হাওয়া হয়ে গেছে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ, চোখ তুলেই দেখতে পেল দৌড়াচ্ছে উইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ উইলের ডাকটা রক্ষীদের কানেও পৌছালো। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো রক্ষী-প্রধান, মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়লো একটা।

'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে হারামীরা!' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'বাঁধন খুলে দিয়েছে বন্দীর। ছোটো, ছোটো সবাই! ধরে নিয়ে এসো ওদের, জীবিত বা মৃত।'

কথা বলতে বলতেই একটা তীর লাগিয়ে ফেলেছে সে তার ধনুকে, কান পর্যন্ত টেনে এনেছে ছিলাটা। এতক্ষণে হুঁশ ফিরে পেয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে হব্, বুঝতে পেরেছে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়াই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু বুড়ো মানুষ, ধীর গতি, আড়ালে সরে যাওয়ার আগেই প্রচণ্ড বেগে ছুটে এলো তীর, ঘ্যাচ করে বিঁধলো এসে পিঠে। হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়লো সে মাটিতে, আর নড়লো না। থির থির করে কাঁপছে শুধু পিঠে বেঁধা তীরটা।

ছোট্ট একটা আঙিনায় এসে পৌছলো রবিন। ওপাশের কাঠের দেয়ালটা টপকাচ্ছে উইল। বৃদ্ধ কাঠুরেকে দেখা যাচ্ছে না। দৌড়ে গিয়ে দেয়াল টপকালো সে-ও। সামনে বেশ কিছুদূর খোলা মাঠ, তারপর জঙ্গল। দেখা গেল, দুর্বল পায়ে জঙ্গলের দিকে ছুটছে বুড়ো, তার কিছুটা পিছনে উইল।

প্রাণপণে ছুটলো রবিন। জঙ্গলের কাছাকাছি এসেই চিৎকার শুনে তাকাল পিছন ফিরে। পাঁচ ছ'টা মাথা দেখা যাচ্ছে কাঠের দেয়ালের ওপাশে। দেয়াল টপকাচ্ছে ওরা। এক দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। দেখলো কিছুদূর এগিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে উইল।

'এদিকে! এদিকে!' হাঁক ছাড়লো উইল, ছুটলো আবার। কিছুদূর এগিয়েই ছুটন্ত বৃদ্ধকে দেখতে পেল রবিন। মিনিট দশেক দৌড়ে একটা জলা মত জায়গায় এসে পৌছলো ওরা। জলাটা বিপজ্জনক চোরা-কাদায় ভর্তি। সাবধানে পা ফেলে ফেলে বৃদ্ধের পিছন পিছন ওপারে গিয়ে শক্ত জমিতে উঠলো ওরা দুজন। আরো কিছুদূর এগিয়ে একটা বিশাল ওক গাছের নিচে বসে পড়লো বৃদ্ধ, বিশ্রাম না নিয়ে আর এক পা-ও এগোনো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

'হব্ কোথায়?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলো বৃদ্ধ।

'মারা গেছে,' বললো উইল। 'দেরি করে ফেলেছিল। দেখলাম, একটা তীর এসে বিঁধলো ওর পিঠে।'

'হ্যাঁ, রক্ষীদের নেতার ছোঁড়া তীর, আমি দেখেছি,' বললো রবিন।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো বৃদ্ধ। 'ওদের সামনে পড়লে আমাদেরও ঐ একই অবস্থা হবে। উইলের হাত যখন ছোরার বাঁটে চলে গিয়েছিল, আমি তো ভেবেছিলাম তখনই খুন করবে লোকটা ওকে। করতো, যদি সেই সময়ে গাড়ি টানার জন্যে ওর প্রয়োজন না থাকতো। বড় নিষ্ঠুর লোক!'

'অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছিলাম আমি তখন,' বললো উইল। 'ওরকম অন্যায় মার হজম করা কঠিন।'

'হুঁ!' চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললো বৃদ্ধ, 'এক সময় আমরাই ছিলাম জমির মালিক। নর্মানরা অন্যায়ভাবে দখল করে নিল সব। এখন এমন অবস্থা হয়েছে, আমরা যেন কুকুরের চেয়েও অধম। যাই হোক, যা ঘটে গেল, এখন আর আমাদের গ্রামে ফেরা সম্ভব নয়। লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের জঙ্গলের মধ্যে। নইলে ধরে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসীকাঠে।'

'আমাকে হয়তো ফাঁসীকাঠে ঝোলাতো না,' বললো রবিন। 'কিন্তু তার চেয়েও খারাপ অবস্থা করে ছাড়তো ওরা নটিংহামে নিয়ে গিয়ে। আমার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে তুমি মস্ত বড় বন্ধুর কাজ করেছ, উইল।' উইলের একটা হাত ধরলো রবিন, 'তোমাকে ধন্যবাদ। অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না!' বললো উইল। 'দু'চারটে পোঁচ দিয়েছি ছোরার, এর বেশি তো কিছু নয়। কিন্তু তুমি, ভাই, কি করে ধরা পড়লে ওদের হাতে? কি দোষ করেছিলে?'

সব খুলে বললো রবিন। শুনে ভুরু কুঁচকে গেল কাঠুরেদের। উইল বললো, 'কী নিষ্ঠুর, আর ভয়ঙ্কর! ওদের নীচ কৌশল একের পর এক ফাঁদে ফেলে চলেছে আমাদের সবাইকে।'

উঠে দাঁড়ালো বুড়ো। 'যাক, ওদের নাগালের বাইরে আমরা এখন। যতদিন পারা যায়, আমাদের চেষ্টা করতে হবে ওদের আওতার বাইরে থাকার। এসো আমার সাথে, চলো, আরও নিরাপদ জায়গায় সরে যাই।'

কিন্তু নড়লো না রবিন।

'বাকি দু'জন বন্দীর জন্যে খারাপ লাগছে,' বললো সে। 'নটিংহামে একবার নিয়ে গেলে ওদের কপালে যে কি ঘটবে বোঝাই যায়।'

'পরিষ্কার,' বললো উইল। 'একেবারে পানির মত। অথচ এরাও কিন্তু আমাদেরই মত স্যাক্সন। নর্মানদের নির্যাতনে অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে দস্যুবৃত্তি। জমিজমা...'

'সব হারিয়েছে,' কথার মাঝখানেই বলে উঠলো বুড়ো। 'অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাধ্য হয়েছে ওরা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিতে। কী জীবন! জঙ্গল-রক্ষীদের তাড়া খেয়ে বনে বাদাড়ে পালিয়ে বেড়ানো...ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি!'

'ওরা যে-পথে নটিংহামে যাবে, ওদের আগেই সেই পথের কোথাও পৌছানো সম্ভব?' উইলের দিকে ফিরে জানতে চাইলো রবিন।

'তা সম্ভব,' বললো উইল। 'কিন্তু লাভ কি তাতে? একদল জঙ্গল-রক্ষীর বিরুদ্ধে কি করতে পারবে তুমি একা?'

'ঠিক কি করতে চাই তা আমি নিজেও জানি না এখনও,' বললো রবিন। 'তবে ওদের সাহায্য করার জন্যে ভেতরটা ছটফট করছে। তীর-ধনুকে আমার হাত ভাল। যাই তো আগে, তারপর একটা না একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই। তাছাড়া চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?'

'ঠিক বলেছো, বন্ধু,' বললো উইল। 'চলো, আমি তোমাকে পথ দেখাবো। আব্বা, তুমি চলে যাও আমাদের সেই জায়গায়। সেই বুড়ো ওক গাছের নিচে দেখা হবে।'

জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বুড়ো, রবিন রওনা হলো উইলের পিছন পিছন

অন্য এক পথে।

মিনিট বিশেকের মধ্যেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি এগিয়ে সেই ছোট্ট গ্রামটার কাছে এসে পৌঁছলো ওরা অন্যদিক থেকে। রাস্তার ধারের একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিতেই দেখা গেল, ঠিক সময় মতোই পৌঁছেছে ওরা, বন্দী দু'জনকে সাথে নিয়ে মাত্র রওনা দিয়েছে রক্ষী-বাহিনী। টানাগাড়িটা পড়ে আছে যেখানে ছিল সেখানেই। ওর থেকে সামান্য কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে হবের মৃতদেহ, যেমন ছিল তেমনি। লাশটার সৎকারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায়নি ওরা, যেন ওটা কুকুরের লাশ।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রবিনের। চাপা গলায় শুধু বললো, 'প্রতিশোধ!'

রবিনের মুখের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালো উইল, কিন্তু কিভাবে সেটা নেয়া সম্ভব মাথায় ঢুকলো না ওর।

ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলো রবিন, তারপর বললো, 'এই রাস্তা কোথায় কিভাবে বাঁক নিয়ে কি ধরনের এলাকা দিয়ে শহরে পৌঁছেছে বর্ণনা করতে পারবে?'

শুরু করলো উইল স্টিউটলি, কিন্তু একটু পরেই হাত তুলে থামিয়ে দিল ওকে রবিন। 'ব্যাস, ব্যাস। পেয়ে গেছি আমার পছন্দসই জায়গা। সমতল খোলা জায়গা বললে না? ওইখানে নিয়ে চলো আমাকে। মনে রেখো, পৌঁছতে হবে ওদের আগেই।'

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দ্রুতপায়ে এগোলো ওরা। যখন পৌঁছলো তখন খোলা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে পৌঁছে গেছে রক্ষী দল। জঙ্গলের মধ্যে উইলকে অপেক্ষা করতে বলে পরিষ্কার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো রবিন।

'খবরদার!' হাঁক ছাড়লো সে, 'বন্দীদের ছেড়ে দাও, নইলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে!'

প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলো না রক্ষী-প্রধান। দুঃসাহস আর কাকে বলে! খোলা জায়গায় একা দাঁড়িয়ে এতগুলো লোককে ধমক দিচ্ছে এক পুঁচকে ছোঁড়া! কোন জবাব দিলো না সে। ওর একমাত্র চিন্তা, জঙ্গলের আড়ালে আবার পালিয়ে যাওয়ার আগেই করতে হবে যা করার। পিঠ থেকে ধনুকটা নামালো সে, একটা তীর লাগিয়ে গায়ের সব জোর দিয়ে টানলো ছিলা, তারপর ছাড়লো। কিন্তু দূরত্বটা এতই বেশি যে রবিনের কাছে পৌঁছলো না তীর, গজ বিশেক বাকি থাকতেই বিঁধলো মাটির বুকে।

বিশাল ধনুকটা চলে এসেছে রবিনের হাতে। তূণ থেকে একটা তীর বের করে পরালো ছিলায়। পরমুহূর্তে ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে ছুটলো তীর। ভয়ানক এক আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো রক্ষী-প্রধান, দুই হাতে টেনে বের করার চেষ্টা করছে গলা দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে আধ হাত বেরিয়ে যাওয়া তীরটা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রক্ষীরা, তাজ্জব হয়ে দেখছে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা, ছানাবড়া হয়ে গেছে চোখ। এমনি সময় আবার ভেসে এলো রবিনের উদাত্ত কণ্ঠ, 'ছেড়ে দাও বন্দীদের! নইলে একে একে মারা পড়বে সবাই!'

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে দ্বিতীয় তীর ছুঁড়লো রবিন। দু'জন রক্ষী একজন বন্দীকে ধরে রেখেছিল দু'পাশ থেকে, তীরটা সোজা এসে বিঁধলো ওদের একজনের কাঁধে। পরমুহূর্তে উড়ে এলো তৃতীয় তীর, বিঁধলো দ্বিতীয় রক্ষীর কাঁধে। বসে পড়লো দু'জন মাটিতে—চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। সবাই বুঝে নিল, বন্দীদের ধরে রাখার চেষ্টা করলে কারো রক্ষা নেই আজ।

অকুতোভয় যুবকটির অব্যর্থ লক্ষ্য আতঙ্কের সৃষ্টি করলো রক্ষীদের মধ্যে। যে দু'জন দ্বিতীয় বন্দীকে ধরে রেখেছিল এক লাফে সরে গেল তারা দু'জন দু'পাশে। ওদের এই আতঙ্ক সংক্রামিত হলো আরো দু'তিনজনের মধ্যে—দৌড় দিল তারা। তাই দেখে

গোটা দলের মধ্যে সঞ্চারিত হলো তীব্র প্রাণভীতি, যে যেদিকে পারলো, ছুটলো ওরা তীরবেগে। এছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিল না ওদের, আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করছে দুঃসাহসী যুবক, অথচ ওরা জানে, ওদের তীর পৌঁছবে না অতদূর।

'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!' ঝোপের আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে এলো উইল স্টিউটলি। 'আশ্চর্য, রবিন হুড! দারুণ তোমার হাত! এবার আমার কাজ সেরে ফেলি আমি।' কোমর থেকে ছোরাটা টান দিয়ে বের করে নিয়ে ছুটলো সে বন্দীদের দিকে। অল্পক্ষণেই দৌড়ে ফিরে এলো সদ্য-মুক্ত বন্দীদের সাথে নিয়ে।

মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত দুই দস্যু হাজার বার করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো রবিনের কাছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে খুশি আর ধরে রাখতে পারছে না কিছুতেই। কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবে, খুঁজে পাচ্ছে না ভাষা, আরো কিছু বলা দরকার মনে করে পাগলের মত বকে চলেছে। চুমো খাচ্ছে ওর হাতে।

'এবার? এবার কি করবো আমরা?' জানতে চাইলো উইল। 'জঙ্গল-রক্ষীরা আরো দলবল জুটিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজবে আমাদের। ওদের হাতে ধরা পড়লে...'

'ঠিক বলেছো,' বলে উঠলো একজন দস্যু। 'আমাদের সরে পড়া উচিত।'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। পা বাড়ালো সামনে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো উইল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে একটা বিশাল ওক গাছের নিচে দেখা পেল ওরা বুড়ো স্টিউটলির। সব ঘটনা শুনে বৃদ্ধ বললো, 'এই অঞ্চলে আর থাকা যাবে না। জঙ্গলের শেষে ওই ওদিকে আমার মেয়ের বাড়ি, ওখানেই লুকাবো আমি। তুমি কি ভাবছো, উইল?'

'আমি জঙ্গলেই থেকে যাব,' বলল উইল। 'আজ থেকে দস্যু হয়ে গেল রবিন হুড। আমি তার অনুচর।'

বিশাল ধনুকের ওপর ভর দিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল রবিন চুপচাপ। দস্যু! দস্যু রবিন হুড! কথাটা চমকে দিল ওকে। ধক্ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। পরমুহূর্তে কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করলো সে। সত্যিই তো, আজ সে যা করছে তার ফলে তাকে দস্যু বলে ঘোষণা করবে শেরিফ। ওর মাথার দাম ধরা হবে কয়েকশো পাউণ্ড। জঙ্গল-রক্ষী খুন করেছে সে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই আর। এখন থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে দস্যুর জীবন কাটাতে হবে ওর। চারপাশে চাইলো রবিন। বিশাল সব গাছের শাখা দুলছে মৃদু বাতাসে, রোদ লেগে চিকচিক করছে পাতাগুলো, এখানে ওখানে ঝোপ-ঝাড়-লতা, কোথাও ঘন, কোথাও হালকা—অপূর্ব সুন্দর লাগলো ওর সবকিছু। প্রজাপতির বিচিত্র রঙ, পাখির মিষ্টি শিস আশ্চর্য এক আনন্দের জোয়ার আনলো ওর মনে—মুক্তির আনন্দ। 'বাহুবল আর বুদ্ধির জোরে রক্ষা করবো নিজেকে,' মনে মনে বললো রবিন। 'মুক্ত স্বাধীন প্রাণ-চঞ্চল জীবন। নটিংহামের কারাগার বা ফাঁসীকাঠের চেয়ে অনেক অনেক ভাল।' মনটা হালকা হয়ে গেল ওর। আবার তাকালো চারপাশে—কেমন হবে জীবনটা ওর এখানে?

'আমার নাম মাচ,' বললো দস্যুদের একজন। 'চলো না, রবিন, আজ থেকে তুমি আমাদের একজন হবে?'

ক্ষতি কি? একটা দলের সাথে থাকতে পারলে তো ভালই। রাজি হয়ে গেল রবিন। রওনা হলো ওরা। ঘন্টা দুয়েক একটানা হাঁটার পর বিরাট এক ওক গাছের নিচে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা দেখা গেল। দাঁড়িয়ে পড়লো মাচ। কোমরে ঝুলানো একটা শিঙা মুখে তুলে ফুঁ দিল তাতে। সাথে সাথেই উত্তর এলো কাছাকাছি কোথাও থেকে, কিন্তু দেখা গেল না কাউকে। আরো তিনশো গজ এগিয়ে গেল মাচ তার সঙ্গীদের নিয়ে। দেখা গেল, একটা পাথুরে দেয়ালের পাশে বেশ অনেকটা জায়গা ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। দেয়ালের কাছাকাছি পৌঁছতেই থেমে দাঁড়াবার হুকুম দেয়া

হলো, আড়াল থেকে জানতে চাওয়া হলো ওদের পরিচয়। জবাব দিল মাচ। মাচের গলার আওয়াজ পেয়েই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একজন দীর্ঘদেহী লোক, তার পিছনে তাগড়া জোয়ান ছয়জন দস্যু। সবার হাতে তীর-ধনুক।

মাচ আর তার সঙ্গীকে দেখতে পেয়েই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। ওদের বন্দী হওয়ার খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে ওদের কানে।

'ফিরে এসেছে!' চিৎকার করে উঠলো একজন। 'মাচ আর ওয়াট ফিরে এসেছে!'

'কিভাবে?' চেঁচিয়ে উঠলো আরেকজন। 'কিভাবে ছুটলে ওদের হাত থেকে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব বলছি,' দুই হাত তুলে সবাইকে থামতে বললো মাচ। 'এই যুবক উদ্ধার করেছে আমাদের। এতবড় দুঃসাহসী বীর, আর এত নিপুণ তীরন্দাজ জীবনে দেখিনি আমি।' এই বলে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো সে সবাইকে। রবিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো প্রত্যেকে, বার বার করে ধন্যবাদ জানাল ওদের প্রিয় সঙ্গীদের উদ্ধার করার জন্যে।

সেদিনই সন্ধ্যার পর আগুনের ধারে গোল হয়ে বসে সবাই হরিণের মাংস আর এল (এক ধরনের মদ) দিয়ে নৈশ-ভোজন করছিল, গল্পগুজব আর হাসি তামাশা চলছিল এন্তার, এমন সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করলো মাচ। 'তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গতকালই আমাদের মধ্যে একজন নেতা নির্বাচনের কথা উঠেছিল। আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে নেতা ছাড়া কোন দলেরই নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না।'

'ঠিক, ঠিক,' বললো একজন স্বাস্থ্যবান দস্যু। 'তোমার ব্যাপারেই আমরা মোটামুটি একমত হয়েছিলাম, মাচ। তোমাকেই আমাদের নেতৃত্ব...'

'উঁহুঁ,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো মাচ। 'এখন আর সেটা হয় না। মাচ আজ তার প্রভুর দেখা পেয়েছে। আমি আমার বদলে আমাদের নতুন সদস্য রবিন হুডের নাম প্রস্তাব করছি।'

'আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি,' বলে উঠলো ওয়াট। বলেই তার ছয় ফুট লম্বা লাঠিটা পাঁই পাঁই কয়েক পাক ঘোরালো মাথার ওপর। 'কারো যদি আপত্তি থাকে, এসো, হয়ে যাক এক হাত।'

সবাই প্রায় রাজি হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় লম্বা চওড়া গম্ভীর এক দস্যু মাথা নাড়লো। 'আমার যতদূর মনে আছে, গতকাল আমরা মোটামুটি ঠিক করেছিলাম যে আমাদের মধ্যে যে সেরা তীরন্দাজ সে-ই নেতা হওয়ার যোগ্য।'

'সেরকম একটা কথা উঠেছিল বটে,' বললো মাচ। 'খুব সম্ভব তুমিই তুলেছিলে প্রস্তাবটা। তবে সে-ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। যাই হোক, সেদিক থেকেও আমার মনোনীত প্রার্থীর জুড়ি নেই। সারা ইংল্যাণ্ডের সেরা তীরন্দাজ রবিন হুড।'

'শুনলাম, সেরা,' গম্ভীর মুখে বললো লোকটা। 'কিন্তু জানছি কিভাবে?'

তর্কটা খারাপ দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে দেখে মুখ খুললো রবিন। একটা হাত তুলে থামতে বললো সবাইকে।

'শোনো, মাচ, নেতৃত্ব জিনিসটা অর্জন করে নিতে হয়, ওটা কারো ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোন অর্থ নেই। এখানে কেন, কোথাও আমি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ না করে কিছুই প্রত্যাশা করি না। শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদকে তোমাদের নেতা বানাবে, এরকম কথা কি সত্যিই হয়েছিল?'

'এই রকম একটা কথা সত্যিই উঠেছিল,' বললো মাচ।

'বেশ। তাহলে এই কথাই থাক,' বললো রবিন হুড। 'কাল সকালে আমরা একজন একজন করে প্রত্যেকে তীর ছুঁড়বো। যে জিতবে তাকেই মেনে নেব নেতা হিসেবে, রাজি?'

সবাই একবাক্যে সায় দিল, 'রাজি! রাজি!'

খাওয়া দাওয়া শেষ করে যে যার মত শুয়ে পড়লো অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে। সকালে উঠেই একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে জড়ো হলো সবাই। যে দূরত্বে ওরা তীর ছুঁড়তে অভ্যস্ত ততটা দুরে একটা টার্গেট তৈরি করে রবিন হুডকে বললো ওরা, 'দেখাও তোমার দক্ষতা। ঠিক মাঝখানে লাগাও দেখি একটা তীর।'

'এটা কোন পরীক্ষাই হলো না,' মাথা নাড়লো রবিন। 'যে-কেউ ভেদ করতে পারে এই লক্ষ্য। দেখা যাবে আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই লক্ষ্যভেদ করেছে। তার চেয়ে এমন একটা লক্ষ্য স্থির করো, যাতে একবারেই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়।'

লম্বা-চওড়া গম্ভীর লোকটার নাম জন ফোর্ড। রবিনের প্রস্তাবে খুশিই হলো সে। বললো, 'ঠিক আছে, টার্গেটটা কি হবে, কতদূরে হবে সেটা তুমিই নাহয় ঠিক করো, রবিন হুড।'

'করতে পারি, যদি সবাই রাজি থাকে,' বললো রবিন।

'রাজি, রাজি। তুমিই ঠিক করো।'

লতা-পাতা আর জংলী ফুল দিয়ে গোল একটা মালা তৈরি করলো রবিন। সেটা উইল স্টিউটলির হাতে দিয়ে একেবারে শেষ মাথার একটা ওক গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে আসতে বললো। ছুটে গিয়ে ঝুলিয়ে দিল উইল মালাটা।

'এবার এসো,' বললো রবিন। 'দেখা যাক পাতা বা ফুল স্পর্শ না করে কে ওই মালার মধ্যে তীর গাঁথতে পারে। যে পারবে তাকেই মেনে নেব আমরা আমাদের দলনেতা হিসেবে।'

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দস্যু সবাই। অবাক হয়ে গেছে ওরা। 'তীর লাগাবো কি, ভাল মত দেখতেই তো পাচ্ছি না মালাটা!' বলে উঠলো একজন। 'অতদূরে লক্ষস্থির করতে হলে ঈগলের চোখ চাই।'

'ওরেব্বাপ!' দীর্ঘশ্বাস টানলো একজন। 'ওখানে তীর পাঠাতে হলে ঘোড়ার মত গায়ে জোর চাই।'

'আমি বাদ!' চেঁচিয়ে উঠলো আরেকজন, 'আমার ধনুক টেনে ভেঙে ফেললেও অতদূরে যাবে না তীর।'

শেষ পর্যন্ত টিকলো শুধু জন ফোর্ড। অতদূরে তীর পৌঁছবে কিনা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিল না সে, ধনুকে নতুন একটা ছিলা পরিয়ে সোজা দেখে তিনটে তীর বাছাইয়ে মন দিল। কে আগে তীর ছুঁড়বে তাই নিয়ে টস্ করা হলো। প্রথমে ছোঁড়ার সুযোগ পেল জন ফোর্ড।

প্রথম তীরটা গজ দশেক আগেই মাটিতে গাঁথলো। বিরক্ত হলো জন ফোর্ড, খানিক গজ গজ করে আরো জোরে আরো উঁচু দিয়ে মারলো দ্বিতীয় তীর, কিন্তু এটাও পৌঁছলো না লক্ষ্যস্থলে। তৃতীয়বারে কোন মতে পৌঁছলো বটে, তবে মালা থেকে বেশ কিছুটা নিচে গিয়ে বিঁধলো তীর।

'আমার যতটা সাধ্য আমি করেছি,' বললো সে। 'আমার বিশ্বাস কোন মানুষের পক্ষে এর চেয়ে ভাল কিছু করা সম্ভব নয়।'

'এবার তুমি, এবার তুমি, রবিন হুড!' চেঁচিয়ে উঠলো মাচ। 'তিনটে তীর ছুঁড়তে দেখেছি আমি কাল তোমাকে। তিনটে অব্যর্থ তীর। দেখা যাক আজও হাতটা ঠিক আছে কিনা।' গলার স্বরে বোঝা গেল, এত কঠিন পরীক্ষায় নেমেছে রবিন হুড যে দ্বিধায় পড়ে গেছে সে, খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না মাচ আজ।

বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো রবিন হুড। মস্ত ধনুকটা উঁচু করে ধরতেই চুপ হয়ে গেল সবাই। কিছুটা সামনে ঝুঁকে টান দিয়ে কানের পাশে নিয়ে এলো সে ছিলাটা। দম বন্ধ করে চেয়ে আছে সবাই ওর দিকে। মৃদু ঝংকার উঠলো ছিলায়। ছুটলো তীর। সোজা গিয়ে বিঁধলো ওক গাছের গুঁড়িতে একেবারে মালার ঠিক মাঝখানে। বিস্মিত উল্লাস ধ্বনি

বেরিয়ে এলো সবার মুখ থেকে। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড জীবনে কখনো দেখেনি ওরা।

'আবার মেরে দেখাও! আবার মেরে দেখাও!' চেঁচিয়ে উঠলো জন ফোর্ড। 'এটা হঠাৎ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তিনটে তীর ছোঁড়ার কথা ছিল তোমার। দেখা যাক আরগুলো কোথায় লাগে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললো রবিন হুড। হাসতে হাসতে আরেকটা তীর পরালো সে ছিলায়। ছুঁড়লো। তারপর আরেকটা। প্রত্যেকটা তীর গিয়ে ঢুকেছে মালার মধ্যে, অথচ ফুল বা পাতা স্পর্শ করেনি একটাও।

হৈ-হৈ করে উঠলো সবাই। প্রত্যেকেই ওরা দক্ষ তীরন্দাজ, কাজেই কতবড় অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়েছে রবিন হুড মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সবাই, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এমন নৈপুণ্য অর্জন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। এ লোক ধনুকের জাদুকর।

'রবিন হুড, জিন্দাবাদ!' ধ্বনি তুললো সবাই।

'এবার কি বলো তোমরা?' জানতে চাইলো মাচ, 'আমাদের নেতা হওয়ার যোগ্যতা আছে এই লোকের?'

'একশো বার! একশো বার! 'ঘোষণা করলো সবাই। সবার চেয়ে বেশি জোরে শোনা গেল জন ফোর্ডের কণ্ঠ। 'রবিন হুডের নেতৃত্ব মেনে নিলাম আমরা। এখন থেকে ওর কথায় বাঁচবো, ওর কথায় মরবো!'

এবার শপথ অনুষ্ঠানের পালা। একে একে শপথ গ্রহণ করলো সবাই। প্রথমে মাচ, তারপর ওয়াট, তারপর জন ফোর্ড, তারপর উইল, তারপর আরো সবাই।

'শোনো, বন্ধুরা,' হাঁক ছাড়লো রবিন হুড। 'এই দলের নেতা হিসেবে আমি আমাদের নীতিমালা ঘোষণা করছি। তিনটে নীতি আজ থেকে মনে-প্রাণে মেনে চলবো আমরা। প্রথম, আজ থেকে আমরা অত্যাচারী নর্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমাদের খেটে-খাওয়া স্যাক্সন ভাইদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করেছে যারা, ছলে বলে কৌশলে তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে নিজেদের আরো ধনী করে তুলছে যারা, তারা আমাদের জন্ম-শত্রু। দ্বিতীয়, আজ থেকে আমরা গরীব বা অভাবী কোন মানুষের কোন ক্ষতি করবো না। বরং নর্মান শেরিফ, ব্যারন, ব্যবসায়ী, আর নির্লজ্জ ধনী ধর্মযাজকদের কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নিয়ে এদের মধ্যে বিতরণ করবো, সবদিক থেকে সব রকমের সাহায্য করবো বিপদগ্রস্তকে। তৃতীয়, কোন নারী, ধনী হোক বা দরিদ্র, নর্মান হোক বা স্যাক্সন, যেন আমাদের দ্বারা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' সবার দিকে চাইলো রবিন, 'তোমরা এই আইন মেনে চলতে রাজি আছো?'

দুই হাত তুলে সমর্থন জানালো সবাই। 'রাজি আছি। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো তোমার নির্দেশ।'

'ধন্যবাদ।'

অপূর্ব মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো রবিন হুডের মুখে।

দুই

লিটল জন

নটিংহামের শেরিফের কানে পৌঁছলো সব কথা। কালবিলম্ব না করে বিরাট এক রক্ষীদল পাঠালেন তিনি দস্যুদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে। লব নামের এক মুচির মুখে এই বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর খবর পেয়ে গেল ওরা আগে ভাগেই। এত লোকের সাথে পেরে ওঠা যাবে না বুঝতে পেরে শেরউড ছেড়ে সরে গেল ওরা

ইয়র্কশায়ারের জঙ্গলে। সেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যখন জানা গেল বিফল হতোদ্যম হয়ে ফিরে গেছে শেরিফের লোকজন, তখন আবার শেরউডে এসে ডেরা বাঁধলো রবিন হুড।

এবার দল গঠনে মন দিল রবিন। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, শক্তি অর্জন করতে হবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই। টিকে থাকতে হলে বাহুবল চাই। কাজেই সাহসী, শক্তিশালী, বিশ্বাসী লোক খুঁজে বের করার কাজে লেগে গেল সে। অনেকেই ওর দলে যোগ দিতে আগ্রহী, কিন্তু ভালমত পরীক্ষা করার পর সন্তুষ্ট না হয়ে কাউকে দলে নিল না সে। উপযুক্ত লোকের খোঁজ পেলে তাকে দলে নেয়ার চেষ্টায় যেমন কোন ত্রুটি করতো না সে, তেমনি অনুপযুক্ত, নির্বোধ লোককে ফিরিয়ে দিতেও দ্বিধা করতো না বিন্দুমাত্র। ফলে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠলো ওর দলটা, লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়ালো পাঁচ-কুড়িতে।

একদিন এক সুন্দর সকালে ঘুম থেকে উঠে চঞ্চল ঝর্ণার পানিতে হাত-মুখ ধুচ্ছে রবিন, গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে মিষ্টি মধুর গান শোনাচ্ছে পাখিরা, চারদিকে ভোরের তাজা একটা ভাব–এমনি সময়ে হঠাৎ মনটা বিগড়ে গেল ওর।

'চললাম,' আস্তানায় ফিরেই ঘোষণা করলো রবিন। 'দু'-দু'টো সপ্তাহ পেরিয়ে যাচ্ছে, কোন ঘটনা নেই, শিকার নেই, রোমাঞ্চ নেই–একঘেয়ে জীবন আর ভাল্লাগছে না। কেউ যখন কোন মেহমান আনতে পারছে না, আমি বেরোবো। আজ যদি মোটাসোটা কোন অ্যাবট কিংবা ধনী নাইট বা ব্যারনের কোমরে গোঁজা থলি হালকা না করতে পারি, তাহলে আমার নামই নেই।'

কথা শুনে আরো দু'চারজন তৈরি হচ্ছিল সাথে যাওয়ার জন্যে, হাত তুলে ওদের নিরস্ত করলো রবিন।

'আমি একা যাবো। তৈরি থেকো, যদি কোন বিপদে পড়ি, কিংবা শাঁসালো কোন শিকারের সন্ধান পাই, তিনবার শিঙা বাজাবো। আওয়াজ পেলেই বুঝবে তোমাদের সাহায্য দরকার পড়েছে আমার।'

হাঁটছে তো হাঁটছেই, হাঁটতে হাঁটতে শেরউডের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলো রবিন, কিন্তু এমন কিছুই ঘটলো না যাতে একটু নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। এ-রাস্তা ও-রাস্তা, এ-গলি ও-গলি ধরে হাঁটছে সে, মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে মানুষজনের সাথে। কিন্তু সবাই শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ। মোটা এক সন্ন্যাসী চলে গেল পাশ কাটিয়ে, ঘোড়ায় চেপে চলে গেল এক মহিলা–মাথার হুড খুলে সম্মান দেখালো তাকে রবিন, একটা অন্ধকার মত বন-পথে দেখা পেল এক পল্লী বালার–দু'একটা টুকরো সম্ভাষণের পর রওনা হলো যে-যার পথে, বর্শা আর ঢাল হাতে এক বর্ম-পরা নাইটের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, লাল উর্দি পরা এক পরিচারক ছুটে চলে গেল পাশ দিয়ে। নাহ্, দিনটাই বুঝি মাটি হয়–ভাবতে ভাবতে অন্য পথ ধরলো আবার রবিন। এইভাবে এলোপাতাড়ি ঘুরতে ঘুরতে বেশ বড়সড় একটা ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছলো সে। একটা গাছের কাণ্ড ফেলে পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছে। একজন একজন করে পার হতে হয়, দু'জনের জায়গা হয় না। সেতুর ওপর পা রাখতে যাবে, এমনি সময় দেখতে পেল ওপার থেকে বিশাল চেহারার এক ঢ্যাঙা লোক উঠছে সেতু পেরোবার জন্যে।

'অ্যাই, দাঁড়াও,' বললো রবিন। 'পথ ছাড়ো। আমাকে আগে পার হতে দাও।'

'কেন?' শান্ত গলায় জানতে চাইলো আগন্তুক।

'দেখতে পাচ্ছো না, দু'জন পার হওয়ার জায়গা নেই? সরে দাঁড়াও, আমি আগে পার হবো।'

'কেন? আমি আগে পার হলে ক্ষতি কি? তুমিই একটু সরে দাঁড়াও না।'

'বেশি বকবক করবে না, খবরদার!' রেগে গেল রবিন। 'হয় পথ ছাড়ো, নয়তো

বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে দেব তীর!' কথাটা বলেই ধনুক নামালো সে কাঁধ থেকে।

'খবরদার!' গর্জে উঠলো ওপারের লোকটা। 'ছিলাটা চুঁয়েছো কি এই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে তোমার গায়ের রঙ পাল্টে দেব। দেখেছো লাঠিটা?'

সাত ফুট লম্বা প্রকাণ্ড লাঠিটার দিকে চাইলো রবিন, তারপর হাসলো। 'গাধার মত কথা বলছো তুমি, উল্লুক। তিন কদম এগোবার আগেই কলজে ফুটো হয়ে যাবে তোমার।'

'আর তুমি কথা বলছো কাপুরুষের মত,' ঘৃণা প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। 'তীর-ধনুক থাকলে যে-কোন ভীতুর ডিমও ওরকম বড়াই করতে পারে। লজ্জা করে না তোমার সাধারণ এক লাঠির বিরুদ্ধে ধনুকের হুমকি দিতে? কাপুরুষ কোথাকার!'

'তবে রে, ব্যাটা!' বলেই রেগেমেগে তীর ধনুক নামিয়ে রাখলো রবিন মাটিতে। 'আমি কাপুরুষ? ঠিক আছে, সাহস থাকে তো দাঁড়াও ওখানে। এক্ষুণি একটা লাঠি কেটে নিয়ে আসছি আমি।'

'বেশ, বেশ,' বললো দৈত্যের মত লোকটা। মস্ত লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো। 'নিয়ে এসো। খুশি মনে অপেক্ষা করছি আমি।'

দ্রুত পায়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন। সোজা দেখে গ্রাউণ্ড ওকের ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা একটা ডাল কেটে নিয়ে ফিরে এলো ছোট ছোট শাখাগুলো ছাঁটতে ছাঁটতে। এদিকে সেই একই ভঙ্গিতে লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে শিস দিচ্ছে, আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা। শাখাগুলো ছাঁটার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করছে রবিন, আর ভাবছে এতবড় জোয়ানটার সাথে লাগতে যাওয়া কি ঠিক হলো? এমনিতে রবিন হুড লম্বা, কিন্তু এ লোক তার চেয়েও কমপক্ষে একহাত বেশি লম্বা, সাত ফুটের কম তো নয়ই। নিজের চওড়া কাঁধের জন্যে গর্ব অনুভব করতো রবিন, কিন্তু এ লোকের কাঁধ তার চেয়েও এক বিঘৎ বেশি চওড়া। আর কোমরের বেড় কম করেও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি।

'যাই হোক,' মনে মনে বললো রবিন। 'যত বড় পালোয়ানই হও না কেন, বাছা, পিটিয়ে হাতের সুখ মিটিয়ে নেব আজ।' মুখে বললো, 'এই যে ঢ্যাঙা বীরপুরুষ, লাঠিটা দেখতে পাচ্ছো? এগোও দেখি যদি সাহস থাকে। ঝর্ণার মাঝখানে এই গাছের ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ হবে, একজন আরেকজনকে পিটিয়ে পানিতে না ফেলা পর্যন্ত চলবে যুদ্ধ, যে জয়ী হবে সেই পার হবে প্রথম।'

'ঠিক আছে, কোন আপত্তি নেই আমার,' বললো লোকটা। বোঁ করে মাথার ওপর লাঠিটা একপাক ঘুরিয়ে নিয়ে এগোলো সামনে।

শুরু হলো যুদ্ধ। প্রথম কিছুক্ষণ চললো পাঁয়তারা–দু'জনেই লাঠি ঘুরাচ্ছে, একদিকে আঘাত করার ভান করে চট্ করে অন্যদিকে আঘাত করার চেষ্টা করছে, অপরজন সে-আঘাত ঠেকিয়ে দেয়া মাত্র অন্য ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছে একে অন্যের দুর্বলতা। কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজনই টের পেয়ে গেল প্রতিপক্ষকে কাবু করা সহজ হবে না, দুজনই ওস্তাদ লাঠিয়াল। প্রথম আঘাতের সুযোগ বের করে নিল রবিনই। মাথায় মারার ভান করলো সে, ঠেকাবার জন্যে প্রতিপক্ষ লাঠিটা উঁচু করে ধরতেই আশ্চর্য দ্রুতবেগ লাঠি ঘুরিয়ে মেরে দিলো ওর পাঁজরে।

রেগে গিয়ে ছোট্ট একটা গর্জন ছাড়লো দৈত্যটা, তারপর এমন জোরে লাঠি চালালো যে সেটা ঠেকাতে গিয়ে সারা শরীরে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করলো রবিন। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দ্বিতীয় আঘাতের আগেই চড়াৎ করে একটা বাড়ি লাগিয়ে দিল লোকটার পিঠে। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল লোকটা, বাড়িটা সহ্য করে নিয়েছে সে রবিনের মাথাটা অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়ার জন্যেই, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রচণ্ড এক আঘাত হানলো সে ওর মাথা লক্ষ্য করে। এই এক আঘাতেই যে-কোন

মানুষের চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে ঠেকিয়ে দিল রবিন আঘাতটা, পুরোপুরি সফল হলো না যদিও। তেরছা ভাবে চাঁদি ছুঁয়ে গেল প্রতিপক্ষের লাঠি, কুল কুল করে রক্ত নামলো রবিনের গাল বেয়ে। হাসি ফুটে উঠেছে ঢ্যাঙা দৈত্যের মুখে।

মার খেয়ে খেপে গেল রবিন। ক্ষিপ্র বেগে বেশ কিছুক্ষণ আঘাতের পর আঘাত

করে গেল সে। এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিতে বাধ্য হলো প্রতিপক্ষ, একের পর এক মার ঠেকিয়ে গেল শুধু, মারার সুযোগ পেল না।

বিদ্যুৎ চমকের মত এদিক-ওদিক থেকে নানা রকম মার মারলো রবিন, কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতার সাথে সব রকমের আঘাতই ঠেকিয়ে দিচ্ছে ঢ্যাঙা লোকটা, ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ মত একটু আধটু আঘাত করতেও ছাড়ছে না। এইভাবে চললো পুরো একটা ঘন্টা। এক ইঞ্চি পিছালো না দুজনের কেউই, শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে, কিন্তু কেউ একটিবার বললো না—হয়েছে, থাক। ছোটখাট অসংখ্য পিট্টি খেয়েছে দুজনেই, এখানে ওখানে ফুলে গেছে বাড়ি খেয়ে, শরীরে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য লাল-নীল-সবুজ দাগ, কিন্তু হার মানলো না কেউই।

হঠাৎ এক সুযোগে প্রচণ্ড এক আঘাত হানলো রবিন ঢ্যাঙা লোকটার পাঁজরে, আগে যেখানে মেরেছিল ঠিক সেইখানটায়। পড়ে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু পড়তে পড়তেও সামলে নিয়ে খটাশ করে বাড়ি লাগিয়ে দিল রবিনের মাথায়, ঠিক আগে যেখানে মেরেছিল সেইখানেই। পর মুহূর্তে সামলে নেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে কষে এক বাড়ি লাগিয়ে দিল সে রবিনের পিঠে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না রবিন হুড, ধড়াশ করে ডিগবাজি খেয়ে পড়লো পানিতে। কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ভেসে উঠলো ওপরে।

হা-হা করে হেসে উঠলো ঢ্যাঙা দৈত্য। 'কি খবর, তীরন্দাজ সাহেব! কোথায় হাবুডুবু খাওয়া হচ্ছে?'

'কোথায় আবার—পানিতে,' বললো রবিন নির্বিকার কণ্ঠে। ডাঙার দিকে এগোলো সে। 'জিতলে তুমিই। বাপ্‌স, মাথার মধ্যে ভন ভন করছে, যেন জুন-সকালের মৌচাক একটা।' কথা বলতে বলতে হাঁটু পানিতে চলে এলো রবিন। পায়ের ফাঁক দিয়ে ইতি-উতি পালাচ্ছে ছোট ছোট মাছগুলো। শিঙাটা মুখে তুলে তিনটে ফুঁ দিলো সে, তারপর তীরের একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরে উঠে এলো ওপরে।

'জিতেছি বটে,' বললো দৈত্য, 'কিন্তু তুমিও কম দেখাওনি, বাপু। লড়েছো বীরের মত। এত দুর্দান্ত লেঠেল আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার।'

'আমারও না,' বললো রবিন।

এমনি সময়ে কাছাকাছি শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল, খশ খশ আওয়াজ আসছে ঝোপ-ঝাড় নড়ার, 'দু'একটা শুকনো ডাল মট মট করে ভাঙছে যেন কাদের পায়ের চাপে, তারপর প্রায় একসাথে জঙ্গলের আড়াল থেকে উঁকি দিলো বিশ-ত্রিশজন সবুজ পোশাক পরা শক্ত সমর্থ লোক। সবার আগে মাচ, ওয়াট আর উইল।

'আরে, ওস্তাদ! ভিজে যে একেবারে চুপসে গেছো দেখছি!' বললো মাচ।

'ভিখারীর কাঁথার মত সারা শরীরে এত লাল নীল সবুজ বেগুনি রঙ কেন?' জানতে চাইলো উইল। 'এই হাল হলো কি করে তোমার?'

'ওই যে,' আঙুল তুলে ঢ্যাঙা দৈত্যকে দেখালো রবিন, 'ওই লোক প্রথমে আচ্ছা মত পিটিয়েছে, তারপর পানিতে ফেলেছে আমাকে।'

'কী! এতবড় সাহস!' গর্জন করে উঠলো কয়েকজন।

একসাথে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল লোকটার ওপর, হাসলো রবিন, একটা আঙুল তুলে থামতে বললো ওদের। 'ওর গায়ে হাত তুলো না কেউ। সাহসী আর গুণী লোকের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার করি না আমরা। ওর সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলাম, হেরে গেছি—ব্যাস, খতম। ওর ওপর কোন রাগ নেই আমার। সত্যিকার বীরের মত লড়াই করে জিতেছে ও।' লোকটার দিকে ফিরলো এবার রবিন। 'তোমাকে পেলে খুব খুশি হবো আমরা। আসবে? যোগ দেবে আমাদের দলে?'

'তোমার দলে?' মাথা নাড়লো ঢ্যাঙা দৈত্য। 'উঁহুঁ। আমার চেয়ে অযোগ্য কারও

নেতৃত্ব আমি মানতে পারি না।'

'কি দিয়ে মাপ নেবে তুমি যোগ্যতার?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো রবিন, হাত তুলে দলের সবাইকে দেখালো, 'তুমি কি মনে করো এরা সবাই আমার চেয়ে সবদিক থেকে অযোগ্য? মোটেও না। কেউ বুদ্ধিতে আমার চেয়ে বেশি, কেউ বিদ্যায়, কেউ গায়ের জোরে, কেউ ক্ষিপ্রতায়, কেউ লাঠি খেলায়, কেউ তলোয়ারে, কেউ অভিজ্ঞতায়, কেউ...'

'তাহলে কেন মেনে নিচ্ছে ওরা তোমাকে নেতা হিসেবে?'

'আমি এদের মধ্যে সেরা তীরন্দাজ।'

'তাই বুঝি?' হেসে উঠলো দৈত্য। 'তা এসো না, সে ব্যাপারেও হয়ে যাক একহাত?'

'তীর-ধনুকেও ভাল হাত বুঝি তোমার?'

'পরীক্ষা প্রার্থনীয়,' কপট বিনয়ে পিঠ বাঁকিয়ে মাথা ঝুঁকালো ঢ্যাঙা।

'বেশ,' মুচকি হাসলো রবিন। 'আচ্ছা ত্যাঁদোড় লোক মনে হচ্ছে! ঠিক আছে, উইল, চার আঙুল লম্বা আর চার আঙুল চওড়া এক টুকরো গাছের ছাল কেটে আনো। উল্টো দিকটা যেন সাদা হয়।' এক মিনিটের মধ্যেই কাছের উইলো গাছ থেকে এক টুকরো ছাল নিয়ে এলো উইল। দূরের একটা ওক গাছের দিকে আঙুল তুললো রবিন। 'আশি গজ দূরের ঐ ওক গাছের গায়ে সেঁটে দিয়ে এসো ওটা।' ঢ্যাঙা দৈত্যের দিকে ফিরলো সে, 'খুব বেশি দূর হয়ে যায় এটা?'

'মোটেও না, মোটেও না,' উত্তর দিলো সে খুশি মনে। 'ভাল দেখে একটা ধনুক আর তীর দাও, যদি লাগাতে না পারি, ঐধনুকের ছিলা দিয়ে পিটিয়ে আমার পিঠের ছাল তুলে নিয়ো।'

সবার বাড়িয়ে ধরা ধনুকগুলো থেকে নিজের পছন্দসই শক্তপোক্ত একটা ধনুক বেছে নিল লোকটা, অনেক দেখে শুনে বাছাই করলো একটা নিখুঁত সোজা তীর, তারপর দাঁড়ালো গিয়ে দাগের ওপর, যেখান থেকে ছুঁড়তে হবে তীর। বাকি সবাই, কেউ বসে, কেউ নরম ঘাসের গালিচায় শুয়ে অপেক্ষা করছে উইলের ফিরে আসার।

ফিরে এলো উইল। ডান পা-টা পিছিয়ে নিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়ালো দৈত্যটা, ধনুকে তীর জুড়ে একটানে কানের পাশে নিয়ে এলো ছিলাটা, লক্ষ্যস্থির করেই ছুঁড়লো তীর। আশ্চর্য! সোজা গিয়ে লাগলো তীর ছোট্ট বাকলটার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। হা হা করে হেসে উঠলো দৈত্য। ফিরলো রবিনের দিকে, 'ঠিক কেন্দ্রবিন্দুটা দখল করে নিয়েছি আমি। দেখা যাক তোমার তীর কোথায় লাগে।'

লোকটার আশ্চর্য হাতের টিপ দেখে প্রশংসার গুঞ্জন উঠলো সবার কণ্ঠে, কেউ কেউ হাততালি দিয়ে উঠলো খুশিতে। কিন্তু রবিনকে দাগের ওপর এসে দাঁড়াতে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল সবার। এইবার? পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো ওরা। কি করবে রবিন? এর চেয়ে ভাল আর কি করতে পারে সে?

ধনুকে তীর যোজনা করলো রবিন, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থির করে ছুঁড়লো তীর। অকল্পনীয় ব্যাপার! রবিনের তীরটা সোজা গিয়ে ঢুকলো কেন্দ্রবিন্দুতে সেঁধিয়ে থাকা তীরের পিছন দিকটায়, চড় চড় করে সেটাকে দু'ফাঁক করে চিরে দিয়ে থামলো গিয়ে ফলার কাছে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সবাই, আকাশ কেঁপে উঠলো ওদের প্রাণখোলা হর্ষধ্বনিতে।

হাঁ হয়ে গিয়েছিল ঢ্যাঙা দৈত্যের মুখটা। চট্ করে মাথা থেকে টুপি খুলে কুর্নিশের ভঙ্গিতে অভিবাদন করলো সে রবিনকে। 'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি আমি! ধনুকের জাদুকর দস্যু রবিনও হার মানবে তোমার কাছে!'

'চেনো তুমি রবিন হুডকে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো রবিন।

'চিনি না। তবে তার নাম শুনেই এসেছি আমি বহুদূর থেকে। খুঁ ... লা,

'কেন খুঁজছো তাকে বলো তো?'

'তার দলে যোগ দেব বলে।'

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রবিনের মুখ। একটা হাত বাড়িয়ে 'তুমি পেয়েছো তাকে খুঁজে,' লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া মুখে হাসলো সে। 'রবিন হুডকেই পিটিয়ে পানিতে ফেলেছো তুমি আজ।'

সাগ্রহে চেপে ধরলো লোকটা রবিনের বাড়িয়ে ধরা হাত। 'ছি, ছি! আগেই পরিচয় দেয়া উচিত ছিল তোমার।'

'তাহলে কি তোমার গুণের পরিচয় পেতাম? হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেলাম, সেটাই ভালো হলো না? তোমার মত গুণী লোকের দরকার আছে আমাদের। আজ থেকে তুমি আমাদের একজন হলে, আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার। ভাল কথা, কি নামে ডাকবো তোমাকে?'

'আমার নাম জন লিটল।'

'জন লিটল?' হা হা করে হেসে উঠলো উইল স্টিউটলি। 'চেহারাটা লিটল-ই বটে।' আবার হাসলো এক পেট। 'উঁহুঁ, ও নামে চলবে না। তুমি নতুন ঢুকছো দলে, নতুন ভাবে নামকরণ হবে তোমার। আমি রাখবো তোমার নাম।'

'কি নাম রাখবে ভাবছো?' জানতে চাইলো মাচ।

'উল্টে দেব নামটা। এখন থেকে ওর নাম হবে লিটল জন, মানে, ছোট্ট জন। দেখতে পাচ্ছো না কি রকম ছোটখাট পাহাড়টা?'

হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। এই বিশাল দৈত্যের মত লোকটাকে 'লিটল জন' বলে ডাকার কথা ভেবে প্রচুর মজা পেল সকলে। তখনও ওরা কেউ জানে না, রবিন হুডের একান্ত বিশ্বস্ত নির্ভীক অনুচর হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত হতে চলেছে এই লিটল জন।

আজকের মত রোমাঞ্চের সাধ মিটে গেছে রবিনের। সবাই মিলে ফিরে চললো ওরা নিজেদের গুহার দিকে। পথে দুটো হরিণ মেরে সাথে নিল। লিটল জনের সম্মানে ভুরি-ভোজের আয়োজন হবে আজ।

তিন

আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড

বেশ কিছুদিন পরের কথা। দলের সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে লিটল জন। সবাই মিলে বিপুল বিক্রমে ঠেকিয়ে দিয়েছে শেরিফের একের পর এক বেশ কয়েকটা আক্রমণ। অসম সাহস, কূট রণ-কৌশল আর মহান হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে নিজেকে লিটল জন প্রতিষ্ঠা করেছে রবিন হুডের ডান হাত হিসেবে। নেতার প্রতি ভক্তিতেও সে সবার সেরা।

একদিন মে মাসের বিকেলে নিজেদের আস্তানায় গ্রীনউড গাছের নিচে সবুজ ঘাসের গালিচায় শুয়ে-বসে গল্প করছিলো কয়েকজন, গরমে কেমন একটা আলস্য-আলস্য ভাব সবার শরীরে, হালকা হাসি তামাশায় গুলজার হয়ে উঠেছিল আড্ডা। কাছেই ছোট্ট ঝর্ণাটা বয়ে চলেছে কুলকুল শব্দে, তার সাথে মিশে অপূর্ব সুন্দর এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে কোকিল আর ঘুঘুর উদাস মিষ্টি গান। বিশাল ওকের মস্ত ডালগুলো দুলছে মৃদু মন্দ হাওয়ায়, চিক চিক করছে পাতাগুলো। শেষ বিকেলের রোদে সবুজ ঘাসের ওপর ঝিলমিল করছে আলোছায়ার খেলা।

দলের বেশির ভাগ লোকই ছোট ছোট উপদলে ভাগ হয়ে নানান কাজে চলে গেছে জঙ্গলের এদিক-ওদিকে। আস্তানা পাহারায় রয়েছে কেবল পাঁচ-ছয়জন। রবিনের পাশেই শুয়ে আছে লিটল জন মস্ত লাঠিটা কোল-বালিশের মত করে ধরে; তার পাশে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে সুশ্রী উইল স্টিউটলি, বুদ্ধিতে যার জুড়ি মেলা ভার; রবিনের আরেক পাশে রয়েছে উইল স্কেদলক, পাকানো দড়ির মত শরীর, চোখে হাউণ্ডের দৃষ্টি–দৌড়ে কেউ পারে না ওর সাথে; তার ওপাশে রয়েছে ডংকাস্টারের ডেভিড–বিশাল ধড়, প্রায় লিটল জনের সমান, তেমনি গায়ের জোর, খুবই অল্প বয়স, দাড়ি গোঁফ মাত্র গজাতে শুরু করেছে।

হঠাৎ হাঁটুর উপর একটা চাপড় মারলো রবিন। 'আরে, কাপড়ের কথা তো ভুলেই গেছিলাম! লিংকন গ্রীন শেষ হয়ে গেছে সেই কবে। সামনেই আসছে কাপড় বিলির তারিখ। এক্ষুণি অ্যাংকাস্টারে লোক না পাঠাতে পারলে বেইজ্জতি কারবার হয়ে যাবে।' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলো এক সেকেণ্ড, তারপর কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো লিটল জনের পাঁজরে। 'শুয়ে-বসে মেদ জমে যাচ্ছে তোমার শরীরে, লিটল জন। একটু হাঁটাহাঁটি করে এসো, যাও। সোজা অ্যাংকাস্টারে গিয়ে হিউ লঙশ্যাংক্সকে বলবে যেন যত শীঘ্রি সম্ভব চারশো গজ লিংকন গ্রীন কাপড় পাঠিয়ে দেয়। বুঝতে পেরেছো?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে বসলো লিটল জন। গল্পগুজব ছেড়ে এক্ষুণি উঠে পড়তে বলায় মনটা বেজার হয়ে গেছে তার। উশখুশ করে বলেই ফেললো, 'এক্ষুণি যেতে হবে? কাল সকালে রওনা দিলে হয় না? সন্ধে হয়ে আসছে...'

'সেজন্যেই রওনা হতে বলছি এখুনি। যে রকম ছোটখাট মানুষটা তুমি, দিনের বেলায় পথ চললে ঠিক চোখে পড়ে যাবে কারও। তোমার জন্যে রাতের অন্ধকারে পথ চলাই নিরাপদ।'

কথা না বাড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো লিটল জন, কটিবন্ধ এঁটে নিয়ে হাত পাতলো টাকার জন্যে। কাপড়ের দাম বাবদ যা হয় তার সাথে আরো কিছু হাতখরচের টাকা দিয়ে দিল রবিন। লাঠি হাতে রওনা হয়ে গেল সে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলেছে লিটল জন। হাঁটছে আর শিস দিচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এসে হঠাৎ রাস্তার একটা তেমাথায় থমকে দাঁড়ালো সে। বন্ধ হয়ে গেল শিস। একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা বহুদূরের শহর অ্যাংকাস্টারের দিকে, আরেকটা দিয়ে কিছুদূর এগোলেই শেরউডের বিখ্যাত সেই ব্লু বোর সরাইখানা। একবার এপথ আরেকবার ওপথের দিকে বার কয়েক চাইলো সে, তারপর টুপিটা একপাশে কাত করে মাথার পিছনটা চুলকালো। দুই টুকরো হয়ে গেছে মনটা। এক টুকরো বলছেঃ একটু এগোলেই তো ব্লু বোর সরাইখানা। খরচের টাকা রয়েছে পকেটে, কয়েক ঢোক 'অক্টোবর এল,' সেইসাথে ভাল কয়েকজন লোক পেলে উফ্, দারুণ জমে যাবে আড্ডা! অপর টুকরো বলছেঃ কোন ধানাইপানাই শুনতে চাই না, সোজা পা বাড়াও অ্যাংকাস্টারের পথে, যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটা পালন করো।

কিন্তু পা আর বাড়ে না। কর্তব্য পালনের চেয়ে ফুর্তির আহ্বান অনেক অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আকাশের দিকে চাইলো সে। পরিষ্কার নীল আকাশে আলস্যভরে ভাসছে উজ্জ্বল সাদা মেঘের ভেলা, সোয়ালো পাখিরা উড়ছে ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেললো সে। ভাবলো, 'মনে হচ্ছে, বৃষ্টি হবে আজ সন্ধ্যায়। এই বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হলে আমার ব্লু বোরে গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। যেই থামবে অমনি রওনা হয়ে যাব আবার। কাজ দিয়েছে বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধাই, এটা নিশ্চয়ই চাইবে না রবিন।' যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোলো সে সরাইখানার দিকে।

বেশ কিছুটা দূর থেকেই সরাইখানার হৈ-হল্লা আর গানের আওয়াজ পেয়ে দ্রুততর হলো ওর চলার গতি। ঢুকেই দেখলো চার পাঁচজনে চমৎকার জমিয়ে তুলেছে আড্ডা,

সবার হাতে মদের পাত্র। ওকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো সবাই। চমৎকার খাবার এলো, গ্লাসের পর গ্লাস মদ এলো, হাসি-ঠাট্টা-গল্পে রাত হয়ে গেল মেলা। অত রাতে রওনা হওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে সরাইখানাতেই একটা ঘর নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল লিটল জন।

কাজটা ভাল করলো না সে। কারণ কর্তব্যে অবহেলা করলে কোন না কোন ভাবে তার শাস্তি পেতেই হয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই রওনা হয়ে গেল লিটল জন। চারপাশে চেয়ে যখন বৃষ্টির কোন চিহ্নই দেখতে পেল না, শুকনো খটখট করছে মাঠ ঘাট, তখন মনে মনে ভারি লজ্জা পেল সে। সময় কিছুটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যে প্রায় দৌড়ের গতিতে ছুটলো সে অ্যাংকাস্টারের পথে।

ব্লাইদ শহরে বাস করতো আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড নামে এক দুর্দান্ত সাহসী লোক। চামড়া রঙ করা ছিল তার পেশা। যেমন সাহস, তেমনি গায়ের জোর ছিল লোকটার। কুস্তি ও লাঠি খেলায় আশেপাশে জুড়ি ছিল না তার। কুস্তিতে পাঁচ বছর ছিল সে মিডকান্ট্রি চ্যাম্পিয়ান। একবার লিংকনের অ্যাডামের সাথে লড়তে গিয়ে পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে যাওয়ায় কুস্তি ছেড়ে দিয়ে লাঠিকেই আঁকড়ে ধরেছে সে আরো জোরে শোরে। আজ পর্যন্ত আধঘন্টার বেশি কেউ টিকতে পারেনি ওর সাথে লাঠি খেলায়। লাঠি ছাড়া আর একটি ব্যাপারে ছিল তার দারুণ পারদর্শিতা—গভীর চাঁদনি রাতে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তো সে জঙ্গলে, পায়ের ছাপ দেখে দেখে চিনে বের করতো হরিণের ডেরা, আশেপাশে জঙ্গল-রক্ষী না থাকলে এক-আধটা মেরে নিয়ে যেত বাড়িতে। যদিও ধরতে কোনদিন পারেনি, সন্দেহ ঠিকই করতো, বছরের এই সময়টায় তীক্ষ্ণ নজর রাখতো জঙ্গল রক্ষীরা ওর গতিবিধির ওপর।

লিটল জন যেদিন কাপড় কিনতে রওনা হলো তার আগের দিন গোটা দশেক গরুর পাকা চামড়া বিক্রি করতে গিয়েছিল আর্থার নটিংহাম শহরে। লিটল জন যেদিন ভোরে উঠে আবার রওনা দিল অ্যাংকাস্টারের পথে, সেদিন সে-ও একই পথ ধরে ফিরছে ব্লাইদ শহরে—হাতে প্রিয় লাঠি, মাথায় ডবল চামড়া দিয়ে তৈরি খুবই শক্ত এক টুপি।

পথের ওপর এক জায়গায় হরিণের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো আর্থার। 'সাথে ধনুক অবশ্য নেই,' মনে মনে বললো সে। 'কিন্তু শুধু কি মারতেই?—ওদের দেখতেও তো মজা।' এই বলে রাস্তা ছেড়ে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকলো সে। এ-ঝোপ ও-ঝোপের আড়ালে উঁকি ঝুঁকি মারতে মারতে পায়ের দাগ ধরে এগোলো আর্থার, মনের মধ্যে আশার পুলক—এই বুঝি দেখা মেলে সুন্দর একপাল হরিণের।

এদিকে হাঁটছে আর ভোরের প্রাকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছে লিটল জন, গুন গুন করে গান গাইছে এক-আধ কলি। মে-সকালের বাতাসে আজ মিষ্টি বুনো ফুলের সুবাস, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা ক্র্যাবট্রী, শিশির ভেজা ঘাসের উপর থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ঝুলছে লার্ক পাখি—হলুদ রোদ লেগে ঝলমল করছে পাখা, আকাশ থেকে সুধা বর্ষণ করছে তার মিষ্টি সুরেলা গান। কপাল খারাপ, হাঁটতে হাঁটতে আর্থার এ ব্ল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো সে, ঝোপঝাড় নড়ার খশ খশ আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। ভাল করে লক্ষ্য করতেই খয়েরি চামড়ার টুপি দেখতে পেল সে আর্থারের।

'করে কি ব্যাটা!' বিড় বিড় করে বললো লিটল জন। 'এরকম উঁকিঝুঁকি মারার কি অর্থ? নিশ্চয়ই ব্যাটা হরিণ-চোর। হাতে নাতে ধরতে হয় তো ব্যাটাকে!' রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকলো সে-ও, অনুসরণ করে চললো আর্থারকে।

বহুক্ষণ ধরে চললো এই রকম–লিটল জন পিছু নিয়েছে আর্থারের, আর আর্থার পিছু নিয়েছে হরিণের। হঠাৎ একটা শুকনো ডাল মাড়িয়ে ফেললো লিটল জন, মট্ করে ভাঙলো ডালটা। সাথে সাথেই পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড।

সিধে হয়ে দাঁড়ালো লিটল জন। হেঁড়ে গলায় হাঁক ছাড়লো, 'অ্যাই! কে তুমি? চোরের মত উঁকিঝুঁকি মেরে কি করা হচ্ছে? মতলবটা কি? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে শয়তানের ধাড়ি!'

কথা শুনে রেগে গেল আর্থার। যদিও হঠাৎ ওর কয়েক হাত পেছনেই এরকম দৈত্যের মত লোক দেখে একটু চমকে গিয়েছিল প্রথমে, কিন্তু সামলে নিল দ্রুত। কারো হাঁক-ডাকে দমবার পাত্র সে নয়। 'তুমিই বা কি করছো শুনি?' জানতে চাইলো সে। 'আর চেহারাটা আমার যেমনই হোক না কেন, জেনে রাখো, তোমাকেও তার চেয়ে ভালো কিছু দেখাচ্ছে না।'

'বেশি বড় কথা মানাচ্ছে না ছোট মুখে,' বললো লিটল জন। 'জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপ্পর। কি করছো এখানে, জবাব দাও। সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে পিটিয়ে লাশ করবো আজ তোমাকে।'

'তাই নাকি?' টিটকারির সুরে জানতে চাইলো আর্থার। 'তা একা তোমার পক্ষে তো সেটা সম্ভব হবে না, আরো যদি কেউ থাকে, ডেকে নিয়ে এসো তাদের।'

'আমি একাই একশো!' হাঁক ছাড়লো লিটল জন। 'তোমাকে পেটাতে কারও সাহায্যের দরকার পড়বে না আমার।'

'পড়বে হে, পড়বে। পিট্টি খেলে বাপ-চাচা যত আছে সবাইকে ডাকতে শুরু করবে তারস্বরে। আশে পাশে তাদের কেউ না থাকলে শেষ পর্যন্ত জানে বাঁচাবে কে তোমাকে? লাঠিটা একবার ধরলে আবার হুঁশ থাকে না আমার।'

ভুরু কুঁচকে ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করলো লিটল জন। বললো, 'পাগল নাকি ব্যাটা! যাই হোক, পাগলই হও আর ছাগলই হও, অনেক বড় কথা উচ্চারণ করে ফেলেছো–আজ তোমার রক্ষা নেই। এমন রাম প্যাঁদানি দেব আজ, বাপের নাম ভুলে যাবে, ডাকতে গিয়ে দেখবে নাম মনে নেই কারও। ঠিক আছে, ধরো দেখি লাঠি, দেখা যাক কতক্ষণ হুঁশ থাকে।'

'বেশ!' লাঠি হাতে তৈরি হলো আর্থার। 'কাজেই পুরুষের পরিচয়, কথা দিয়ে ছুঁচোও মারা যায় না। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, বাপু, আমার নাম আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড, হাড়গোড় কিন্তু আস্ত রাখবো না।'

'সে দেখা যাবে!' রাগে পিত্তিটা জ্বলে গেছে লিটল জনের, কিন্তু তাই বলে লড়াইয়ের নিয়ম ভোলেনি। বললো, 'দাঁড়াও, তোমার চেয়ে আমার লাঠিটা দেড় ফুট বেশি লম্বা, মাপ দিয়ে আগে কেটে ফেলি বেশিটুকু।'

'কোন দরকার নেই তার,' জবাব দিল আর্থার। 'আরো দেড় ফুট বড় হলেও আমার কোন অসুবিধে নেই। এসো!' আর কথা না বাড়িয়ে লাঠির মাঝামাঝি জায়গা দু'হাতে শক্ত করে ধরে ধীর পায়ে এগোল দু'জন দু'জনের দিকে। দুজনের চোখেই ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ, পারলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে একে অপরকে।

এদিকে রবিন হুডের কানে পৌঁছে গেছে লিটল জনের গাফিলতির কথা। নির্দেশ মত অ্যাংকাস্টারে না গিয়ে ব্লু বোর সরাইখানায় আমোদ-ফুর্তি করে রাত কাটিয়েছে লিটল জন, এই খবর পেয়েই রক্ত চড়ে গেল তার মাথায়। 'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!' বলে ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়লো সে ব্লু বোরের উদ্দেশে। 'আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন !' রাগের মাথায় হন হন করে হাঁটছে, আর মনে মনে কড়া সব বাক্য রচনা করে চলেছে একের পর এক। সামনে পেলে হয়, ধুয়ে ফেলে দেবে আজ সে লিটল

জনকে। ব্লু বোরে গিয়ে লিটল জনকে না পেয়ে ছুটলো সে অ্যাংকাস্টারের পথ ধরে। গায়ের ঝাল ঝাড়তে না পারলে কিছুতেই শান্তি আসছে না মনে। বেশ অনেকটা পথ চলার পর জঙ্গলের মধ্যে থেকে চড়া গলার বাকবিতণ্ডা কানে এলো ওর। ঝগড়া করছে দু'জন লোক ধমকের সুরে।

'আরে!' থমকে দাঁড়ালো রবিন হুড। 'আমাদের লিটল জনের গলা না?' কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো সে। 'নাহ, অপর কণ্ঠস্বরটা চেনা যাচ্ছে না। জঙ্গল-রক্ষীদের হাতে পড়লো না তো আবার ব্যাটা? দেখতে হয়!'

লিটল জন বিপদে পড়েছে ভেবে কর্পূরের মত উবে গেল রবিনের সব রাগ। অতি সন্তর্পণে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেল সে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। কাছাকাছি এসে আলগোছে একটা ঝোপের কিছু পাতা একপাশে সরাতেই দেখতে পেল সে লাঠি হাতে ধীর পায়ে এগোচ্ছে দু'জন দু'জনের দিকে।

'আচ্ছা!' মনে মনে বললো রবিন হুড, 'চমৎকার একটা খেলা জমেছে দেখা যাচ্ছে! কসম খোদার, তিনটে সোনার গিনি দেব আমি লোকটাকে, যদি আচ্ছামত পিট্টি দিতে পারে ওই বদমাশকে। খুবই খুশি হতাম আমি তাহলে, কিন্তু...সেটা কি সম্ভব? এমন একটা ঘটনা চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য কি হবে আমার? দেখা যাক, বাগাড়ম্বর দেখে তো মনে হয় এ-ও কম যাবে না।' এই বলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো সে মাটিতে।

গোল হয়ে ঘুরছে দু'জন একে অপরের চোখে চোখ রেখে, দুজনেই সুযোগ খুঁজছে অপরের অন্যমনস্কতার, সামান্যতম দুর্বলতা পেলেই আঘাত করবে সেখানে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ প্রতিপক্ষের পদক্ষেপে সামান্য একটু দুর্বলতার আভাস পেয়ে প্রথম আঘাত হানলো লিটল জন তড়িৎ বেগে। খটাশ করে আটকে দিল আর্থার সে-আঘাত, এবং সাথে সাথেই পাল্টা আঘাত করলো। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। লাফিয়ে সামনে যাচ্ছে, পিছনে আসছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে আসছে দু'জন; পটাপট লাঠির বাড়ি পড়ছে এত জোরে আর এত দ্রুত যে দূর থেকে কেউ শব্দ শুনলে মনে করবে একসাথে মারামারি করছে এক ডজন লোক। ঝাড়া তিরিশ মিনিট ধরে তুমুল লড়াই করে চললো দু'জন, দাপাদাপিতে চষা জমির মত অবস্থা হলো মাটির, লাঙল টানা বলদের মত ফোঁস ফোঁস শ্বাস পড়ছে। দু'জনই মার খাচ্ছে, সুযোগ পেলে কেউ কাউকে ছাড়ছে না, কিন্তু বেশির ভাগ মার পড়ছে লিটল জনের ভাগে, কারণ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে আকণ্ঠ মদ খেয়ে শরীরের অবস্থা তার খুব ভাল নয়, তার ওপর রবিনের ভয়ে খুব ভোরে উঠে কিছু মুখে না দিয়েই বেরিয়ে পড়েছে সে অ্যাংকাস্টারের পথে।

একটা করে মার খায় লিটল জন, আর হাসি ফুটে ওঠে রবিনের মুখে। এখনো নিশ্চিত সে, শেষ পর্যন্ত জয় হবে লিটল জনেরই। কারণ, নিজেও পাকা লাঠিয়াল রবিন, আর্থারের খেলার মধ্যে ছোটখাট দু'একটা ত্রুটি যখন ওর চোখে ধরা পড়ছে; ও জানে, ওর চেয়ে অনেক গুণে বেশি পাকা লাঠিয়াল লিটল জনের চোখে দোষগুলো ধরা পড়বেই, ঠিক সময় মত সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে সে। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ দেখার পর টের পেল রবিন, আসলে ওগুলো ত্রুটি নয় আর্থারের, ইচ্ছেকৃত ভাবে তৈরি ফাঁদ। একবার একটা ভুলের সুযোগ নিতে গিয়ে বেমক্কা মার খেয়ে মাটিতে পড়ার দশা হলো লিটল জনের, বহু কষ্টে সামলে নিল সে নিজেকে। মনে মনে হাজারবার বাহবা দিল রবিন আর্থারকে।

কিন্তু ঝানু লেঠেল লিটল জন, সুযোগ সে ঠিকই বের করে নিল একবার। ফাঁক পেয়ে প্রচণ্ড জোরে শরীরের সর্ব শক্তি দিয়ে আঘাত করলো সে প্রতিপক্ষের মাথায়। ঐ আঘাত খেয়ে তাগড়া জোয়ান ষাঁড়েরও হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাঁচিয়ে দিল ওকে ওর মাথার ডবল চামড়ার টুপি। টাল সামলাতে গিয়ে উল্টোপাল্টা পা ফেলে কয়েক হাত পিছনে সরে যেতে হলো আর্থারকে। যদি সাথে সাথে এগিয়ে গিয়ে আরো

আঘাত করতো লিটল জন, তাহলে জয় ছিল ওর সুনিশ্চিত, কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি সে এই আঘাতের পরেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কোন মানুষ। যখন দেখলো দু'পায়ের ওপরই খাড়া আছে লোকটা এখনো, এগিয়ে গেল সে, কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে আর্থার, লিটল জন কাছে আসতেই কড়াৎ করে মেরে দিলো মোক্ষম মার। মার খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল লিটল জন, হাত ফসকে ছিটকে দূরে চলে গেল লাঠি। এগিয়ে এসে কষে আরেক বাড়ি লাগালো আর্থার ওর পাঁজরে।

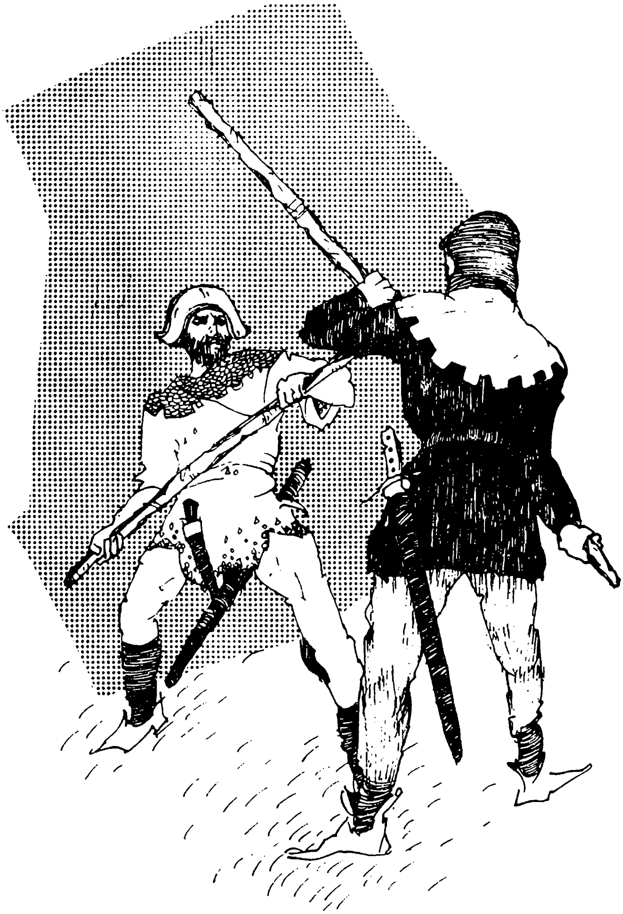

'দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে উঠলো লিটল জন। 'পড়ে যাওয়া মানুষকেও মারবে তুমি?'

'নিশ্চয়,' আরেক বাড়ি লাগালো আর্থার। 'পড়ে যাওয়া না বলে বলো ফেলে দেয়া প্রতিপক্ষকে মারবো কিনা। নিশ্চয় মারবো, একশোবার মারবো। তুমি হলেও তাই করতে।'

'থামো! থামো, প্লীজ!' আর্তনাদ করে উঠলো লিটল জন। 'হার মানছি। হার মেনে নিচ্ছি আমি!'

'পিট্টিটা যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে করো?' খুশি খুশি গলায় জানতে চাইলো আর্থার। আবার তুললো লাঠি।

'যথেষ্ট, যথেষ্ট! সত্যি বলছি, যথেষ্ট হয়েছে।'

'উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার? ঠিক জানো?' হালকা করে আরেক বাড়ি লাগালো সে লিটল জনের পিঠে।

'হয়েছে। দোহাই তোমার, হার মেনে নিয়েছি আমি।'

'হুম। মেনে নিচ্ছো যে আমি তোমার চেয়ে ভাল লাঠিয়াল?'

'মেনে নিচ্ছি। সর্বান্তঃকরণে। ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া কোথাকার!' প্রথম অংশটুকু জোরে, শেষের অংশটুকু নিজের দাড়িকে শুনিয়ে বললো লিটল জন।

'ঠিক আছে। এবার সিধে রাস্তায় নিজের কাজে চলে যাও। খোদার কাছে হাজার শোকর করো যে খুবই দয়ালু এক লোকের পাল্লায় পড়েছিলে আজ। যাও, ছেড়ে দিলাম।'

'তোর দয়ার নিকুচি করেছি আমি!' বিড় বিড় করে বললো লিটল জন।

'কি বললে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো আর্থার।

'না, বলছিলাম কি, মনে হচ্ছে চুর চুর হয়ে গেছে পাঁজরার হাড়গুলো। আমার ধারণা ছিল গোটা নটিংহামশায়ারে আমার সমান লাঠিয়াল আর একজনও নেই।'

'আমারও তাই ধারণা ছিল,' বলেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রবিন হুড। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার অবস্থা হয়েছে ওর, পানি এসে গেছে চোখে। 'বাহবা, বাহবা! কী মার!' হতভম্ব আর্থারের হাতে তিনটে গিনি গুঁজে দিলো সে। 'কাজের কাজ করেছো, ভাই, একটা!' ফিরলো লিটল জনের দিকে। 'পুরোটা মারপিট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি আমি ওই ওখানে শুয়ে শুয়ে। বেড়ে মার খেয়েছো, যাই বলো। এক্কেবারে হামাগুড়ি দিইয়ে ছেড়েছে। তোমাকে খুঁজছিলাম আমি কিছুটা ঝাল ঝাড়বো বলে, আমার নির্দেশ অমান্য করার জন্যে নতুন নতুন গালাগালি তৈরি করতে করতে ছুটছিলাম তোমার পিছন পিছন। কিন্তু এই পরম দয়ালু ব্যক্তিটি সব সাধ মিটিয়ে দিয়েছে আমার। তোমার যা পাওনা কড়ায় গণ্ডায়, সুদে আসলে মিটিয়ে আরও কিছু বেশি দিয়ে দিয়েছে।'

উঠে বসেছে লিটল জন, মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে চিরতার পানি খাওয়ানো হয়েছে ওকে দুই গ্লাস। আর্থারের দিকে ফিরলো আবার রবিন হুড। 'তোমার নামটা কি, ভাই?'

'লোকে আমাকে আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড বলে ডাকে,' বললো আর্থার। 'তোমার নাম কি? আর এই গিনি দেয়ারই বা কি অর্থ?'

'পুরস্কার বা মজুরী, যাই বলো–ওটা তোমার। একে কষে পিট্টি লাগাতে পারলে তোমাকে দেব বলে ঠিক করেছিলাম মনে মনে,' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলো রবিন। 'কি বললে? আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড? আরে, তোমাকে তো আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে। গত অক্টোবরে ইলির মেলায় তুমি নটিংহামের জকের চাঁদি ফাটিয়ে দিয়েছিলে না? ওই জক হচ্ছে আমাদেরই এক লোক, উইল স্কেদলক। কিন্তু আজ তুমি যা দেখালে তার তুলনা নেই। এই যে ভদ্রলোক, মাটিতে বসে গা-হাত-পা টিপছেন, চেনো একে? আজ একটু বেকায়দায় পেয়ে মারধোর করেছো বটে, কিন্তু সারা ইংল্যাণ্ডে লাঠি খেলায় এর জুড়ি নেই। সত্যিই নেই। এর নাম লিটল জন। আমি রবিন হুড।'

'অ্যাঁ!' ছানাবড়া হয়ে গেল আর্থারের চোখ দুটো। 'তু-তুমিই সেই মহান রবিন হুড? আর এ সেই বিখ্যাত লিটল জন–যাকে আমি পীরের মত ভক্তি করি? ছি, ছি, ছি, ছি! পরিচয়টা আগে জানলে তোমার বিরুদ্ধে লাঠি ধরার দুঃসাহস হতো না আমার,' ছুটে গেল সে লিটল জনের পাশে। সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়ালো। 'এসো, ভাই

লিটল জন, ওঠো, জামা কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছি আমি।'

'থাক, থাক–লাগবে না, আমি নিজেই উঠতে পারবো,' ঝাঁঝিয়ে উঠলো লিটল জন। সাবধানে উঠে দাঁড়ালো। এতই সাবধানে, যে দেখে মনে হচ্ছে ওর হাড়গোড় সব কাঁচ দিয়ে তৈরি, ভেঙে যেতে পারে যখন-তখন। ব্যথায় বিকৃত চোখ মুখ। বললো, 'খেলেছো ভাল, তবে জেনে রাখো, মাথায় ওই চামড়ার টুপিটা না থাকলে কপালে খারাবী ছিল আজ তোমার।'

লিটল জনের আড়ষ্ট নড়াচড়ার নমুনা দেখে আর এক পেট হাসলো রবিন, তারপর ফিরলো আর্থারের দিকে।

'আমাদের দলে যোগ দেবে, আর্থার? তোমার মত সাহসী লোকের দরকার আছে আমার। আসবে আমাদের সাথে?'

'নেবে আমাকে?' লাফিয়ে শূন্যে উঠলো আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড। 'যোগ দেব না মানে? একশোবার যোগ দেব। তোমাদের ওই মুক্ত জীবন তো আমার স্বপ্নের জীবন। দুর্গন্ধের মধ্যে বসে চামড়ার কাজ করি, সেটা আমার ভালো লাগে মনে করেছো? মোটেও না। তোমার অনুচর হতে পারা আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

আবার লিটল জনের দিকে ফিরলো রবিন। মুখে মৃদু হাসি। 'সোজা অ্যাংকাস্টারের পথে রওনা হয়ে যাও, বাছা। যাতে ডাইনে-বাঁয়ে অন্য কোনদিকে যেতে না পারো সেজন্যে আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে। ব্লু বোর ছাড়াও আরো অনেক সরাইখানা আছে শেরউডে। বলা যায় না, সেগুলো হয়তো আবার হাতছানি দিয়ে ডাকবে তোমাকে, তাই একেবারে জঙ্গল পার করে দিয়ে তারপর ফিরবো আমরা ডেরায়।'

রাস্তায় ফিরে এসে হাঁটতে শুরু করলো তিনজন।

চার

উইল স্কারলেট

বেশ বেলা হয়ে গেছে। রোদ-ঝলমল রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা তিনজন–রবিন হুড, লিটল জন আর আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড। পথচারী অনেকে থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের। চওড়া কাঁধ, এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, আর কী দৃঢ়, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ–একসাথে এরকম তিনজন যুবকের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না।

'আচ্ছা লিটল জন,' হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করলো রবিন, 'সোজা অ্যাংকাস্টারে না গিয়ে কি মনে করে ব্লুবোরে রয়ে গেলে তুমি কাল? আমার কথা শুনলে আজকে আর এই বিপদে পড়তে হতো না।'

'বৃষ্টির ভয়ে,' বিমর্ষ কণ্ঠে বললো লিটল জন। রবিনের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ায়, এবং প্রচুর বকাঝকা আর টিটকারি হজম করতে হওয়ায় মেজাজটা খিঁচড়ে আছে ওর। এছাড়া বেদম পিট্টি খেয়ে শরীরের নানান জায়গায় কম-বেশি বিভিন্ন ধরনের ব্যথা তো আছেই।

'বৃষ্টি!' পথের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রবিন হুড। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলো লিটল জনের মুখের দিকে। 'ওরে উল্লুক, বৃষ্টি কোথায় পেলে? একটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি গত তিন দিন। বৃষ্টি কেন, কালো মেঘের আভাসও দেখা যায়নি এ তল্লাটে।'

'বৃষ্টি হয়নি ঠিক, কিন্তু হতে তো পারতো,' মুখ আঁধার করে বললো লিটল জন। 'দেবতার ইচ্ছায় বৃষ্টি। ইচ্ছে করলে তিনি পরিষ্কার আকাশ থেকেও বৃষ্টি ঝরাতে পারেন। যদি হতো, তাহলে ভিজে জ্বর আসতো না? তুমি কি তাই চাও?'

কথা শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো রবিন। 'ওরে শয়তান! ভেবে ভেবে কী অপূর্ব যুক্তি খাড়া করা হয়েছে! এর সাথে বেশিক্ষণ রাগ করে থাকে কার সাধ্য!'

অসহায় ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে আবার পা বাড়ালো রবিন হাসিমুখে। রওনা হয়ে গেল সবাই। বেশ কিছুদূর এগিয়ে তেষ্টা পেল রবিনের। গরম হয়ে উঠছে দিনটা। পথের ধুলো খেয়ে শুকিয়ে গেছে গলা। একটা বেড়া-ঝোপের ওপাশে ছোট্ট একটা ফোয়ারা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা, বেড়া ডিঙাবার সিঁড়ি টপকে চলে গেল ওপারে। শ্যাওলা ধরা একটা পাথরের নিচ থেকে বেরোচ্ছে বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। তৃপ্তির সাথে আঁজলা ভরে ভরে পানি খেল ওরা, তারপর একটা ছায়া দেখে শুয়ে পড়লো খানিক বিশ্রাম নিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে।

বেড়ার ওপাশে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে রাস্তাটা, অন্য পাশে শষ্যের খেতে কচি সবুজ পাতার ওপর রোদের মমতা, মাথার ওপর বীচ গাছের পাতায় মৃদু ঝিরঝির। বাতাসে বুনো থাইম আর বেগুনী ভায়োলেট ফুলের হালকা মিষ্টি গন্ধ। ফোয়ারার অস্পষ্ট কুলকুল। নিস্তব্ধ, নিঝুম একটা সুন্দর পরিবেশ। মাঝে মাঝে অখণ্ড নীরবতা ভাঙছে বহুদূর থেকে ভেসে আসা মোরগের বাঁক, কিংবা এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে যাওয়া ভ্রমরের গুঞ্জন, অথবা কাছের কোন গেরস্ত বাড়ি থেকে ব্যস্ত গৃহিণীর উচ্চৈঃস্বর। অনেকক্ষণ একটি কথাও বললো না ওরা, নীরবে আকণ্ঠ পান করে নিচ্ছে যেন স্বর্গের শান্তিধারা। চুপচাপ শুয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখছে অসীম নীল আকাশ। অনেকক্ষণ পর পাশ ফিরলো রবিন, তারপর আস্তে করে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল লিটল জনের পাঁজরে।

'দেখো, দেখো। ননীর পুতুল একটা! এইদিকেই আসছে মক্কেল।'

সবাই দেখলো রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে আসছে এক যুবক। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সৌখিন লোক। উজ্জ্বল লাল রঙের সিল্কের কাপড় তার পরনে, লাল মোজা, মাথায় পরা ভেলভেটের টুপিটাও লাল। বড়সড় একটা সাদা পালক গোঁজা রয়েছে এক কানের পাশে টুপিতে। যুবকের লম্বা, কোঁকড়া, হলুদ চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। এক হাতে একটা গোলাপ–মাঝে মাঝে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছে।

'আহা! কী মিষ্টি!' হেসে উঠলো রবিন। 'যেন সোনার ময়না পাখি! দেখে নাও, লিটল জন, ভাল করে দেখে চক্ষু জুড়িয়ে নাও। এমন মেয়েলী ব্যাটাছেলে টাকায় ষোলটা মেলে না।'

'রঙের বাহার একটু বেশিই মনে হচ্ছে আমার কাছে,' বললো আর্থার। 'তবে ঠিক ননীর পুতুল বলা যাবে না একে। কাঁধ দুটো দেখেছো? যেমন চওড়া কাঁধ, তেমনি সরু কোমর। তাছাড়া হাত দুটো লক্ষ্য করো–ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে না, রীতিমত শক্ত, কনুইয়ের কাছে আবার একটু বাঁকা। উঁহুঁ, দুধের বাচ্চা না; সৌখিন হতে পারে, কিন্তু মেয়েলী বলা যায় না কিছুতেই। আমার বিশ্বাস, ওই ঝলমলে পোশাকের নিচে পেটা একটা শরীর রয়েছে লোকটার।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বললো লিটল জন। 'ঠিকই বলেছে আর্থার। দেখে যতটা মনে হয় ততটা ফুলের পাপড়ি নয় ছোকরা।'

'আরে, দূর!' বললো রবিন হুড। 'এইসব কোমল পেলব পুরুষ দেখলে গা-টা ঘিন ঘিন করে ওঠে আমার। ফুলটা ধরেছে কিভাবে দেখো না, আহা-হা! ওটা দিয়ে এক বাড়ি দিলেই যেন লুটিয়ে পড়বে ধুলায়। নাহ্, ভুল হয়েছে তোমাদের দুজনেরই। সামনে দাঁড়িয়ে একটা ধমক দাও, দেখবে ইঁদুরের মত কিচ কিচ আওয়াজ তুলে গর্ত খুঁজবে; কিংবা বলা যায় না, সোজা মূর্ছা যাবে। ভাবছি, কে হতে পারে লোকটা?'

'কোন বিরাট ব্যারনের আদরের দুলাল, সন্দেহ নেই,' বললো লিটল জন। 'ওর থলিতে চকচকে কিছু মুদ্রা আশা করা অন্যায় হবে না।'

'ঠিক বলেছো,' বললো রবিন। 'এইসব বিলাসপ্রিয় ধনীর দুলাল দেখলে পিত্তি জ্বলে যায় আমার। যখন ভাবি এইসব অকর্মণ্য, অযোগ্য নর্মানদের তর্জনীর ইঙ্গিতে ওদের ইচ্ছেমত উঠতে বসতে হচ্ছে হাজার হাজার স্যাক্সন প্রজাকে, যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা চুষে নিয়ে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে এরা, অথচ যাদের পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্যতা নেই এদের; তাদেরই জমিজমা কেড়ে নিয়ে…'

'হয়েছে, হয়েছে,' হেসে ফেললো লিটল জন। 'ওর থলেটা খানিক হালকা করার জন্যে এত গরম বক্তৃতার দরকার নেই। তবে, মনে হচ্ছে, ভুল হচ্ছে তোমার কোথাও। নর্মানদের তুলনায় অনেক হালকা ওর চুল, আমাদের মত সাচ্চা স্যাক্সন হওয়াও বিচিত্র নয়। খুব সম্ভব অপাত্রে বর্ষণ হচ্ছে…

'বাজি রাখো,' বললো রবিন। 'মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। যাই হোক, একটু পরেই জানা যাবে আসল সত্য। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, একটা কানাকড়িও নেব না, কিন্তু যদি আমার কথাই ঠিক হয়, ওর গা থেকে ছাল ছাড়িয়ে নিতে কেবল বাকি রাখবো। তোমরা বলছো ওর কাপড়ের নিচে পেশী বলে কিছু আছে, বেশ, চুপচাপ এখানে শুয়ে শুয়ে দেখো কিরকম পিট্টি লাগাই।' এই বলে বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো রবিন; দুই কোমরে হাত রেখে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দেখছে আগন্তুককে।

কাছে এসে পড়েছে যুবক। ধীর পায়ে হাঁটছে, মাঝে মাঝে গোলাপটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছে, এদিক তাকাচ্ছে, ওদিক তাকাচ্ছে কিন্তু রবিন হুড বলে যে একটা লোক দুনিয়ায় আছে, লক্ষ্যই করছে না। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো রবিন, তবু ভ্রূক্ষেপ করলো না যুবক, চলার গতি বাড়লো না, কিংবা কমলো না; যেমন আসছিল, আসতেই থাকলো।

'দাঁড়াও!' হুঙ্কার ছাড়লো রবিন। 'যেখানে আছো, দাঁড়িয়ে পড়ো। এক পা সামনে বাড়াবে না!'

'কেন, ভাই?' মৃদু নরম গলায় জানতে চাইলো সুশ্রী যুবক। 'কেন এক পা সামনে বাড়াবো না? আচ্ছা, ঠিক আছে। বলছো যখন, কিছুক্ষণের জন্যে থেমে না হয় শুনেই যাই তোমার কথা।'

'বেশ,' বললো রবিন। 'তুমি যখন আমার কথামত কাজ করছো, নরম, ভদ্র ভাষায় কথা বলছো; ভদ্রতা দেখাতে আমিও কসুর করবো না। আমি হচ্ছি সাধু উইলফ্রেডের পবিত্র প্রতিনিধি। এই পথে যারাই যায়, আমি তাদের কাছ থেকে টোল আদায় করি এবং সে-টাকা ভাল কাজে ব্যয় করি। কাজেই তোমার থলেটা বের করে একটু দেখাতে হবে আমাকে। যদি মনে করি তোমার কাছে যতটা থাকা উচিত তার চেয়ে বেশি আছে, তাহলে বেশিটুকু রেখে দেয়াই আমাদের নিয়ম। সাথে বেশি টাকা রাখা তোমার নিজের জন্যেও খুব একটা মঙ্গলজনক বা নিরাপদ নয়।'

হাসি হাসি মুখ করে রবিনের কথাগুলো শুনছিল আর দু'আঙুলে গোলাপের বোঁটা ধরে সুগন্ধ নিচ্ছিল যুবক, রবিন থামতেই মিষ্টি করে হাসলো। 'বেশ লাগছে কিন্তু,' বললো সে, 'তোমার কথা শুনতে ভালই লাগছে আমার। আরো কিছু বলার থাকলে বলো, ভাই। হাতে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াবার সময় আছে আমার।'

'যা বলার বলেছি,' গম্ভীর স্বরে বললো রবিন। 'এবার বের করে ফেল থলিটা। কথা দিচ্ছি, যদি বেশি কিছু না থাকে, একটা পয়সাও নেব না তোমার থেকে। নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে নিজের পথে।'

'আমি খুবই দুঃখিত,' নরম গলায় বললো যুবক। 'তোমাকে দেয়ার মত তেমন কিছুই নেই আমার। এবার তাহলে আমি আসি? নিশ্চয়ই বাধা দেবে না তুমি আমাকে, কারণ, তোমার তো কোন ক্ষতি করিনি আমি।'

পা বাড়াতে যাচ্ছিল যুবক, হাত তুলে বাধা দিল রবিন। 'খবরদার! থলে না দেখিয়ে যেতে পারবে না তুমি।'

'দেখো, বন্ধু,' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললো যুবক। 'বিশেষ একটা কাজ আছে আমার। তোমাকে যথেষ্ট সময় দিয়েছি, ধৈর্য ধরে সব কথা শুনেছি তোমার, এবার দয়া করে আমাকে নিজের কাজে যেতে দাও। ঝগড়া-ঝাঁটি করে লাভ আছে কিছু?'

'তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে!' দৃঢ় কণ্ঠে বললো রবিন। 'আমার হুকুম অমান্য করে এক পা-ও এগোতে পারবে না তুমি!' বলেই মস্ত লাঠিটা তুললো সে মাথার উপর।

'খুবই দুঃখের বিষয়,' এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বললো যুবক। 'এরকম একটা ঘটনা না ঘটলেও পারতো। কিন্তু এখন তোমাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।' বলেই সোনালী কারুকাজ করা চামড়ার খাপ থেকে সড়াৎ করে এক টানে বের করলো সে তলোয়ারটা।

'তলোয়ার রাখো,' বললো রবিন। 'ওক-ডালের লাঠির সাথে তলোয়ার দিয়ে কিছুই করতে পারবে না তুমি, এক বাড়িতে দু'টুকরো হয়ে যাবে তোমার খেলনা। তারচেয়ে, এই দেখো, ওখানে অনেকগুলো ওকের চারা দেখা যাচ্ছে, পছন্দসই একটা লাঠি কেটে নিয়ে এসোগে যাও। অবশ্য,' যোগ করলো রবিন, 'যদি পিট্টি খেতে আপত্তি না থাকে।'

রবিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বুলালো যুবক, লাঠিটা দেখলো, তারপর বললো, 'ঠিকই বলেছো তুমি। ওই লাঠির কাছে কিছুই না এই তরবারী। ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি লাঠি।' কথাটা বলে শেষবারের মত ঘ্রাণ নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল যুবক ফুলটা, তরবারী খাপে পুরে এগিয়ে গেল ওকের চারাগুলোর দিকে। রবিন লক্ষ্য করলো হাঁটার ছন্দ সম্পূর্ণ বদলে গেছে যুবকের , ধীর-স্থির, ঢিলেঢালা ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছে বেমালুম। পছন্দ মত চারা খুঁজে পেতে দেরি হলো না যুবকের। কাটলো না সেটা,আস্তিন দুটো একটু গুটিয়ে নিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো গাছটার গোড়ার দিকে, তারপর পায়ের গোড়ালি দুটো শক্ত করে মাটিতে গেড়ে

হ্যাঁচকা এক টানে তুলে আনলো সেটাকে শিকড় সহ। তারপর, যেন এমন কোন বিস্ময়কর কাজ করেনি সে, এমনি ভঙ্গিতে, তলোয়ার দিয়ে শিকড় আর ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা ছাঁটতে ছাঁটতে শান্ত পদক্ষেপে ফিরে এলো।

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সব দেখছিল আর্থার আর লিটল জন। গোটা একটা ওকের চারা শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে তুলতে দেখে ঠোঁট দুটো শিস দেয়ার ভঙ্গিতে গোল করে লম্বা করে বাতাস টানলো আর্থার। মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল লিটল জনেরও, সংবিৎ ফিরে পেয়ে নড়েচড়ে উঠলো। 'সব্বোনাশ! দেখলে, আর্থার? মনে হচ্ছে বারোটা বাজবে আজ ওস্তাদের। মাই গড! মড়মড়িয়ে তুলে ফেললো আস্ত গাছটা!'

রবিনের মনের ভিতর কি চলছে বোঝা গেল না, তবে দেখা গেল, পিছু হটবার লক্ষণ নেই তার মধ্যে। মুখোমুখি দাঁড়াল এসে মিষ্টভাষী যুবক। শুরু হলো লড়াই।

অল্পক্ষণেই টের পেয়ে গেল লিটল জন আর আর্থার, গায়ে যে কেবল অসুরের শক্তিই রয়েছে তা নয়, লাঠি খেলার সব কৌশলই জানা আছে যুবকের বিলক্ষণ। রবিনের কলা-কৌশল যদিও আগন্তুকের চেয়ে অনেক উন্নত মানের, ক্ষিপ্রতায়ও তার তুলনা হয় না, কিন্তু কৌশল আর ক্ষিপ্রতা দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে প্রচণ্ড আসুরিক শক্তিকে? দু'জনের দাপাদাপিতে ধুলোর মেঘ সৃষ্টি হলো রাস্তার উপর । মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ওদের। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে খটাখট অদৃশ্য লাঠির ঠোকাঠুকির আওয়াজ। সুযোগ মত তিনটে বাড়ি কষিয়ে দিয়েছে রবিন ইতিমধ্যেইঃ দু'বার পাঁজরে, একবার হাতের উপর। অনেক চেষ্টা করেও একটিবারও রবিনের শরীর স্পর্শ করতে পারেনি যুবকের লাঠি। কপাল ভাল, প্রতিটা আঘাত ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে রবিন; কারণ, যে কোন একটা আঘাতই ওকে ধরাশায়ী করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। যুবক যখন দেখলো কৌশলে কিছুতেই এঁটে ওঠা যাবে না রবিনের সাথে, তখন গায়ের জোর খাটিয়ে ওকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। প্রচণ্ড জোরে মারলো সে রবিনের লাঠির মাঝ বরাবর; এতই জোরে, যে থতমত খেয়ে গেল রবিন, লাঠিটা আঁকড়ে ধরে রাখাও মুশকিল হয়ে পড়লো ওর পক্ষে। সামলে নেয়ার বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে আবারও মারলো যুবক। বাঁকা হয়ে গেল রবিনের শরীরটা সে আঘাত ঠেকাতে গিয়ে। সাথে সাথেই এলো তৃতীয় আঘাত। মড়াৎ করে মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে গেল রবিনের লাঠি, কিন্তু তাতেও আঘাতের গতি কমলো না, দড়াম করে বাড়ি পড়লো রবিনের কাঁধে, ধরাশায়ী হলো সে।

'থামো!' যুবককে আবারও লাঠি তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'থামো, হার মানছি আমি।'

'থামো।' হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলো লিটল জনও। একলাফে বেড়া ডিঙিয়ে লাঠি হাতে ছুটলো সে ওদের দিকে, পিছনে আর্থার। আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'থামো! থামো বলছি!'

'না।' মারমুখো দুইজন ষণ্ডা চেহারার লোক দেখেও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালো না যুবক। শান্ত গলায় বললো, 'আরো লোক থাকলে ডেকে আনো তাদেরকে। আমার সাধ্যমত যুঝবো আমি সবার সাথে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' দুই পাশ থেকে আর্থার আর লিটল জনকে লাঠি তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। হাত তুলে এগোতে নিষেধ করলো সঙ্গীদের। 'আর মারামারি নয়। দেখা যাচ্ছে দিনটা তোমার-আমার কারো জন্যেই ভালো যাচ্ছে না। বাপরে বাপ! হাতের আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত অবশ হয়ে গেছে। এত জোরও থাকে মানুষের গায়ে!'

রবিনের দিকে ফিরলো লিটল জন। 'আহা-হা, খুব ব্যথা লেগেছে বুঝি, ওস্তাদ? সত্যিই বড় দুঃখজনক ব্যাপার। ধুলো-টুলো লেগে জামা-কাপড় এক্কেবারে শেষ। উঠে পড়ো, আমার হাতটা ধরে উঠে পড়ো।'

'কুষ্ঠ হোক তোর হাতে!' রেগে মেগে বললো রবিন। 'লাগবে না, আমি নিজেই উঠতে পারবো।'

'বেশ, উঠে দাঁড়াও, তোমার কোটটা অন্ততঃ ঝেড়ে দেয়া উচিত আমার। আহা! এখনও কি ঝনঝন করছে হাড়গোড়গুলো?' সমবেদনার সুরে বললো লিটল জন, কিন্তু ওর চোখ দুটো চিক চিক করছে দেখে খেপে গেল রবিন।

'থামবে তুমি, লিটল জন? টিটকারি মারার আর সময় পেলে না?' কথাটা বলেই হাসি হাসি হলো রবিনের মুখটা। 'যা ঝাড়ার ঝেড়ে দিয়েছে এই ছোকরা।' লাল পোশাক পরা যুবকের দিকে ফিরলো এবার সে, 'তোমার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম গ্যামওয়েল,' বললো যুবক।

'তাই নাকি? আরে!' ভুরু কুঁচকে উঠলো রবিনের। 'ওই নামের নিকটাত্মীয় আছে আমার। বাড়ি কোথায় তোমার, বলো তো?'

'ম্যাক্সফিল্ড শহর থেকে আসছি আমি,' বললো যুবক। 'ওখানেই জন্ম, ওখানেই মানুষ। এখানে এসেছি আমার মামাকে খুঁজতে।'

'মামা?'

'হ্যাঁ। আমার মায়ের ছোট ভাই। লোকে তাকে ডাকে রবিন হুড বলে। যদি তোমরা কেউ বলতে পার কোনদিকে গেলে তার দেখা...'

'আরে! উইল গ্যামওয়েল!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল রবিনের দুই চোখ। দুই হাতে চেপে ধরলো যুবকের দুই কাঁধ। 'তাই তো! সে-ই তো দেখছি! তোমার ওই সুন্দর মেয়েদের মত চুল দেখেই চিনতে পারা উচিত ছিল আমার। তাছাড়া হাঁটার ভঙ্গিটাও মনে পড়ছে এখন। হাসিটাও চিনতে পারছি। ওরে শয়তান! চিনতে পারছিস আমাকে? ভাল করে দ্যাখ তো চেয়ে?'

'সত্যিই তো!' এবার অবাক হবার পালা যুবকের। 'তুমিই তো রবিন মামা!' এই বলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো সে মামাকে, চুমো খেলো দুই গালে।

খুশিতে চিকচিক করছে রবিনের চোখ। যুবকের গালে কপালে চুমো খেয়ে বললো, 'আশ্চর্য! আট-দশ বছর আগে কি দেখেছিলাম, এখন কি!' যুবকের আপাদমস্তক দেখলো সে চোখ বুলিয়ে। 'এত বড় হয়ে গেছিস! মনে আছে, কিভাবে তীর-ধনুক ছুঁড়তে হয়, কিভাবে লাঠি ধরতে হয় শিখিয়েছিলাম আমি তোকে?'

'সব মনে আছে,' বললো উইল। 'ছোটবেলা থেকে তোমাকেই দুনিয়ার সেরা বীরপুরুষ বলে জেনে আসছি। সত্যিই, তোমার পরিচয় জানলে তোমার বিরুদ্ধে লাঠি ধরার সাহস হতো না আমার আজ। খুব বেশি ব্যথা লাগেনি তো, মামা?'

'আরে না, না,' চট করে আড়চোখে লিটল জনকে দেখে নিয়ে বললো রবিন, 'কিচ্ছু লাগেনি। ওসব কথা থাক। তবে, প্রার্থনা করি, ওরকম প্রচণ্ড মার ঠেকানোর মন্দ ভাগ্য যেন জীবনে আর না হয়। ওরেব্বাপ, আঙুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত কনকন করছে এখনও! আমারই আপন ভাগনের গায়ে এত জোর দেখে গর্ব হচ্ছে এখন,কিন্তু তখন হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছিল, ওকের চারা টেনে উপড়ে আনতে দেখে শুকিয়ে গিয়েছিল কলজেটা। যাই হোক, স্যার এডওয়ার্ড আর তোর মাকে ছেড়ে চলে এলি যে?'

'খুনের অপরাধে খোঁজা হচ্ছে আমাকে, তাই পালিয়ে এসেছি। আমাদের স্টুয়ার্ড গ্রিমকে মনে আছে তোমার?'

'মনে আছে। খুবই পাজি লোক। ওকে যদি মেরে থাকো, আমার ধারণা ঠিক কাজই করেছো।'

'শোনোই না,' বললো উইল। 'আমাদের প্রতিবেশী ব্যারন ডি লেসির অনেকদিন থেকেই চোখ ছিল আমাদের জমি-জমার ওপর। এগুলো দখল করতে পারলে বিরাট এক এস্টেটের মালিক হতে পারবে সে। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন, একমাত্র সন্তান আমি,

কাজেই আমাকে খুন করতে পারলে উত্তরাধিকারীর অভাবে আমাদের সবকিছু চলে যাবে তার হাতে। এই ভেবে টাকা পয়সা দিয়ে হাত করে গ্রিমকে লাগিয়েছিল সে আমার পেছনে।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'তারপর?'

'একদিন শিকারে গেছি, গ্রিমও সাথে এলো। ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ জাগেনি আমার মনে। একটা ফাঁকা জায়গার কাছাকাছি অপেক্ষা করছি, হরিণ দেখা গেলেই তীর ছুঁড়বো, হঠাৎ কেমন যেন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো। নিজের অজান্তেই পিছন ফিরলাম। দেখি, ধনুকে তীর লাগিয়ে টেনে ছিলাটা কানের পাশে নিয়ে গেছে গ্রিম–তীরের লক্ষ্যস্থল আমি। এক লাফে সরে গিয়ে ওকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা করলাম, আর সেই একই সঙ্গে চট্ করে একটা তীর জুড়ে ফেললাম ধনুকে। একই সাথে তীর ছুঁড়লাম দুজন। ওরটা আমার ডাবলেট (এক ধরনের প্রাচীন আঁটো পোশাক) ভেদ করে সামান্য আহত করলো আমাকে, কিন্তু আমারটা সোজা গিয়ে বিঁধলো ওর বুকে–পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মারা গেল গ্রিম। মরার আগে ডি লেসির নীচ চক্রান্তের কথা সব স্বীকার করে গেছে ও।'

'তারপর?'

'গ্রিমের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র শেরিফকে লেলিয়ে দিল ডি লেসি আমার পেছনে। গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে শেরিফের লোক রওনা হয়েছে জানতে পেরে পালিয়ে এসেছি আমি তোমার কাছে।'

'ভাল করেছো,' বললো রবিন। 'কিন্তু ওই কি পালাবার নমুনা? আমরা তো ভেবেছিলাম বেড়াতে বেরিয়েছে কোনো বড়লোকের বখে যাওয়া বিলাসী নন্দন। অমন ধীরেসুস্থে...'

'আমার শরীরের অস্বাভাবিক শক্তিই হয়তো এর কারণ,' বললো উইল। 'তাড়াতাড়ি নড়তে চড়তে পারি না। এই দেখো না, একটু আগে তিন তিনবার মেরেছো তুমি আমাকে, অথচ আমি একবারও একটা বাড়ি লাগাতে পারিনি তোমার গায়ে, শেষ পর্যন্ত কৌশল বা ক্ষিপ্রতায় না পেরে গায়ের জোরে মারতে মারতে...'

'থাক, থাক,' ব্যস্ত কণ্ঠে বললো রবিন। 'ওসব কথা থাক। তোমাকে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি আমি। দলের সবাই খুশি হবে তোমাকে দেখে। কিন্তু, আইনের লোক যখন খুঁজছে তোমাকে, তোমার নামটা একটু পরিবর্তন করে নেয়া ভালো । এখন থেকে তোমাকে ডাকবো আমরা উইল স্কারলেট বলে। কেমন?'

'উইল স্কারলেট,' এগিয়ে এলো লিটল জন করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে, 'বাহ্, চমৎকার হয়েছে নামটা। স্কারলেট রঙের পোশাক পরে এসেছো তুমি, তাই তোমার নাম উইল স্কারলেট। আমি লিটল জন। আর এ হচ্ছে তোমারই মত রবিন হুডের নতুন অনুচর, আর্থার এ-ব্ল্যাণ্ড। আমি বলে দিচ্ছি, দারুণ নাম করবে তুমি উইল, তোমাকে নিয়ে গাথা রচনা করবে এই অঞ্চলের কবিরা, ঘরে ঘরে বয়ান হবে তোমার কাহিনী, চারণ কবিরা গাইবে গান। সবাই হাসবে, বড়াই করে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে কিরকম পিট্টি খেয়েছিল দস্যু রবিন হুড তার আপন ভাগ্নের হাতে, সেই উপাখ্যান শুনে।'

'এই, না, লক্ষ্মী জন,' মিনতির সুরে বললো রবিন, 'এসব নিয়ে কাউকে কিছু বলার কি দরকার? তোমাকে নিয়েও তো হাসবে লোকে। তারচেয়ে আজকের এই সামান্য ঘটনাগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে চেপে রাখলেই তো পারি। কি বলো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললো লিটল জন। 'বারণ করলে কাউকে কিচ্ছুটি বলবো না। আমি ভেবেছিলাম হাসির গল্প বুঝি খুব পছন্দ করো তুমি। এই যেমন খানিক আগে বলছিলে আর্থারের হাতে আমার পিট্টি খাওয়ার গল্পটা দারুণ জমবে, মনে মনে সাজাচ্ছিলে কি রকম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলবে কাহিনীটা সবাইকে।'

'না, না। ভুলে যাও। ওসব সামান্য কথা। কাউকে বলবো না আমি, কথা দিচ্ছি।'

'কাল সন্ধ্যার সেই মেঘের ব্যাপারটা নিয়েও কি কি সব রসিকতা যেন আসছিল তোমার মাথায়, আর···'

'কিসের রসিকতা?' ঝাঁঝালো গলায় বললো রবিন। 'আসলে ভুল হয়েছিল আমারই। এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, মেঘ ছিল আকাশে, ঝড়-তুফানের খুবই আশঙ্কা ছিল কাল।'

এক গাল হাসলো লিটল জন। 'আমারও তাই মনে হয়েছিল। তার মানে, তুমি স্বীকার করছো ওই ঝড়-তুফানের মধ্যে ভিজে অ্যাংকাস্টারের দিকে না গিয়ে ব্লু-বোরে রাত কাটিয়ে ভালই করেছি, তাই না?'

'মর তুই, ব্যাটা!' সরোষে বললো রবিন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই করেছিলে।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ,' বললো লিটল জন। 'আজকে কিচ্ছু দেখিনি আমি। তোমাকে মার খেতে দেখিনি, ডিগবাজী খেয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি করতে দেখিনি, আরো পিট্টির ভয়ে কাকুতি-মিনতি করে হার মানতে দেখিনি। যদি কোন দুষ্ট লোক এই ধরনের কোন বানোয়াট মিথ্যা কথা বলে, আমার নাম লিটল জন, টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো তার জিভ!'

খুক খুক করে হেসে উঠলো সবাই, কিন্তু রবিন গম্ভীর। 'চলো,' বললো সে, 'আর এগোবো না আমরা আজ। অ্যাংকাস্টারে আরেক সময় গেলেই হবে। শেরউডে ফিরবো আমরা এখন।'

এই বলে কারও দিকে না চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে পা বাড়ালো সে ফিরতি পথে।

পাঁচ

মিজ দ্য মিলার

লম্বা পা ফেলে ফিরে চলেছে ওরা শেরউডের দিকে। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লো রবিন। পথের মাঝখানে কোথাও খাবার পাওয়া যাবে না জানা কথা, তবু বললো সে, 'এখন একটা পাঁউরুটি, বড়সড় এক টুকরো সাদা পনির, আর কয়েক ঢোক হাম্বিং এল হলে কেমন হতো বলতো?'

'উফ,আর বলো না, মামা,' ককিয়ে উঠলো উইল স্কারলেট। 'মনে হচ্ছে পেটের ভেতর কুস্তি করছে নাড়ীভুঁড়িগুলো। কথা শুনেই জিভে পানি এসে গেছে আমার।'

'কাছাকাছিই একটা বাড়ি চিনি আমি,' বললো আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড। 'টাকা দিলে কিনে নিয়ে আসা যায় এসব ওখান থেকে—পাঁউরুটি, পনির, এল···সব।'

'টাকা তো আছে আমার কাছে,' বললো লিটল জন, 'দেব নাকি?'

'ঠিকই তো। তোমার কাছে তো টাকা ছিল,' বললো রবিন। 'আমাদের সবার জন্যে খাবার কিনতে কত লাগবে, আর্থার?'

'আমার মনে হয় ছয় পেনি দিলে যথেষ্ট খাবার পাওয়া যাবে, বারোজন খেয়েও শেষ করা যাবে না,' বললো আর্থার।

'ঠিক আছে, ছয় পেনি দিয়ে দাও ওকে, লিটল জন। মনে হচ্ছে তিনজনের খাবার একাই খেতে পারবো আমি। তোমাদেরও নিশ্চয়ই একই অবস্থা? ছয় পেনিই দাও। আমরা রাস্তার পাশে ওই ঝোপের ছায়ায় বসছি, তুমি ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এসো, আর্থার।'

ছয় পেনি নিয়ে চলে গেল আর্থার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো সে ইয়া বড় এক

পাঁউরুটি আর বড়সড় এক চাকা পনির নিয়ে, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে ছাগলের চামড়ার এক-মশক বিয়ার। তলোয়ার দিয়ে সমান চার টুকরো করলো উইল স্কারলেট রুটি আর পনির। কালবিলম্ব না করে খেতে বসে গেল সবাই। গোগ্রাসে গিলছে রুটি আর সুস্বাদু পনির, সেই সাথে হাত বদল হচ্ছে বিয়ার ভর্তি মশকটা–যার যত খুশি টেনে চলেছে বিয়ার। খাবারও শেষ, বিয়ারও শেষ। শহুরে ব্যবসায়ীর মত পেট-মোটা মশকের অবস্থা দাঁড়ালো অশীতিপর বৃদ্ধের ঝুলে পড়া শিথিল চামড়ার মত।

'আহ্!' তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো রবিন। 'মনে হচ্ছে জীবনে এত ভাল খাবার খাইনি। যেন নতুন প্রাণ ফিরে এলো ধড়ে। এক্ষুণি যাত্রা করলে নষ্ট হয়ে যাবে আমেজটা। এসো, খানিক বসে যাই। উইল, যতদূর মনে পড়ছে, চমৎকার গলা ছিল তোমার এক কালে। ধরবে নাকি একটা গান?'

'আমার আপত্তি নেই,' বললো উইল স্কারলেট, 'কিন্তু একা গাইবো না আমি।'

'বেশ তো, সবাই গাইবে তোমার সাথে। নাও, ধরো, শুরু করো।'

খুক করে একটু কেশে নিয়ে সুন্দর একটা গান ধরলো উইল স্কারলেট।

'কে আসে রে?' গানের মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলো রবিন। 'ওই যে, রাস্তা দিয়ে আসছে।'

'জানি না,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো লিটল জন। 'যার খুশি আসুক, যাক–আমাদের কি? কেউ এলেই একটা ভাল গানের মাঝখানে কথা বলে উঠতে হবে?'

'রাগ করছো কেন, ভাই? অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, পিঠে মস্ত একটা বোঝা নিয়ে বাঁকা হয়ে হাঁটছে লোকটা। তাকিয়ে দেখো না একটু, চিনতে পারো কিনা? কে ও?'

রবিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো লিটল জন। 'ওহ্, এই লোক একজন মিলার। ময়দা পেষার জাঁতাকলে কাজ করে। প্রায়ই দেখি আমাদের শেরউডের একটা রাস্তা দিয়ে যায়, আসে। খেটে খাওয়া গরীব এক যুবক। ওর জন্যে ভাল একটা গান নষ্ট করার কোন মানে দেখি না।'

'মনে হচ্ছে লোকটাকে আমি দেখেছি বেশ কয়েকবার,' বললো রবিন। 'নটিংহাম শহর ছাড়িয়ে ওই সেলসবারি রোডের একটা মিলে কাজ করে না?'

'ঠিক ধরেছো। এ সেই লোক।'

'লোকটা ভাল,' বললো রবিন। 'লাঠিও খেলে ভাল। হপ্তাদুয়েক আগে ব্র্যাডফোর্ডের নেডকে খুব পিটিয়েছে। চাঁদি ছিলে দিয়েছে একেবারে। আমি ছিলাম।'

ইতিমধ্যে অনেকটা কাছে এসে পড়েছে তরুণ মিলার, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওকে। ময়দা লেগে আছে জামা-কাপড়ে, মস্ত এক বস্তা ভর্তি ময়দা রয়েছে লোকটার পিঠে। বোঝার ভারে বাঁকা হয়ে হাঁটছে লোকটা, কিন্তু তাই বলে নিত্য সঙ্গী মোটাসোটা লাঠিটা ত্যাগ করেনি–বস্তার সাথেই বাঁধা আছে সেটা আড়াআড়ি ভাবে। দৃঢ় পদক্ষেপে চলার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, রীতিমত শক্তিশালী লোক, বোঝার ভারে আরো ফুলে উঠেছে পেশীগুলো, মনে হচ্ছে ছোটখাটো দৈত্য একটা। মুখটা লাল, চুল-দাড়ির রঙ ঠিক শনের মত।

'খুবই সৎ লোক,' আবারও বললো রবিন। 'এরকম একজন নাগরিক যে-কোন দেশের গর্ব।' হঠাৎ চকচক করে উঠলো রবিনের চোখ দুটো। মৃদু হেসে বললো, 'এর সাথে খানিক মজা করলে কেমন হয়? চারজন একসাথে ঘিরে ধরবো ওকে, হাঁক-ডাক ছেড়ে ঘাবড়ে দেব, যা আছে সব কেড়ে নেয়ার ভান করবো, তারপর ওকে ধরে নিয়ে যাবো আমাদের আস্তানায়। সেখানে তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খাইয়ে ছেড়ে দেব ওর থলেতে যতগুলো পেনি আছে তার বদলে ততগুলো ক্রাউন ভরে দিয়ে। কি বলো তোমরা? কেমন হয়?'

'খুব মজা হয়, সত্যিই!' বললো উইল স্কারলেট।

'মজা তো হয় ঠিকই,' লিটল জন বললো। 'কিন্তু খোদা না খাস্তা আজ যদি আরো পিট্টি খেতে হয়, তাহলে নির্ঘাৎ মারা পড়বো। কাজ নেই এসব তামাশায়। আমার সারা শরীরের হাড্ডিগুলো ব্যথায়…'

'তোমার খালি অলক্ষুণে কথা!' ধমক মারলো রবিন। 'নির্দোষ রসিকতার মধ্যেও তিনি গন্ধ পাচ্ছেন বিপদের! এর মধ্যে মারামারির কথা আসছে কোত্থেকে? মারধোর করতে যাচ্ছে কে? সারাদিনে মারপিট যথেষ্ট হয়েছে, এবার হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে সুন্দর ভাবে শেষ হোক দিনটা–কি বলো তোমরা?'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল, কথা বললো না, কারণ একেবারে কাছে এসে পড়েছে মিলার লোকটা। লিটল জন শুধু বিড় বিড় করে বললো, 'কি বিপদেই যে ফেলতে যাচ্ছে, আল্লাই মালুম!'

'চুপ!' ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলো রবিন।

ঝোপের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো লোকটা। হঠাৎ হারে-রে-রে-রে করে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরলো ওকে ডাকাতের মত চারজন। 'অ্যাই, দাঁড়াও!' হুঙ্কার ছাড়লো রবিন হুড।

কাঁধের বোঝা সমেত ধীরে ধীরে ঘুরলো লোকটা, একে একে দেখলো সবাইকে বিস্মিত দৃষ্টিতে। কেমন যেন থতমত খাওয়া চেহারা। বোঝা গেল, গায়ে জোর থাকতে পারে, মগজ ততটা জোরালো নয় লোকটার।

'কে থামতে বললো আমাকে?' গুরুগম্ভীর গলা, মস্ত এক কুকুরের চাপা গর্জনের মত শোনালো।

'আমি বলেছি,' আর এক পর্দা চড়িয়ে দিল রবিন গলার স্বর।

'কে তুমি জানতে পারি?' কাঁধ থেকে ময়দার বস্তাটা ধুপ করে ফেললো সে মাটিতে। 'তোমার সাথের এরাই বা কারা?'

'আমরা চারজন ধার্মিক খ্রিস্টান,' বললো রবিন। 'এত ভারি বোঝা টানছো দেখে ঠিক করেছি হালকা করে দেব তোমার বোঝা। তোমার হয়ে আমরা চারজন কিছু কিছু করে মোট ভাগ করে নেব।'

'তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললো মিলার। 'কিন্তু আমার বোঝাটা অতখানি ভারি নয় যে আমি নিজে বইতে পারবো না।'

'ঠিক বুঝতে পারনি, ভায়া,' বললো রবিন। 'তোমার ওই ময়দার বোঝার কথা বলছি না। বলছি ওই কোমরে গোঁজা থলেটার কথা। মনে হয় ওটা তোমার জন্যে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে গেছে, আমরা ক'জন ভাগাভাগি করে নিলে হালকা হয়ে যাবে তুমি।'

'হায়!' বললো মিলার। 'কি নেবে তোমরা? একটা ফুটো পয়সাও তো নেই আমার কাছে। আমি গরীব মানুষ, কোথায় পাবো টাকা? দয়া করে যেতে দাও আমাকে। আমাকে মারধোর করে কোন লাভ হবে না তোমাদের। তাছাড়া, তোমাদের মনে রাখা দরকার, রবিন হুডের এলাকায় দাঁড়িয়ে আছো তোমরা।'

'রবিন হুড! সে আবার কে?' জানতে চাইলো রবিন কৌতুকের সুরে।

'গরীবের বন্ধু, অত্যাচারীর যম। যদি জানতে পারে আমার মত একজন দরিদ্র শ্রমিককে হয়রানি করেছো, কান কেটে গাছে ঝুলিয়ে দেবে সে তোমাদের।'

'তাই নাকি? চেনা-জানা আছে নাকি তার সাথে তোমার?'

'চিনি না, কিন্তু জানি। আমার নালিশও জানাবার দরকার পড়বে না, বাতাসে ভেসে খবর পৌঁছে যাবে তার কানে। দুনিয়ার কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না তোমরা তার হাত থেকে।'

'তাহলে তো খুব ভয়ের কথা!' কপট ভয়ের অভিনয় করলো রবিন, তারপর চোখ-

মুখ কুঁচকে নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো চেহারায়। 'তুমি ভেবেছো রবিন হুডকে ভয় করি আমি? নিজেকে যতটা কেয়ার করি তার চেয়ে এক কানাকড়িও বেশি কেয়ার করি না আমি রবিন হুডকে। ভালোয় ভালোয় বের করে ফেলো পয়সা-কড়ি যা আছে সব।'

বস্তার সাথে বাঁধা লাঠিটার দিকে চাইলো একবার লোকটা। সাথে সাথেই ধমক মারলো রবিন, 'খবরদার! ওদিকে এক ইঞ্চি হাত বাড়ালেই এক বাড়িতে কান ফাটিয়ে দেব!'

'না, না···মেরো না আমাকে!' দু'হাত তুলে কান ঢাকলো মিলার। 'কিন্তু পয়সা পাব কোথায়? ইচ্ছে হয় তালাশ করে দেখো, একটা পয়সাও নেই আমার পকেটে।'

'বিশ্বাস করি না,' হুঙ্কার ছাড়লো রবিন। 'একটা পয়সাও নেই, তা হতেই পারে

না। কোনো সন্দেহ নেই, বস্তার মধ্যে হাত দিলেই বেরিয়ে পড়বে আসল সত্য। আর্থার, ঢালো তো। বস্তায় যা আছে সব ঢেলে ফেলো মাটিতে। আমার বিশ্বাস ময়দার মধ্যে কমপক্ষে দুটো শিলিং পাওয়া যাবে।'

'হায় রে!' হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো মিলার বস্তার পাশে। 'খাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি ময়দাগুলো, সব নষ্ট হবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। ঠিক আছে, মাটিতে ঢালার দরকার নেই, আমি নিজেই বের করে দিচ্ছি ময়দার নিচে লুকানো টাকা।'

'এই দেখো!' কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো রবিন স্কারলেটকে। 'বলেছিলাম না, এই ব্যাটার কাছে অনেক টাকা আছে। টাকার গন্ধ পাই আমি, যেখানেই লুকানো থাক না কেন, ঠিক বের করে দেব চিনে, হ্যাঁ! কি হলো, নিজেই বের করবে, নাকি ঢালবো সব মাটিতে?'

ধীরে ধীরে বস্তার মুখের বাঁধন খুলছে মিলার, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ধীরে ধীরে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ঢুকিয়ে দিল ময়দার ভেতর, খুঁজছে কি যেন। ঝুঁকে এলো সবাই কি বের হয় দেখার জন্যে। বস্তার ভেতর হাতড়াচ্ছে মিলার, হঠাৎ বললো, 'এই যে, পেয়েছি থলিটা।'

কথা শুনে আরো ঝুঁকে এলো সবক'টা মাথা। হাত বের করে আনছে মিলার। হঠাৎ, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই, দুই মুঠো ময়দা ছুঁড়ে দিল সে ওদের চোখেমুখে। নাক দিয়ে ময়দা ঢুকে দম বন্ধ হওয়ার দশা হলো সবার, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না চোখে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হলো আর্থার এ ব্ল্যাণ্ডের। হাঁ হয়ে গিয়েছিল ওর মুখটা, শুকনো খসখসে ময়দা ঢুকে গেছে গলায়, অদম্য কাশিতে বাঁকা হয়ে গেল সে।

হাউমাউ করে উঠলো বাকি তিনজন। দুই হাতে চোখ ডলছে, দরদর করে পানি নামছে গাল বেয়ে–কিন্তু রেহাই নেই, মুঠো মুঠো ময়দা তুলছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে মিলার ওদের চোখ-মুখ-নাক লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নটিংহামশায়ারের অন্ধ ভিখারীর মত অবস্থা হলো সবার, চুল দাড়ি জামা-কাপড় সাদা হয়ে গেছে ময়দা লেগে।

এবার মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল মিলার। কোন বাছ-বিচার না করে দমাদম পিটিয়ে চললো সে সমানে। মার খেয়ে তারস্বরে চিৎকার করছে সবাই, কিন্তু না পাচ্ছে কিছু দেখতে, না পারছে আত্মরক্ষা করতে, না পালাতে। এদিক ওদিক এলোপাতাড়ি পা ফেলে গা বাঁচাবার চেষ্টা করছে সবাই, পড়ে যাচ্ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, কেউ আবার ছুটে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে গাছের সাথে।

ধুপ! ধাপ! চড়াৎ! খট!–মনের সুখে মেরে চলেছে মিলার পাইকারি হারে। প্রতিটা বাড়ির সাথে সাথে ময়দার মেঘ উঠছে ওদের জামা-কাপড় থেকে।

'থামো! থামো!' আর সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, 'মার থামাও, আমি রবিন হুড।'

'তাই নাকি?' হেসে উঠলো মিলার। 'মিছে কথার আর জায়গা পেলে না?' এই বলে পর পর কয়েকটা বাড়ি মেরে ধোঁয়া ছুটিয়ে দিল সে রবিনের জামা-কাপড় থেকে। 'গরীব মানুষের টাকা কেড়ে নেবে মহান রবিন হুড? কী মনে করেছো তুমি তাকে? তোমাদের মত ছ্যাঁচড়া চোর? পিটিয়ে খুন করে ফেলব আজ!' বলেই কষে আরেক বাড়ি লাগালো সে তার পিঠে। তারপর ফিরলো লিটল জনের দিকে, 'আরে! তোমার ভাগে তো কম পড়ে যাচ্ছে, ধেড়ে শয়তান! আমার কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে, সমান ভাগে ভাগ করে নেয়া উচিত তোমাদের সবার।' এই বলে লিটল জনের কাঁধের ওপর এমন এক বাড়ি লাগিয়ে দিল যে টলমল করে কয়েক পা গিয়েই উইল স্কারলেটের পায়ে পা বেধে হুড়মুড় করে পড়লো সে রাস্তার উপর। 'আর তুমি? এবার তোমার পালা না কালো-দাড়ি?' বলেই খটাশ করে মারলো আর্থার এ ব্ল্যাণ্ডের চাঁদির ওপর। কাশতে কাশতেই হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠলো আর্থার। 'এবার লাল মিঞা। কাপড়টা

তো সাদা হয়ে গেছে একেবারে। এসো, এসো, ঝেড়ে দিই ময়দাগুলো।' চড়াৎ চড়াৎ শব্দে ধুলো ঝাড়ছে সে উইল স্কারলেটের জামা থেকে।

এইভাবে মজার মজার মন্তব্য করছে আর একনাগাড়ে মেরে চলছে মিলার, হেসে খুন হয়ে যাচ্ছে ওদের দুরবস্থা দেখে। যখনই মনে হয় চোখের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে ওদের কেউ, আরও একমুঠ ময়দা ছিটিয়ে দেয় সে। মারতে মারতে একেবারে কাহিল করে ফেললো সে চার-চারজন তাগড়া জোয়ানকে। টলছে সবাই, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই।

নির্ঘাৎ মারা পড়বার উপক্রম হয়েছে দেখে শেষ পর্যন্ত শেষ চেষ্টা হিসেবে শিঙাটা তুললো রবিন মুখে। জোরে ফুঁ দিল তিনটে। সম্ভাবনা কম, তবু বলা যায় না, কাছে পিঠে থাকতেও পারে দলের লোকজন।

এদিকে যখন এই পাইকারী পিট্টি চলছে, কাছাকাছিই একটা বুনো পথ ধরে যাচ্ছিল উইল স্টিউটলি এবং রবিন হুডের আরো কয়েকজন অনুচর। কয়েকজনের তারস্বরে চিৎকার আর চড়াৎ চড়াৎ লাঠির আওয়াজ কানে যেতেই থেমে দাঁড়ালো ওরা, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে, বোঝার চেষ্টা করছে ঘটনাটা কি।

'মনে হচ্ছে, লাঠি খেলা চলছে কাছেই কোথাও। চলো, দেখা যাক মজাটা,' বললো উইল স্টিউটলি। কিন্তু কয়েক কদম এগিয়েই পরিষ্কার শুনতে পেল সে রবিনের শিঙার সংকেত। মুহূর্তে সম্পূর্ণ বদলে গেল ওর চাল চলন। 'জলদি! কাছেই কোথাও বিপদে পড়েছে রবিন!'

প্রাণপণে ছুটলো ওরা আওয়াজ লক্ষ্য করে। সবার আগে উইল স্টিউটলি আর ডংকাস্টারের ডেভিড। দৌড়ে এসে রাস্তায় পড়েই থমকে দাঁড়ালো ওরা। যা দেখলো তাতে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল ওদের। রাস্তার একটা অংশ সাদা হয়ে গেছে ময়দা পড়ে। চারজন ময়দা মাখা ভূতকে বেদম পিটাচ্ছে একজন লাঠি দিয়ে। রবিন হুডকে চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা তার পাশে। 'কি হয়েছে! এসবের কি অর্থ?' জানতে চাইলো উইল স্টিউটলি।

চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু উইল স্টিউটলির গলা চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলো রবিন, 'অর্থ পরে বুঝো! পিটিয়ে মেরে ফেললো! আগে জলদি ঠেকাও মিলার ব্যাটাকে!'

কিন্তু কাকে ঠেকাবে, অবস্থা বেগতিক দেখে আলগোছে সটকে পড়েছে মিলার। চারজনকে পাঠিয়ে দিল উইল স্টিউটলি মিলারকে ধরে আনার জন্যে, বাকি সবাই লেগে গেল ওদের জামা-কাপড় থেকে ঝেড়ে মুছে ময়দা সাফ করার কাজে। চোখ কচলাতে কচলাতে সব খুলে বললো রবিন ওদের কিভাবে মিলারকে নিয়ে হালকা রসিকতা করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর মোড় নিয়েছিল ঘটনাটা।

হাসি চেপে রাখা মুশকিল হলো উইলের পক্ষে, বাকি সবারও একই অবস্থা। নিজেকে সামলে নেয়ার জন্যে ধমক মারলো সে বাকি চারজন অনুচরকে, 'হাঁ করে কি গল্প শুনছো তোমরা? যাও না, ধরে নিয়ে এসো পাজি বদমাশটাকে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিছমোড়া করে হাত বেঁধে নিয়ে আসা হলো কম্পমান মিলারকে রবিনের সামনে।

'এখন?' কটমট করে ওর দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো রবিন। 'পিটিয়েই খুন করে ফেলবে আজ, তাই না? তোমাকে আমি...' দাঁত কিড়মিড় করে এইটুকু বলেই থেমে গেল রবিন। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে ভস্ম করে দেবে মিলারকে।

কিন্তু রবিনের রাগ বেশিক্ষণ থাকে না, প্রথমে চোখ দুটো চকচক করে উঠলো, তারপর খুক খুক করে হেসে ফেললো সে।

রবিনকে হাসতে দেখে আর সামলে রাখতে পারলো না কেউ নিজেকে, হো হো প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই। দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না অনেকে, হাসতে

হাসতে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। হাসির ঠেলায় পেটে খিল ধরে যাবার অবস্থা।

'কি নাম তোমার, ভাই?' হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন মিলারকে।

'মিজ দ্য মিলার, স্যার,' ভয়ে ভয়ে বললো মিলার।

'শাব্বাশ!' ওর পিঠে চাপড় দিল রবিন। নিজ হাতে খুলে দিল ওর বাঁধন। 'খুব দেখিয়েছো, বাপু। আর একটু হলেই প্রাণটা গেছিল আজ তোমার হাতে। তোমার মত সাহসী লোক পেলে নেব আমি দলে। আসবে তুমি আমাদের সাথে?'

'আপনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন, হুজুর, না জেনে যা ভুল করেছি মাফ করে দেন; খুশি হয়েই আপনার দলে যোগ দেব আমি। আপনার ঠাট্টা আমি একদম বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলে এভাবে…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' থামিয়ে দিল ওকে রবিন। 'এমন কিছুই লাগেনি আমার…ওরে বাবারে! যাই হোক, কপালে যা ছিল ঘটেছে, তিন-তিনজন যোগ্য লোক তো পাওয়া গেছে, কি বলো, লিটল জন? চলো রওনা হওয়া যাক। নতুনদের সম্মানে বিরাট ভোজের আয়োজন হবে আজ আমাদের আস্তানায়।' এই বলে সবার আগে আগে হাঁটতে শুরু করলো রবিন হুড। কিছুদূর এগিয়েই জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল গোটা দলটা।

একই দিনে তিন-তিনটে রোমাঞ্চকর ঘটনার পরিসমাপ্তি হলো এইভাবে। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত পর্যন্ত নাচ-গান, হাসি-তামাশা চললো সেদিন। তারপর যার যার বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো সবাই। নিঝুম নীরবতা নামলো শেরউড জঙ্গলে।

বেশ কিছুদিন চেপে রেখেছিল লিটল জন সেদিনের সব কথা। কিন্তু বেশি দিন পারলো না। সবাই জানে, ওর পেটে কথা থাকে না। এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে বেরিয়ে পড়লো সব কথা–কিভাবে আর্থারের হাতে মার খেয়েছিল সে, কিভাবে স্কারলেটের হাতে রবিন। আর তাই নিয়ে রচনা হয়ে গেল লম্বা চওড়া গাথা। চারণ কবির মুখে সে-গান শুনে হেসে খুন হয়ে গেল সবাই, এবং আরো অনেক, অনেক বেশি করে ভালবেসে ফেললো রবিন হুডকে।

ছয়

নটিংহামের শূটিং ম্যাচ

রেগে আগুন হয়ে গেছেন নটিংহামের শেরিফ।

পর পর কয়েকবার সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়েছেন তিনি শেরউডে রবিন হুডকে ধরে আনার জন্যে। ধরে আনা তো দূরের কথা, রবিন হুড ও তার দলবলের কাছে প্রতিবারই চরম নাজেহাল হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাদের। প্রথম বার পালিয়ে গিয়েছিল ওরা শেরউড ছেড়ে, কিন্তু এখন এতই শক্তিশালী ও সুশৃংখল দল গঠন করে নিয়েছে রবিন যে ওদের আস্তানার ধারে-কাছেও ভিড়তে পারেনি শেরিফের বাহিনী। বিচিত্র সব কৌশলে প্রতিহত করে দেয়া হয়েছে ওদের সমস্ত প্রচেষ্টা। অনেক টাকা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছেন শেরিফ শেরউডে, হয় ধরে আনবে, নয়তো মেরে রেখে আসবে রবিনকে; কিন্তু নিজেরাই গায়েব হয়ে গেছে তারা। রাজার সীলমোহর দেয়া গ্রেফতারী পরোয়ানা হাতে পাঠিয়েছিলেন একজন টিংকার (ঝালাইকার)-কে। সেই লোক ফিরে তো আসেইনি, শোনা যাচ্ছে রবিন হুডের দলে যোগ দিয়েছে সে শেরউডে গিয়ে।

এইসব বিফল প্রচেষ্টার ফলে শুধু যে তিনি জনসাধারণের সম্মান হারিয়েছেন তা

নয়, লোকে হাসাহাসি কানাকানি করছে তাঁকে নিয়ে, টিটকারির পাত্র হয়ে উঠেছেন তিনি সবার কাছে। শেরিফের গাত্রদাহের এটাই প্রধান কারণ। হাসি তামাশার খোরাক হতে কে-ই বা পছন্দ করে?

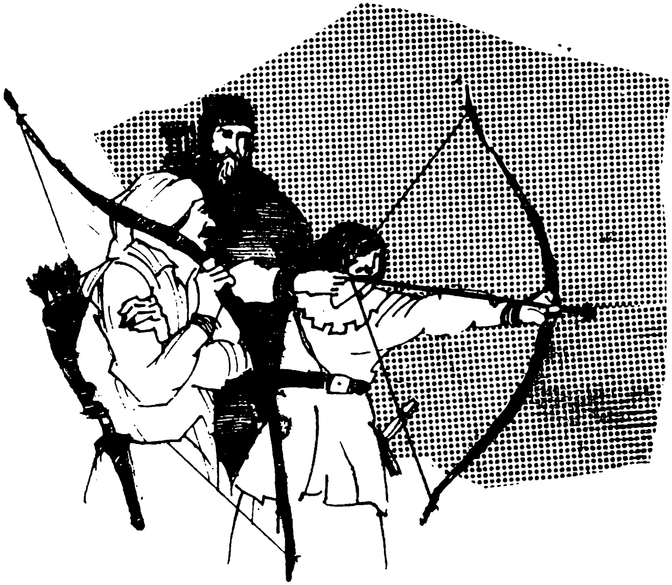

লোক-লস্কর নিয়ে রওনা হলেন তিনি রাজার কাছে নালিশ জানাতে। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো তাতে। রাজা হেনরী তাঁর বক্তব্য শুনে উল্টে ধমক মারলেন তাঁকেই।

'লজ্জা করে না তোমার এই সামান্য ব্যাপারে আমার কাছে নালিশ নিয়ে আসতে? তোমাকে রাখা হয়েছে কি করতে? সাধারণ এক ডাকাত ধরতে পারো না, ছুটে এসেছো আমার কাছে নালিশ জানাতে···ছি, ছি, তোমার যোগ্যতা সম্পর্কেই সন্দেহ হচ্ছে এখন আমার। তোমার অধীনে যে বিরাট বাহিনী রয়েছে, তারা কি করছে—বসে বসে সরকারী বেতন নিচ্ছে, আর ঘাস কাটছে? যাও, তোমার কোন কথা আর শুনতে চাই না আমি, যেভাবে পারো গ্রেফতার করো ওকে; তা না পারলে নিজেই বরখাস্ত হয়ে যাবে তুমি অযোগ্যতার দায়ে।'

বকা খেয়ে বিমর্ষ বদনে ফিরে চললেন শেরিফ নিজের কাউন্টির দিকে। রাজার কাছে নালিশ করতে গিয়ে ভাল বিপদেই পড়া গেছে। নিজের চাকরি নিয়েই টানাটানি এখন। ফেরার পথে কারো সাথে একটি কথা বললেন না তিনি। মাথা নিচু করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। বেশ অনেকটা পথ আসার পর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। 'পেয়েছি!' উরুর উপর জোরে এক চাপড় মারলেন তিনি। 'জলদি চলো! দারুণ এক বুদ্ধি এসেছে মাথায়। দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি শয়তান রবিন হুডকে হাজতে না পুরতে পারি, তাহলে আমার নাম নেই।'

কি পেলেন শেরিফ যে এতো খুশি হয়ে উঠলেন?

চলতে চলতে একের পর এক নানান ধরনের ফন্দিফিকির আসছিল তাঁর মাথায়।

কিন্তু পছন্দ হচ্ছিল না কোনটাই। কোন না কোন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে প্রতিটি পরিকল্পনায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো তাঁর। তিনি খবর পেয়েছেন, প্রায়ই নটিংহাম শহরে আসে দুঃসাহসী রবিন হুড। যদি কোনভাবে ওকে আবার শহরের চার দেয়ালের মধ্যে আনার ব্যবস্থা করা যায়, সতর্ক থাকলে মোটেই কঠিন হবে না ধরা। কিভাবে আনা যায় ওকে? চট্ করে মনে পড়লো শূটিং প্রতিযোগিতার কথা। শেরউডের দস্যুরা নিজেদের মস্ত তীরন্দাজ বলে মনে করে। যদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে একটা দারুণ লোভনীয় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা যায়, তাহলে ঠিক ফাঁদে এসে ধরা দেবে দুঃসাহসী রবিন হুড। ঠিক, একটা বড়সড় শূটিং ম্যাচের আয়োজন করতে হবে নটিংহামে ফিরেই।

শহরে ফিরেই উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিমে লোক পাঠালেন শেরিফ, ঘোষণায় বলা হলো বিরাট এক শূটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে নটিংহাম শহরে, বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হবে একটা সোনার তীর আর একটা পেনি ভর্তি রূপোর শিঙা।

লিংকন শহরে কাজে গিয়েছিল রবিন, সেখানেই সংবাদ পেল সে প্রতিযোগিতার। খবর শুনে দ্রুত ফিরে এলো সে শেরউড জঙ্গলে। সবাইকে ডেকে জানালো খবরটা। তারপর বললো, 'সারা দেশের যত বড় বড় তীরন্দাজ আছে, সবাই আসবে এই প্রতিযোগিতায়। আমাদের হাতের টিপ যাচাই করে নেয়ার এই এক মস্ত সুযোগ। আমি ঠিক করেছি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেব। তোমরা কি বলো?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো দলের কনিষ্ঠতম সদস্য ডংকাস্টারের ডেভিড। 'আগে আমার বক্তব্য শুনে নাও, তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো,' বললো সে সবার উদ্দেশে। 'এইমাত্র ব্লু বোর থেকে সংবাদ শুনে এলাম আমি। কেবল শূটিং ম্যাচের সংবাদই নয়, ঈডমের কাছ থেকে আরো কিছু জানতে পেরেছি আমি। ও জেনেছে শেরিফের খুবই ঘনিষ্ঠ এক লোক র‍্যালফের কাছ থেকে। শেরিফের ধারণা, এই বিরাট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লোভ সামলাতে পারবে না রবিন হুড। গোটা আয়োজনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রবিন হুডকে নটিংহামের প্রাচীরের ভেতর আকর্ষণ করে নিয়ে গ্রেফতার করা। আমরা আমাদের প্রিয় নেতাকে হারাতে চাই না। কাজেই আমি মনে করি এতে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া মোটেই উচিত হবে না।'

কথাটা শুনে ভ্রূ কুঁচকে মাথা ঝাঁকালো রবিন, তারপর হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। পিঠ চাপড়ে দিল ডেভিডের। মুখে বললো, 'ধন্যবাদ, ডেভিড। চোখ-কান খোলা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ, এটা আমাদের অস্তিত্বের জন্যেও জরুরী। তুমি যে খবর এনেছো তা যদি সত্যি হয় এবং আমার বিশ্বাস কথাটা পুরোপুরি সত্যি, তবুও আমি মনে করি আমার এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা একান্ত দরকার। লোকে বলবে, শেরিফের ভয়ে রবিন হুড আর তার সাত-কুড়ি দুঃসাহসী অনুচর প্রতিযোগিতা বর্জন করে গর্তে সেঁধিয়েছিল, সাহসে কুলায়নি তাদের নটিংহামে আসতে—সেটা কেমন লাগবে তোমাদের শুনতে? ডেভিডের কথা শুনে আরও জেদ চেপে যাচ্ছে আমারঃ যেমন করে হোক ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে ওই পুরস্কার। কিন্তু বোকার মত কিছু করে বসা ঠিক হবে না। কৌশল দিয়ে মোকাবিলা করবো আমরা কৌশলের। ছদ্মবেশ নিয়ে যাব আমি। তোমরাও, কেউ কৃষক, কেউ শ্রমিক, কেউ পুরোহিত, কেউ ভিখারীর ছদ্মবেশে কাছে পিঠেই থাকবে আমার। সবাই সাথে করে লুকিয়ে নিয়ে যাবে তলোয়ার, তীর-ধনুক। যদি প্রয়োজন পড়ে, যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করবো আমরা। আর যদি তার প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে জিতে নিয়ে আসবো সোনার তীর আর রূপোর বিউগল। তীরটা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখব আমরা এই গাছের ডালে। তোমরা সবাই কি বলো?'

সবাই একবাক্যে সায় দিল রবিনের কথায়।

প্রতিযোগিতার দিন উৎসবের সাজে সাজানো হলো নটিংহাম শহর। প্রাচীরের

কাছাকাছিই একটা মস্ত সবুজ মাঠে আয়োজন করা হয়েছে প্রতিযোগিতার। প্রাচীরের ধারে সারি সারি বেঞ্চ পাতা হয়েছে নাইট, জমিদার এবং শহরের সম্ভ্রান্ত ধনী লোক ও তাদের স্ত্রীদের বসার জন্যে। টার্গেটের কাছাকাছিই একটা মঞ্চ সাজানো হয়েছে রঙিন সিল্কের রিবন আর ফুলের মালা দিয়ে–শেরিফ আর তাঁর স্ত্রী বসবেন এখানে। প্রায় দেড়শো গজ দূরে মস্ত এক ডোরা কাটা তাঁবু ফেলা হয়েছে প্রতিযোগীদের জন্যে। তাঁবুর একটা খুঁটিতে টাঙানো হয়েছে নানান রঙের পতাকা। হরেক রকম নক্সা করা রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে তাঁবু। তাঁবুর ভেতর রাখা হয়েছে মস্ত এক মদের পিপে, প্রতিযোগীদের যার যত খুশি পান করবে বিনা মূল্যে।

সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দের জন্যে যেখানে বেঞ্চ পাতা হয়েছে তার উল্টো দিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সাধারণ গরীব দর্শকদের জন্যে জায়গা। বসার কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু রেলিং দেয়া হয়েছে যাতে আগ্রহের আতিশয্যে মাঠের ভেতর ঢুকে পড়তে না পারে কেউ। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই আসতে শুরু করলো দর্শকবৃন্দ। কেউ ঘোড়ায় চেপে, কেউ গাড়িতে চড়ে আসছেন ভদ্রলোকেরা। দলে দলে পায়ে হেঁটে আসছে সাধারণ দর্শকেরা, রেলিঙের ওপারে বসে পড়ছে, শুয়েও পড়ছে কেউ কেউ।

একজন দু'জন করে মস্ত তাঁবুতে এসে জড়ো হচ্ছে প্রতিযোগীরা। কেউ কেউ উঁচু গলায় নিজেদের বাহাদুরির গল্প শোনাচ্ছে অন্যদের, কেউ ছিলা টেনে টেনে পরীক্ষা করে দেখছে ধনুকে কোনও দোষ পাওয়া যায় কিনা, কেউ আবার এক চোখ বুজে আরেক চোখের সামনে তুলে ধরে পরীক্ষা করে দেখছে তীরগুলো।

দেশের নানান জায়গা থেকে এসেছে মস্ত সব নামজাদা তীরন্দাজ। লোভনীয় পুরস্কার ডেকে এনেছে তাদের অনেক দূর দূরান্ত থেকে। শেরিফের রক্ষী-বাহিনীর সেরা তীরন্দাজ রেড ক্যাপের গিল তো আছেই, লিংকন শহর থেকে এসেছে ক্রুইকশ্যাংক, ট্যামওয়ার্থ থেকে এসেছে প্রবীণ অ্যাডাম–উডস্টকের সেই বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় সেকালের সেরা ধনুর্বিদ ক্রিমকে হারিয়ে যে বিজয়ীর শিরোপা কেড়ে নিয়েছিল, এছাড়াও রয়েছে লেসলির উইলিয়াম এবং আরো অনেকে।

পদমর্যাদা অনুযায়ী সবাই যে-যার জায়গায় বসে যাওয়ার পর দুধ-সাদা ঘোড়ায় চেপে এলেন শেরিফ, পাশে আরেকটা ঘোড়ায় তাঁর স্ত্রী। বেগুনী সিল্কের পোশাক পরেছেন শেরিফ, মাথায় বেগুনী মখমলের টুপি, পায়ে কালো মখমলের জুতো। শেরিফের স্ত্রী পরেছেন রাজহাঁসের পালক দিয়ে কারুকাজ করা নীল মখমলের পোশাক, আর মহামূল্যবান সোনার অলংকার। নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন তাঁরা, শোভা বর্ধনের জন্যে দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল বর্শা হাতে উর্দি পরা প্রহরী।

নিজ আসনে বসে রাজকীয় ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক চাইলেন শেরিফ, তারপর ইঙ্গিত করলেন ঘোষকের প্রতি। ইঙ্গিত পেয়েই রূপোর শিঙা মুখে তুলে নিয়ে পরপর তিনবার ফুঁ দিল ঘোষক। সংকেত পেয়ে তাঁবু ছেড়ে লাইনের উপর এসে দাঁড়ালো সব তীরন্দাজ। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো জনতা। যার যার প্রিয় তীরন্দাজের নাম ধরে হাঁক ছাড়ছে অনেকে।

হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল ঘোষক। সবাই চুপ করতেই শুরু করলো প্রতিযোগিতার নিয়ম বর্ণনা। 'একটা করে তীর ছুঁড়বে তোমরা সবাই দেড়শো গজ দূরের এই টার্গেট লক্ষ্য করে। তোমাদের মধ্যে থেকে সেরা দশজনকে বাছাই করে বের করে নিয়ে তাদের প্রত্যেককে দুটো করে তীর ছুঁড়তে বলা হবে। এরপর এই দশজনের মধ্যে থেকে বেছে বের করা হবে সেরা তিনজনকে। তিনটে করে তীর ছুঁড়বে এই শেষের তিনজন। এদের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাকেই দেয়া হবে পুরস্কার।'

খানিকটা সামনে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিযোগীদের মধ্যে রবিন হুডকে খুঁজে বের

করার চেষ্টা করলেন শেরিফ। সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু যেন দমে গেলেন তিনি। কই, সবুজ কাপড় পরা কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবলেন, 'এত ভিড়ে চেনা যাবেও না। যদি এসে থাকে, দশজনের একজন সে হবেই; তখন ওকে চিনে নেয়া মোটেই কঠিন হবে না।'

শুরু হলো প্রতিযোগিতা। সবাই ছুঁড়লো একটা করে তীর। এতজনের মধ্যে কেবল ছয়টা তীর লাগলো গিয়ে টার্গেটে–তার মধ্যে চারটে বিঁধেছে কালো জায়গায়, বাকি দুটো মাঝখানের গোল চক্কোরের ধার ঘেঁষে। কাজেই শেষ তীরটা যখন একেবারে মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো, তখন বিপুল হর্ষধ্বনি উঠলো দর্শকদের মধ্যে থেকে।

দশজন রইলো, ছাঁটাই হয়ে গেল বাকি সবাই। এই দশজনের মধ্যে ছয়জন সারা ইংল্যাণ্ডে সুপরিচিত, বেশির ভাগ দর্শকই চেনে তাদের। এরা হচ্ছে, রেড ক্যাপের গিলবার্ট, ট্যামওয়ার্থের অ্যাডাম, ডিকন ক্রুইকশ্যাংক, লেসলির উইলিয়াম, ক্লাউডের হিউবার্ট, এবং হার্টফোর্ডের সুইদিন। এরা ছাড়াও দু'জন আছে ইয়র্কশায়ার থেকে আসা তীরন্দাজ, এছাড়া আছে লম্বা এক নীল পোশাক পরা তীরন্দাজ, এসেছে খোদ লণ্ডন শহর থেকে। কিন্তু সব শেষে যে লোকটা একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে লাগিয়েছিল তীর, কেউ চেনে না তাকে, পরনে জীর্ণ মলিন একটা শতচ্ছিন্ন লাল জামা, একটা চোখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা–কানা।

কাছেই বর্শা হাতে দাঁড়ানো এক লোককে ডাকলেন শেরিফ হাতের ইশারায়। লোকটা ঝুঁকে আসতেই কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখতে পাচ্ছো? এই দশজনের মধ্যে চিনতে পারছো শয়তান রবিন হুডকে?'

'না, হুজুর,' বললো লোকটা। 'এদের মধ্যে ছয়জনকে ভাল করেই চিনি আমি। আর ইয়র্কশায়ার থেকে যে দু'জন এসেছে তাদের একজন রবিন হুডের চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বা, অপরজন বেশ অনেকটা খাটো। কাজেই ওদেরকেও বাদ দেয়া যায়। আর ওই যে ছেঁড়া লাল জামা পরা ভিখারিটা–ওকেও বাদ দিতে পারেন অনায়াসে, কারণ রবিনের দাড়ির রঙ সোনালী, কিন্তু এর দাড়ি দেখা যাচ্ছে খয়েরি রঙের, তাছাড়া দেখাই যাচ্ছে লোকটার একটা চোখ কানা। বাকি রইলো নীল পোশাক পরা লোকটা–আমার ধারণা এর কাঁধের চেয়ে অন্ততঃ তিন ইঞ্চি বেশি চওড়া রবিনের কাঁধ।'

'তাহলে সত্যিই এলো না শয়তানটা!' ভুরু কুঁচকে উঠলো শেরিফের। 'ওকে সাহসী বলেই জানতাম, কিন্তু আজ বোঝা গেল কতটা ভীরু আর কাপুরুষ!' গলার স্বর শুনে বোঝা গেল খুবই হতাশ হয়েছেন শেরিফ। মনে মনে খুবই আশা করেছিলেন তিনি যে এত বড় একটা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের লোভ সংবরণ করতে পারবে না রবিন হুড।

কিছুক্ষণ বিরতির পর বাছাই করা দশজন তীরন্দাজ আবার এসে দাঁড়ালো দাগের ওপর। দুটো করে তীর ছুঁড়লো প্রত্যেকে। অখণ্ড থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে সারা ময়দানে। শ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেছে সবাই। কিন্তু শেষের সেই ভিখারীটা তীর ছুঁড়তেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো সবাই একসাথে, শূন্যে ছুঁড়ে দিল মাথার টুপি।

'আশ্চর্য! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠলেন অশীতিপর বৃদ্ধ স্যার অ্যামিয়াস। শেরিফের কাছাকাছিই একটা আসনে বসে ছিলেন তিনি। 'এমন শূটিং জীবনে দেখিনি আমি। গত ষাট বছর ধরে কত হাজার হাজার প্রতিযোগিতা যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। এমন ধনুর্বিদ চোখে পড়েনি আর আমার।'

শেষ-মেষ টিকলো তিনজন: রেড ক্যাপের গিল, কানা ভিখারী, আর ট্যামওয়ার্থ শহরের অ্যাডাম।

'এইবার, গিলবার্ট,' চেঁচিয়ে বললেন শেরিফ। 'মান রাখা চাই। যদি জিততে পারো, পুরস্কার তো পাবেই, আরো একশোটা সিলভার পেনি দেব আমি তোমাকে নিজের পকেট থেকে।'

'চেষ্টার ক্রটি করবো না, হুজুর,' উত্তর দিল গিলবার্ট।

ভাল দেখে একটা তীর বেছে নিয়ে সতর্কতার সাথে ছুঁড়লো গিলবার্ট। সোজা উড়ে গিয়ে কেন্দ্রবিন্দুর এক আঙুল ডাইনে লাগলো তীরটা। 'গিলবার্ট! গিলবার্ট!' চিৎকার উঠলো দর্শকদের মধ্যে থেকে। হাততালি দিয়ে উঠলেন শেরিফ, 'বাহ, চমৎকার।'

এবার ধনুকে তীর যোজনা করলো ছেঁড়া পোশাক পরা ভিখারী। তীর ছোড়ার পূর্ব মুহূর্তে কনুই উঁচু করতেই তার বগল তলায় মস্ত এক হলুদ তালি দেখতে পেল দর্শকরা। হাসির রোল উঠলো সবার মধ্যে। কিন্তু চোখের নিমেষে তীর ছুঁড়ে হাতটা নামিয়ে নিল ভিখারী। স্তব্ধ হয়ে গেল সবার মুখের হাসি। গিলবার্টের চেয়ে দুটো শরষের দানা পরিমাণ ভেতরে বিঁধেছে ভিখারীর তীর, কেন্দ্রবিন্দুর কাছে। নিজের অজান্তেই প্রশংসা বেরিয়ে এলো শেরিফের মুখ থেকে, 'দারুণ, দারুণ!'

অতি সাবধানে তীর ছুঁড়লো এবার অ্যাডাম। গিলবার্ট ও ভিখারীর মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো তার তীর। প্রথম দফায় প্রথম হলো ভিখারী, দ্বিতীয় অ্যাডাম, তৃতীয় গিলবার্ট।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও বিরতির পর আবার তিনটে তীর ছুঁড়লো তিনজন। কিন্তু এবার অ্যাডামের তীরটা গিয়ে বিঁধলো কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তার চেয়ে ভাল করলো গিলবার্ট, এবং তার চেয়েও ভাল করলো ছিন্নবস্ত্র ভিখারী। এবারেও প্রথম হলো সে। আবার কিছুক্ষণ বিরতির পর শেষ তীর ছোঁড়ার জন্যে দাগের ওপর এসে দাঁড়ালো তিনজন অতুলনীয় তীরন্দাজ। খুবই সতর্কতার সাথে বেশ অনেকক্ষণ লক্ষ্যস্থির করবার পর আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে তীর ছুঁড়লো গিলবার্ট। দর্শকরা এতই জোরে হর্ষধ্বনি করে উঠলো যে ভয় পেয়ে উড়ে পালালো বুরুজের উপর বসে থাকা দাঁড়কাকগুলো। কেন্দ্রবিন্দু থেকে সামান্য এক সুতা ডাইনে গিয়ে বিঁধেছে ওর তীর।

'বেড়ে দেখিয়েছো, গিলবার্ট!' আনন্দের আতিশয্যে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন শেরিফ। 'কোন সন্দেহ নেই, তোমারই কপালে ঝুলছে পুরস্কার। কারো সাধ্য নেই এর চেয়ে ভাল কিছু করে।' ছেঁড়া জামা পরা ভিখারীর দিকে ফিরলেন তিনি, 'কি হে, আরও তীর ছোঁড়ার খায়েশ আছে, নাকি এখানেই হার মেনে ছেড়ে দেবে তীর-ধনুক?'

কোন জবাব না দিয়ে দাগের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো কানা ভিখারী। চুপ হয়ে গেল সবাই, সবার মনে কি হয় কি হয় একটা ভাব, দম আটকে রেখে চেয়ে রয়েছে ভিখারীর দিকে। ধনুকে তীর যোজনা করে কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লোকটা, তারপর একটানে ছিলাটা কানের কাছে নিয়ে এসেই ছেড়ে দিল তীর। সোজা উড়ে গেল তীরটা, গিলবার্টের তীরের একটা পালক কেটে গাঁথলো গিয়ে তার পাশে...আশ্চর্য!...কেন্দ্রবিন্দুর ঠিক মাঝখানে। হর্ষধ্বনি করতেও ভুলে গেছে দর্শকবৃন্দ এই অবিশ্বাস্য পারদর্শিতা দেখে, বিস্ফারিত চোখে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে সবাই।

'নাহ্!' লম্বা করে শ্বাস টেনে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো ট্যামওয়ার্থের অ্যাডাম। 'দুই কুড়ি বছর ধরে তীর-ধনুক নিয়ে কারবার করছি আমি, বেশির ভাগ প্রতিযোগিতায় ছিনিয়ে নিয়েছি জয়ের মালা, কিন্তু আজ আর না—এতদিনের অভিজ্ঞতায় অন্ততঃ কখন হার মেনে নিতে হয় সেটুকু শিক্ষা হয়েছে আমার। কে লোকটা জানি না, কিন্তু আজ বিনা দ্বিধায় মেনে নিচ্ছি আমি—ওর তুলনা হয় না।' এই বলে হাতের তীর ঢুকিয়ে রাখলো সে তূণে, ধনুক থেকে ছিলাটা খুলে সরে গেল দাগের ওপর থেকে।

পুরস্কার বিতরণ করলেন শেরিফ নিজ হাতে। বিপুল হর্ষধ্বনি আর করতালির মধ্যে

দিয়ে এগিয়ে এসে সবিনয়ে পুরস্কার গ্রহণ করলো কানা ভিখারী। 'তুলনাহীন দক্ষতা দেখিয়ে জিতে নিয়েছো, ভিখারী, তুমি আজকের এই পুরস্কার। নামটা কি তোমার? বাড়ি কোথায়?'

'লোকে আমাকে টেভিয়োডেলের জক বলে ডাকে,' বললো লোকটা। 'ওখানেই বাড়ি।'

'বেশ, বেশ,' বললেন শেরিফ। 'এর আগে এত ভাল তীর ছুঁড়তে দেখিনি আমি কাউকে। ভাল বেতন দেব, আমার বাহিনীতে যোগ দেবে তুমি? ভাগ্যিশ কাপুরুষ রবিন হুড আসেনি এই প্রতিযোগিতায়, এলে তাকেও হার মানতে হতো আজ তোমার কাছে। বলো, যোগ দেবে তুমি আমার রক্ষী বাহিনীতে?'

'না,' কর্কশ কণ্ঠে বললো ভিখারী। 'আমার মনিব আমি নিজে। কারো অধীনে চাকরি করি না আমি।'

'তবে দূর হও!' মুহূর্তে রেগে উঠলেন শেরিফ। 'তোমার এই বেআদবির জন্যে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারতাম, কিন্তু মাফ করে দিচ্ছি। যাও, দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে!'

'যাচ্ছি,' বললো ভিখারী, 'কিন্তু মনে রাখবেন, কারো মাফেরও তোয়াক্কা রাখি না আমি।' বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলো সে।

ছিন্নবস্ত্র এক ভিখারীর মুখে এতবড় কথা শুনতে হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি শেরিফ। হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি কয়েক মুহূর্তের জন্যে। যখন সংবিৎ ফিরে পেলেন, তখন গরীব দর্শকদের রেলিঙের কাছে পৌঁছে গেছে ভিখারী। 'ধরো, ধরে আনো ওকে!' হাঁক ছাড়লেন তিনি। 'ধরে নিয়ে এসো হারামজাদাকে!'

একবার পিছন ফিরে চাইলো ভিখারী, আরো কয়েক পা এগিয়ে রক্ষীদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। সাত আটজন সশস্ত্র প্রহরী ছুটে আসছে তার দিকে। বিদ্যুৎবেগে একটা তীর বের করে আনলো সে তূণ থেকে, সেটা ধনুকে পরিয়ে একটানে নিয়ে এলো ছিলাটা কানের পাশে। হাঁ হয়ে গেছে সবার মুখ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সবাই ভিখারীর তীরের লক্ষ্য স্বয়ং শেরিফ।

'খবরদার, শেরিফ! ফিরিয়ে নিন আপনার লেলিয়ে দেয়া কুত্তাগুলোকে!' বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রচণ্ড এক ধমক দিল ভিখারী। 'নইলে দুই চোখের ঠিক মাঝখানে ঢুকিয়ে দেব তীরটা।'

দাঁড়িয়ে পড়লো রক্ষীরা, পিছন ফিরে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে শেরিফের পরবর্তী নির্দেশের। রাগে লাল হয়ে গেছে শেরিফের চোখ-মুখ। কিন্তু তাই বলে নিজের বিপদটা বুঝে নিতে কিছুমাত্র ভুল হলো না তাঁর। এখন গোয়ার্তুমি করতে গেলে ভিখারীর অব্যর্থ তীর বিঁধবে এসে ঠিক দুই চোখের মাঝখানে। ফলাফল, নির্ঘাৎ মৃত্যু।

'ফিরে এসো!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'যেতে দাও হারামজাদাকে। ফিরে এসো।'

আর এগুলো না বটে, কিন্তু ফিরেও গেল না রক্ষীরা। অপেক্ষা করছে, শেরিফ বিপদমুক্ত হলেই তাড়া করে ঘিরে ধরবে দুর্বিনীত ভিখারীকে।

রেলিং টপকে ওপারে চলে গেল ভিখারী। কিছুদূর ভিড় ঠেলে এগিয়ে হঠাৎ শিঙাটা মাথার উপর তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে ভিতরের মুদ্রাগুলো। চেঁচিয়ে বললো, 'কুড়িয়ে নাও, ভাই। যে যা পারো কুড়িয়ে নাও।'

হুলস্থুল পড়ে গেল গরীব দর্শকদের মধ্যে। এই হুটোপুটি ডিঙিয়ে ইচ্ছে করলেও রক্ষীরা সহজে ধরতে পারবে না ওকে। নিশ্চিন্ত মনে পা বাড়ালো সে নগর-তোরণের দিকে। কোথা থেকে কে জানে, একদল মুখ্যুসুখ্যু গরীব দুঃখী ঘিরে ধরলো ভিখারীকে চারপাশ থেকে। সবাই মিলে বেরিয়ে গেল ওরা শহর থেকে।

সেইদিন শেরউডের সেই বিখ্যাত গ্রীনউড গাছের নিচে জমায়েত হলো বিচিত্র পোশাক পরা একদল লোক। কেউ পরেছে ভিক্ষুকের পোশাক, কেউ সেজেছে মঠের সন্ন্যাসী, কেউ ঝালাইকার, কেউ নিরীহ নির্বোধ চাষী। তাদের মাঝখানে বসে আছে শতচ্ছিন্ন লাল পোশাক পরা সেই ভিখারী, তার এক হাতে একটা সোনার তীর, অপর হাতে রূপোর শিঙা। হাসাহাসি হৈ-চৈ-এর মধ্যে চোখের উপর থেকে কালো পট্টি খুলে ফেললো ভিখারী, দেখা গেল আসলে কানা নয় সে, খুশিতে হাসছে দুই চোখ। এবার শতচ্ছিন্ন পোশাকটা খুললো সে, দেখা গেল ছেঁড়া পোশাকের নিচে রয়েছে লিংকন গ্রীনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক। তারপর দাড়িতে হাত বুলালো ভিখারী। বললো, 'কিন্তু এটা? আমার এত সাধের সোনালী দাড়ি থেকে ওয়ালনাটের কষের দাগ তুলবো কি করে?'

কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো সবাই। উঠে দাঁড়ালো রবিন হুড। পুরস্কার পাওয়া সোনার তীরটা ঝুলিয়ে দিল একটা ডালের সাথে। বললো, 'এবার ভোজের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কি বলো তোমরা?'

ভোজের পর শুরু হলো নাচ-গান গল্প-গুজব। এত ফুর্তির মধ্যেও রবিনকে একটু অন্যমনস্ক দেখে জানতে চাইলো লিটল জন, 'কি হয়েছে তোমার, ওস্তাদ? কেমন যেন মনমরা মনে হচ্ছে?'

'ঠিকই ধরেছো,' বললো রবিন হুড। 'খারাপ লাগছে এই ভেবে যে শেরিফ জানলো না কিছুই। তার ধারণা কাপুরুষ রবিন হুড সাহসই পায়নি আজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে।'

'ও, এই কথা?' একগাল হাসলো লিটল জন। 'এ আর এমন কি সমস্যা?' উইল স্টিউটলির দিকে ফিরলো সে, 'উইল, একটা পদ্য বানিয়ে ফেলো তো চটপট, লিখে ফেলো একটা কাগজে।'

'কি করবে পদ্য দিয়ে?' জানতে চাইলো রবিন।

'দেখোই না কি করি!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো লিটল জন। 'হজমের বারোটা বাজিয়ে দেব আজ শেরিফের!'

এদিকে নটিংহাম শহরে নিজ বাড়িতে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সাথে নৈশ-ভোজে বসেছেন শেরিফ। খেতে খেতে মনের খেদ প্রকাশ করে ফেললেন শেরিফ। 'আমি ভেবেছিলাম রবিন হুড আজ আসবেই আসবে। ও যে এতবড় কাপুরুষ তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বোধহয় কোন ভাবে টের পেয়ে গেছে ফাঁদ পেতে ধরা হবে আজ তাকে। ভয়ে ইঁদুরের গর্তে সেঁধিয়েছে গিয়ে। কিন্তু, ভাবছি ওই বেয়াড়া ভিখারীটার কথা—কে ও?'

কথা শেষ হবার আগেই ঘ্যাচ করে একটা তীর এসে বিঁধলো খাবার টেবিলে, শেরিফের ঠিক সামনে।

'ব্যাপার কি! কি হলো? তীর এলো কোথেকে? খোলা ওই জানালা দিয়ে না?'

'একটা কাগজ জড়ানো রয়েছে ওটার গায়ে,' বললো একজন।

'দেখি, দেখি কিসের কাগজ?' হাত বাড়ালেন শেরিফ।

ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল ছোট্ট একটা পদ্য লেখা রয়েছে কাগজের মাঝখানে।

"ভেবেছিলে ধরবে তাকে
পড়বে ফাঁদে রবিন হুড।
পুরস্কারটা কে নিল আজ?
হাসছে তামাম শেরউড!"

পরিষ্কার বুঝতে পারলেন শেরিফ, কানা ভিখারীর ছদ্মবেশে আজ পুরস্কার জিতে নিয়ে গেছে স্বয়ং দস্যু রবিন হুড।

রাগে-দুঃখে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো শেরিফের চেহারা। খাবার ফেলেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, গটমট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

সাত

উইল স্টিউটলির ফাঁসী

মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন শেরিফ। রাজার কাছে যদি নালিশ করতে না যেতেন তাহলে আর এই বিপদে পড়তে হতো না তাঁকে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে যদি রবিন হুডকে গ্রেফতার না করতে পারেন, নিজের চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে। অথচ গ্রেফতারী পরোয়ানা পাঠিয়ে কোন লাভ হয়নি, শূটিং প্রতিযোগিতার কৌশলও মাঠে মারা গেছে। কোন ভাবেই এঁটে ওঠা যাচ্ছে না দস্যুটার সাথে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি, শেষ চেষ্টা হিসেবে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে দেখবেন ওকে ধরা যায় কিনা।

যত কনস্টেবল, নগর-রক্ষী আর জঙ্গল-রক্ষী ছিল সবাইকে ডেকে পাঠালেন তিনি। নির্দেশ দিলেন, 'যুদ্ধের সাজ পরে নাও সবাই। আমাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে শেষ চেষ্টা করবো এবার আমরা। বর্ম পরে থাকবে তোমরা, সাথে নেবে ঢাল তলোয়ার আর তীর-ধনুক। গোটা শেরউড জঙ্গলের প্রত্যেকটি রাস্তা, মেঠোপথ আর বুনোপথের ধারে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করবে তোমরা চার-পাঁচজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। যদি ওদের বড়সড় দলের মুখোমুখি পড়ে যাও, শিঙা বাজিয়ে সংকেত দেবে আশেপাশের দলগুলোকে, সবাই মিলে আক্রমণ করবে একযোগে। শুনে রাখো, রবিন হুডকে যে ধরে আনতে পারবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে পুরো একশো পাউণ্ড— জীবিত হোক বা মৃত, আমার সামনে এনে হাজির করতে পারলেই পাবে পুরস্কার।

তাছাড়া ওর দলের যে-কোন লোককে, জীবিত হোক বা মৃত, ধরে আনতে পারলে পাবে চল্লিশ পাউণ্ড করে। যাও, তোমাদের আর সব ডিউটি মওকুফ করে দেয়া হলো কিছুদিনের জন্যে, যেমন করে পারো ধরে নিয়ে এসো দস্যুদের।'

ষাটটি উপদল তৈরি করলো ওরা, প্রতিটি উপদলে পাঁচজন করে লোক, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওনা হয়ে গেল শেরউডের উদ্দেশে। প্রত্যেকের মনে আশা, বলা যায় না, হয়তো পুরস্কারটা ঝুলছে তারই কপালে। পর পর সাতদিন সাতরাত পাহারা দিল ওরা, টহল দিল প্রতিটি রাস্তায়, কিন্তু সবুজ পোশাক পরা লোক তো দূরের কথা, একটুকরো সবুজ কাপড়ও চোখে পড়লো না কারো। কারণ ব্লু বোরের ঈডমের কাছ থেকে আগেই জেনে গেছে রবিন শেরিফের এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা।

খবরটা কানে যেতেই দলের সবাইকে ডেকে আত্মগোপন করবার নির্দেশ দিয়েছে রবিন হুড। বলেছে, 'আমি অযথা রক্তপাত পছন্দ করি না। ওদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে গেলে হয়তো আমরাই জিতবো, কিন্তু দু'পক্ষেরই প্রচুর লোক হতাহত হবে তার ফলে, অনেক স্ত্রী হারাবে তাদের স্বামী, অনেক সন্তান হারাবে পিতা। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলে আমি চাই না এই যুদ্ধে জড়াতে। কতদিন টহল দেবে ওরা? ক্লান্ত হয়ে একদিন ফিরে যেতেই হবে ওদের। ততদিন ডেরা ছেড়ে কোথাও বেরোবো না আমরা। সবার মঙ্গলের জন্যেই এটা করবো আমরা। কিন্তু যদি ওরা আমাদের বাধ্য করে যুদ্ধে নামতে, জান-প্রাণ দিয়ে লড়বো, দেখিয়ে দেব ওদের লড়াই কাকে বলে।'

রবিনের এই নির্দেশ মনঃপূত হলো না অনেকেরই, মেনে নিতে পারলো না এই আত্মগোপনের পরিকল্পনা, ক্ষুণ্ন মনে বিড় বিড় করে বললো, 'ভীতুর ডিম মনে করবে তাহলে শেরিফ আমাদেরকে। সারা দেশের লোক মনে করবে কাপুরুষ রবিনের সাহসে কুলায়নি এদের মোকাবিলা করার।' অসন্তুষ্ট হলো বটে, কিন্তু রবিনের নির্দেশ মেনে নিল সবাই বিনা আপত্তিতে, একটি কথাও বললো না ওর কথার উপর।

সাতদিন সাতরাত লুকিয়ে রইলো রবিনের দস্যুদল আস্তানার আশে পাশে, কেউ বেরোলো না বাইরে। অষ্টম দিনের সকালে আবার সবাইকে ডাকলো রবিন হুড। বললো, 'বেশ অনেক দিন তো হলো, এবার লোক পাঠিয়ে দেখা দরকার কি করছে ব্যাটারা। চিরকাল তো আর টহল দিতে পারবে না, ইতিমধ্যেই হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছে। তোমাদের মধ্যে কে দেখে আসবে ওরা আছে না গেছে?'

হুল্লোড় উঠলো সবার মধ্যে, ধনুক উঁচিয়ে প্রত্যেকে দাবি জানালো যেন তাকেই পাঠানো হয়। গর্বের সাথে সবার উপর একবার চোখ বুলালো রবিন হুড, সবার সাহস দেখে বুক ভরে গেছে তার। হাত তুলে চুপ করার নির্দেশ দিল সবাইকে, তারপর বললো, 'তোমাদের সবাইকে তো আর পাঠানো সম্ভব নয়, কাজেই তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে মনোনীত করবো আমি। তোমরা সবাই সাহসী এবং বীর, কোন সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু এ কাজের জন্যে বীরত্ব ও সাহসের চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন ধূর্ততার। বুড়ো শেয়ালের মত চতুর একজন দরকার আমাদের। আমি প্রস্তাব করছি উইল স্টিউটলির নাম।'

খুশিতে লাফিয়ে শূন্যে উঠলো উইল স্টিউটলি, এত লোকের মধ্যে থেকে তাকেই এই কাজের জন্যে বেছে বের করা হয়েছে দেখে হাসি আর ধরে না তার। 'ধন্যবাদ, রবিন,' বললো সে। 'যদি ব্যাটাদের কোন খবর না আনতে পারি তাহলে আমার চতুর উইল স্টিউটলি নাম পাল্টে অন্য নাম রেখো। চললাম!'

সবুজ পরিচ্ছদের ওপর মঠবাসী সন্ন্যাসীর ঢোলা কাপড় চাপালো সে, তলোয়ারটা এমন ভাবে ঝুলিয়ে নিল যাতে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা না যায়, অথচ প্রয়োজনের সময় খুব সহজেই বের করে আনা যায় এক টানে। মাথার ঢাকনিটা বেশ খানিকটা টেনে সামনের দিকে নামিয়ে দিয়ে ধীরপায়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়লো

সে। শেরিফের পাঠানো দুটো দল পড়লো তার চোখে। অবাক হলো সে এখনো তোড়জোরের সাথেই পাহারা চলছে দেখে। সাথে সাথেই ফিরে না এসে স্থির করলো সে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে ব্লু বোরে, সেখানে ঈডমের কাছ থেকে সব সংবাদ শুনে তারপর ফিরে যাবে আস্তানায়। ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে, দুই হাত বুকে বেঁধে, যেন কতই না গভীর তত্ত্বচিন্তায় মগ্ন, মাথা হেঁট করে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো সে ব্লু বোরের সামনে।

ব্লু বোরে পৌঁছে দেখলো সে শেরিফের জনাকয়েক লোক বসে মদ গিলছে। কারো সাথে কোন কথা না বলে দূরের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো সে। হাতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলো, যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। আসলে অপেক্ষা করছে সে ঈডমকে একা পাওয়ার আশায়। ব্লু বোরের মালিক ঈডম দেখলো ওকে ঠিকই, কিন্তু চিনতে পারলো না। মনে করলো, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে কোন বুড়ো সাধু, নিক, কেউ বসলে কিছু আর ক্ষয়ে যাবে না বেঞ্চটা।

ঈডম চিনতে পারলো না বটে, কিন্তু তার পোষা বিড়ালটা ঠিকই চিনতে পেরেছে উইল স্টিউটলিকে। বরাবর যেমন আদর পায় তেমনি আদরের আশায় কাছে এসে গা ঘষতে শুরু করলো ওর পায়ে। ফলে সন্ন্যাসীর ঢোলা পোশাকটা উপরে উঠে গেল চার আঙুল পরিমাণ। দ্রুত হাতে কাপড়টা আবার নামিয়ে দিল স্টিউটলি, কিন্তু ইতিমধ্যেই তলের সবুজ কাপড় চোখে পড়ে গেছে একজন কনস্টেবলের। তক্ষুণি কাউকে কিছু বললো না সে, মনে মনে বিচার বিবেচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে বেঞ্চে বসা লোকটা কিছুতেই মঠের সন্ন্যাসী হতে পারে না, কোন সন্দেহ নেই, ও রবিন হুডের দলের লোক।

বিনয়ের সাথে ডাকলো সে সন্ন্যাসীকে, 'আসুন না, ফাদার, মনে হচ্ছে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, কয়েক ঢোক বিয়ার খেয়ে তৃষ্ণা দূর করুন।'

মাথা নেড়ে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো উইল স্টিউটলি, কারণ কথা বলে উঠলে কেউ হয়তো ওর গলার স্বর চিনেও ফেলতে পারে। কিন্তু কথা না বলে উপায় থাকলো না তার। আবার প্রশ্ন করলো কনস্টেবল, 'এই গরমে কোথায় চলেছেন, ফাদার?'

গলার স্বর একটু মোটা করে উত্তর দিল স্টিউটলি, 'তীর্থে চলেছি। ক্যান্টারবারি শহরে।'

হাসলো কনস্টেবল। বললো, 'ক্যান্টারবারিতে তীর্থযাত্রায় যেতে হলে হলি ফাদারদের জোব্বার নিচে লিংকন গ্রীন কাপড় পরার নিয়ম আছে বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ! ভেবেছো ফাঁকি দিতে পেরেছো আমার চোখকে? আমি জানি, হয় ছদ্মবেশী চোর তুমি, নয়তো দস্যু রবিন হুডের লোক। খবরদার! এক ইঞ্চি নড়লেই এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেব তলোয়ার দিয়ে!'

এই বলে একটানে চকচকে তরবারী বের করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে উইল স্টিউটলির ওপর। কিন্তু ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে স্টিউটলি যে ধরা পড়ে গেছে, হাতটা আগেই চলে গিয়েছিল তলোয়ারের বাঁটের কাছে, টান দিয়ে ঢোলা কাপড়ের নিচ থেকে বের করলো সে নিজের তলোয়ার, উঠে দাঁড়ালো এক লাফে। সাঁই করে প্রচণ্ড বেগে তলোয়ার চালালো কনস্টেবল, কিন্তু ওই একবারই, আর কোন সুযোগ পেল না সে, আঘাত ঠেকিয়ে দিয়ে একের পর এক আঘাত হেনে চললো উইল স্টিউটলি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। দরদর করে রক্ত নামলো কনস্টেবলের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে। পালাবার পথ পরিষ্কার হয়েছে বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিতে যাবে, এমন সময়ে টলতে টলতে মাটিতে পড়লো আহত কনস্টেবল, এবং পড়েই দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো উইল স্টিউটলির হাঁটু জোড়া। ছুটে এলো অন্যান্যরা। সবার আগে যে ছিল তার মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালো স্টিউটলি, কিন্তু মাথায় শিরস্ত্রাণ থাকায় বেঁচে গেল সে এ-

যাত্রা; গভীর একটা দাগ সৃষ্টি হলো শুধু ইস্পাতের শিরস্ত্রাণে, মাথাটা ঘুরে উঠলো বটে, কিন্তু মারা পড়লো না সে। এদিকে জ্ঞান হারাচ্ছে আহত কনস্টেবল, কিন্তু হাতের বাঁধন আলগা করছে না, ঝটকা দিয়ে পা ছাড়াবার চেষ্টা করলে আরো জাপটে ধরে। ওর এই রকম বেকায়দা অবস্থা দেখে যে তিনজন এগোতে সাহস পাচ্ছিল না তারাও ছুটে এসে ঘিরে ধরলো উইল স্টিউটলিকে। এপাশ-ওপাশ ফিরে বীরত্বের সঙ্গে চারজনের আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করছে স্টিউটলি, সুযোগ পেলেই তলোয়ারের খোঁচায় আহত করছে শত্রুদের। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলো না। পিছন থেকে আচমকা একটা আঘাত এসে পড়লো ওর মাথার উপর, কুলকুল করে রক্ত নেমে অন্ধ করে দিল ওর চোখ। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মেঝেতে, হাত থেকে খসে গেল তরবারি। একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেসে ধরলো এবার সবাই ওকে, কিন্তু তাও কি রাখা যায়!–কিল ঘুসি লাথি চালাচ্ছে সে সমানে। কিন্তু বেশিক্ষণ এইভাবে যুঝতে পারলো না সে, চেপে ধরে বেঁধে ফেললো ওরা ওর হাত-পা, বন্দী হলো উইল স্টিউটলি।

গ্রীনউড গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রবিন হুড, ভাবছিল উইল স্টিউটলির কথা, ওর দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল মনে মনে। এমন সময় দেখতে পেল দু'জন অনুচর ছুটে আসছে ওর দিকে, ওদের মাঝখানে দৌড়াচ্ছে ব্লু বোরের মুটকি মেকেন। ওদের দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল রবিনের, পরিষ্কার বুঝতে পারলো সে, অশুভ-সংবাদ বয়ে আনছে ওরা।

'উইল স্টিউটলিকে ধরে নিয়ে গেছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো একজন।

'খবরটা কে আনলো? তুমি?' মেয়েটার দিকে ফিরলো রবিন।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছে মুটকি মেকেন। বললো, 'হ্যাঁ! পুরোটা ঘটনা নিজ চোখে দেখেছি আমি। বীরের মত লড়েছে স্টিউটলি, জখম হয়েছে মারাত্মক রকম, অনেক রক্ত পড়তে দেখলাম। হাত-পা বেঁধে নিয়ে গেল ওকে নটিংহাম শহরে, কাল নাকি ফাঁসী হবে ওর। তাই শুনে পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে এসেছি আমি খবরটা জানাতে।'

'ফাঁসী হবে না,' ঘোষণা করলো রবিন। 'অন্ততঃ আমাদের প্রাণ থাকতে নয়!' এই বলে শিঙাটা মুখে তুলে তিনটে ফুঁ দিল সে। জরুরী বিপদ সংকেত।

হুড়মুড় করে চারদিক থেকে ছুটে এলো সাতকুড়ি তাগড়া জোয়ান, ঘিরে ধরলো রবিনকে।

'সবাই শোন!' হাঁক ছাড়লো রবিন হুড। 'আমাদের প্রিয় সহচর উইল স্টিউটলি বন্দী হয়েছে শয়তান শেরিফের লোকের হাতে। আগামীকাল নাকি ফাঁসী হতে যাচ্ছে ওর। যেমন করে হোক ঠেকাতে হবে সেটা, ওকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের মধ্যে। ও যেমন আমাদের জন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে, নিজের জীবন বিপন্ন করেছে, প্রয়োজন হলে ওর জন্যে আমাদের প্রত্যেকের তাই করাই উচিত বলে মনে করি। কাজটা ছেলেখেলা নয়, বিপদের সম্ভাবনা আছে, মৃত্যুও ঘটতে পারে। কারও ওপর জোর জবরদস্তি নেই। লিটল জন আর আমি তো যাবই, তোমাদের মধ্যে আর কে কে যেতে চাও, হাত তোল।'

'আমি যাব,' শুধু দু'টি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হলো। প্রচণ্ড এক হুংকারের মত আকাশ কাঁপিয়ে দিল শব্দ দুটো, কারণ একসাথে সবাই উচ্চারণ করেছে কথাটা। সবাই মাথার উপর তুলে ধরেছে ধনুক।

'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ,' বললো রবিন। 'বন্ধুর বিপদে যদি তাকে আমরা সাহায্য না করতে পারি, তাহলে কিসের মানুষ! কাল খুব ভোরে রওনা হবো আমরা, তৈরি থেকো সবাই।'

পরদিন খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ছদ্মবেশ ধরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা বিভিন্ন পথে, একসাথে তিনজনের বেশি নয়। কথা রইলো,

নটিংহাম শহরের কাছেই একটা জংলা উপত্যকায় মিলিত হবে সবাই।

'খবর জানা দরকার সবচেয়ে আগে,' নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই সমবেত হতেই বললো রবিন। 'কোথায় কিভাবে কি করতে যাচ্ছে ওরা সেটা না জানা পর্যন্ত করার কিছুই নেই আমাদের। চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকো সবাই, লক্ষ্য রাখো দুর্গ-তোরণের দিকে। কাউকে একা বেরোতে দেখলেই আমরা কথা বলবো তার সাথে।'

বেলা বেড়ে চলেছে, উশখুশ করছে সবাই, কিন্তু শহর থেকে বেরোচ্ছে না কেউ। খুব সম্ভব উইল স্টিউটলির ফাঁসী দেখার জন্যে আর সমস্ত কাজ বাতিল করেছে শহরবাসীরা আজকের জন্যে। অপেক্ষা করতে করতে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সবাই, তখন দেখা গেল শহর থেকে বেরিয়ে নগর-প্রাচীরের ধার ঘেঁষা রাস্তা ধরে হাঁটছে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী। কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল রবিন ডংকাস্টারের ডেভিডের পাঁজরে। 'যাও, ওর কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যায় কিনা দেখে এসো।'

এগিয়ে গেল তরুণ ডেভিড, বৃদ্ধের কাছাকাছি এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলো। হাসতে হাসতে বললো, 'উইল স্টিউটলির কোন খবর আছে, হোলি ফাদার? বদমশাটার ফাঁসী দেখবো বলে বহুদূর থেকে এসেছি আমি। কখন কোথায় ফাঁসী হবে বলতে পারেন?'

'ছি, ছি!' ডেভিডের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনা করলেন বৃদ্ধ। 'বিনা দোষে একজন ভাল মানুষকে ফাঁসীতে ঝোলানো হচ্ছে, আর তুমি এসেছো সেই তামাশা দেখতে?' রাগের ঠেলায় হাতের লাঠিটা ঠুকলেন তিনি। 'অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়! কি দোষ করেছিল সে যে তাকে ধরে এনে ফাঁসী দিতে হবে? উচ্ছন্নে যাবে, আমি বলে দিচ্ছি, উচ্ছন্নে যাবে সব! জানতে চাইলে, তাই বলছিঃ আজ সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের কিছু আগে নগর-তোরণের বাইরে নিয়ে আসা হবে ওকে, ওই তে-রাস্তার মোড়ে ঝুলিয়ে দেয়া হবে ফাঁসীতে, যাতে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নমুনা দেখে সতর্ক হয়ে যায় আর সব দস্যুরা। কিন্তু দস্যু?—কাদের তুমি দস্যু বলবে? রবিন হুডকে?' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, 'ধন সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে সে ঠিকই, কিন্তু কাদের কাছ থেকে? অসৎ, নিষ্ঠুর, ধনী, পাজি লোকের কাছ থেকে। কোথায় যাচ্ছে সেই টাকা? খোঁজ নিয়ে দেখো, আশেপাশের গোটা এলাকায় যত অসহায় বিধবা, যত অক্ষম বৃদ্ধ, যত অসচ্ছল কৃষক-শ্রমিক রয়েছে, যত পঙ্গু-দীন-দুঃখী আছে, সবার জন্যে একমুঠো অন্ন, শীত নিবারণের বস্ত্র জুগিয়ে আসছে সে বছরের পর বছর। আহা, তারই এক বিশ্বস্ত অনুচরকে অন্যায় ভাবে ফাঁসীতে ঝোলাতে যাচ্ছে নিষ্ঠুর শেরিফ, ভাবতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছি আমি শহর ছেড়ে। যদি জানতাম সে কোথায় থাকে, আমি নিজে গিয়ে খবর দিতাম রবিন হুডকে, বলতামঃ অন্যায় ভাবে খুন করা হচ্ছে তোমার এক অনুচরকে, যেমন করে পারো উদ্ধার করো তাকে।'

এই বলে নিজের পথে পা বাড়ালেন বৃদ্ধ। কিন্তু তিন কদম এগিয়েই থমকে থেমে দাঁড়ালেন তিনি। কারণ কথা বলে উঠেছে যুবক। 'আপনার কথা পৌঁছে যাবে রবিন হুডের কানে। আমার বিশ্বাস, নিজের প্রিয় অনুচরকে রক্ষা করার চেষ্টায় কোন ত্রুটি করবে না সে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ফাদার, আজ যদি উইল স্টিউটলি মারা যায়, চরম প্রতিশোধ নেয়া হবে সে মৃত্যুর।'

বৃদ্ধ যখন ঘুরে দাঁড়ালেন, দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে তখন ডংকাস্টারের ডেভিড। ওর ঋজু, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠলো তাঁর মুখে। হাত তুলে আশীর্বাদ করে রওনা হয়ে গেলেন তিনি নিজের পথে। বুঝতে পেরেছেন তিনি, এই ছেলে রবিন হুডেরই দলের কেউ, কাছে পিঠেই ওৎ পেতে বসে আছে রবিন। ভালো।

ডেভিডের মুখে সব শুনে সবাইকে কাছে ডাকলো রবিন হুড। বুঝিয়ে দিল পরিকল্পনাটা। 'দুপুর গড়িয়ে গেলেই উইল স্টিউটলির ফাঁসী দেখতে লোকজন আসতে

আরম্ভ করবে আশপাশের অঞ্চল থেকে। আমরা একজন-দু'জন করে ভিড়ে যাব তাদের সাথে, ঢুকে পড়বো শহরে। খেয়াল রেখো, দল থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে কেউ। সবাই খেয়াল রাখবে সবার দিকে। উইল স্টিউটলিকে নিয়ে যখন রওনা হবে রক্ষীরা, তোমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব ওদের কাছাকাছি থাকার। লিটল জনকে বুঝিয়ে দিয়েছি আমি কি করতে হবে। ওর কাজ ও করবে, যতক্ষণ না আমার শিঙার সংকেত পাবে ততক্ষণ তোমরা কেউ কিছু করতে যাবে না। সংকেত পাওয়ার পরও অযথা রক্তপাত ঘটাবে না, একান্ত প্রয়োজন না পড়লে কাউকে আঘাত করবে না; কিন্তু যদি প্রয়োজন পড়ে, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানবে, যেন এক লোককে দ্বিতীয়বার আঘাত করার প্রয়োজন না হয়। মনে রাখবে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য উইল স্টিউটলিকে শেরউডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, শেরিফ বা তার সৈন্যদলকে শায়েস্তা করা নয়। উদ্ধারের কাজ হাসিল হয়ে গেলেই দল বেঁধে আমরা সরতে থাকবো জঙ্গলের দিকে। আমাদের মধ্যে কেউ আহত বা নিহত হলে তাকে তুলে নেব কাঁধে, ফেলে রেখে পালাবো না। সবাই সব কথা বুঝেছো? কারো কোন প্রশ্ন আছে?'

বুঝেছে সবাই। কেউ কোন প্রশ্ন করলো না।

সূর্য ঢলে পড়লো পশ্চিম আকাশে। দুর্গ-প্রাচীরের উপর থেকে বেজে উঠলো বিউগল। শহরের লোক যে যেখানে ছিল নেমে এলো রাস্তায়। রাজপথ লোকে লোকারণ্য, সবাই চলেছে নগর তোরণের দিকে। সবাই জানে, ফাঁসী দেয়া হচ্ছে রবিন হুডের ঘনিষ্ঠ সহচর উইল স্টিউটলিকে। ধীরে ধীরে খুলে গেল দুর্গ-তোরণ। সবার আগে সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেরোলেন শেরিফ, তাঁর পিছনে মার্চ করে আসছে সশস্ত্র রক্ষীদল। রক্ষীদলের মাঝখানে দু'চাকার একটা ঘোড়াটানা গাড়িতে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় বসে রয়েছে উইল স্টিউটলি, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে দিনের আকাশে চাঁদের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখটা। কয়েক গোছা চুল রক্ত জমে শক্ত আর চোখা হয়ে পড়ে আছে কপালের উপর। দুর্গ থেকে বেরিয়েই চারদিকে চাইলো সে। কিছু কিছু বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ মুখ নজরে পড়লো তার, কিন্তু চেনা মুখ দেখতে পেল না সে একটাও। ভারি সীসার মত গভীর পানিতে তলিয়ে গেল ওর সমস্ত আশা-ভরসা। বুঝলো, খবর পায়নি রবিন হুড।

কিন্তু তবু দমে গেল না সে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে শক্ত করলো মনটা। শেরিফের উদ্দেশ্যে বললো, 'আমাকে এভাবে না মেরে বরং আমার হাতে একটা তলোয়ার তুলে দিন, স্যার শেরিফ। আপনারা যতজন খুশি আসুন, মরার আগে পর্যন্ত লড়াই করে মরতে চাই আমি।'

'বীরের মরণ তোমার কপালে নেই, হে ছোকরা,' বললেন শেরিফ। 'তলোয়ার পাবে না। সাধারণ চোর-ডাকাতের মতই ঘৃণ্য তুমি, সেই রকম নীচ মৃত্যুই ঘটবে তোমার।'

'ঠিক আছে, আমার হাতের বাঁধন কেটে দিন, অস্ত্র না হয় নাই দিলেন, খালি হাতেই আপনাদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরবো আমি।'

হা হা করে হেসে উঠলেন শেরিফ। 'কেন, ফাঁসীটা পছন্দ হচ্ছে না তোমার? বুক কাঁপছে এখন? রবিন হুডের দলে যোগ দেয়ার সময় এই সম্ভাবনার কথা উঁকি দেয়নি মনে? এখন খুব খারাপ লাগছে বুঝি?' আবার একপেট হেসে নিয়ে বললেন, 'না হে, তে-রাস্তার মোড়ে ফাঁসীতেই ঝুলতে হবে তোমাকে আজ। চোখ ঠুকরে তুলবে দাঁড়কাকে।'

রক্ত চড়ে গেল উইল স্টিউটলির মাথায় শেরিফের এই কথা শুনে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গালিগালাজ করলো সে শেরিফকে। 'কাপুরুষ, নীচ, নরকের কীট, বদমাশ, শেরিফ! তুই ভেবেছিস আমাকে ফাঁসীতে ঝোলালেই দমন করতে পারবি রবিন হুডকে? তোর অন্ততঃ সে সাধ্য নেই। থাকলে তোকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করতো না, টিটকারি

মারতো না তোর নির্বুদ্ধিতা দেখে। জেনে রাখ, আজকের এই কৃতকর্মের ফল হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছেড়ে দেবে তোকে রবিন হুড।'

'তাই নাকি?' রেগে উঠলেন শেরিফ। 'কোথায় তোর রবিন হুড? গর্তে লুকিয়ে রয়েছে কেন? আসুক না সামনে যদি সাহস থাকে! যাই হোক, তোর এই ঔদ্ধত্যের জন্যে শাস্তির মাত্রা আর একধাপ চড়িয়ে দেয়া গেলঃ ফাঁসী দেয়ার পর এক এক করে কেটে নামানো হবে তোর হাত-পা-ধড়-মাথা!' এই বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে এগোলেন তিনি।

নগর-প্রাচীরের বিশাল তোরণের সামনে এসে পৌছলো ওরা। গেট দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চলে গেল উইল স্টিউটলির। কী সুন্দর! ঘন সবুজে ছেয়ে আছে পাহাড়, টিলা, ঢিবি, মাঠ, জঙ্গল। বহুদূরে শেরউডের বিশাল ওকের সারি দেখা যাচ্ছে আবছা মত। তির্যক লালচে রোদ বিছিয়ে পড়েছে মাঠে-ময়দানে, শস্যক্ষেত্রে। আলো লেগে কী অপূর্ব মায়াময় হয়ে উঠেছে দূরের ওই কুটিরগুলো। কুলায় ফেরা পাখিদের কল-কাকলি কানে গেল ওর, পাহাড়ের ধারে গলা ছেড়ে ডাকছে একটা ভেড়া, পরিষ্কার আকাশে উড়ছে সোয়ালো। বুকের ভিতর কেমন যেন করে উঠলো উইল স্টিউটলির, আবছা হয়ে এলো চোখের দৃষ্টি, উত্তপ্ত লোনা পানি নামলো গাল বেয়ে। কী সুন্দর এই পৃথিবীটা! অথচ সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে অকালে।

চট্ করে মাথাটা নামিয়ে নিল সে। সে যে ভয়ে কাঁদছে না, ভালবাসায় কাঁদছে, একথা বুঝবে ক'জন? লোকে যদি ভুল বোঝে ওকে, সেটা রবিনের অসম্মান, তাই মাথা নিচু করে চললো সে বাকি পথটুকু। নগর-তোরণ দিয়ে সবাই বেরিয়ে এলো বাইরে। মনটা শক্ত করে বেঁধে নিয়ে আবার যখন মুখ তুললো স্টিউটলি, বুকের ভিতর লাফ দিয়ে উঠলো ওর কলজেটা–আরে! এ এখানে কেন! ভিড়ের মধ্যে পলকের জন্যে দেখতে পেল সে শেরউডের এক সহচরের অতি পরিচিত মুখ। চারপাশে চোখ বুলিয়েই আনন্দে দম আটকে এলো তার। আরে! চারপাশ থেকে প্রহরীদেরকে ঘিরে রয়েছে ওর একান্ত প্রিয় বন্ধু-বান্ধবেরা, চেষ্টা করছে আরো চেপে আসার। হঠাৎ বুকের ভিতর ছলকে উঠলো এক ঝলক রক্ত–ভিড়ের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে তার প্রিয় নেতা দস্যু রবিনের মুখ। আশেপাশের লোকদের কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে সরিয়ে আরো কাছে আসার চেষ্টা করছে রবিন।

'অ্যাই! কি হচ্ছে?' জোরে ধমক মারলেন শেরিফ একদল লোককে। 'এখানে গুঁতোগুঁতি হচ্ছে কেন? সরো, সরে দাঁড়াও!'

আরেক দিকে একটু গোলমালের আভাস পেয়ে সেদিকে মুখ ফেরালো উইল স্টিউটলি। লিটল জন! গাড়িটার আরো কাছে আসার চেষ্টা করছে লিটল জন–ওর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

'অ্যাই! খবরদার! সরে দাঁড়াও!' লিটল জনের কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো একজন সশস্ত্র রক্ষী। 'ধাক্কাধাক্কি করছিস কেন, হারামজাদা! সরে দাঁড়া!'

'তুই সরে দাঁড়া, কুত্তার বাচ্চা!' বলেই ধাঁই করে ভীষণ এক চাপড় কষালো লিটল জন লোকটার মাথার পাশে। লোকটা কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে মাটিতে পড়তেই এক লাফে উঠে এলো সে উইল স্টিউটলির গাড়িতে।

'বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এভাবে চলে যাওয়াটা কি তোমার উচিত হচ্ছে, উইল?' বললো লিটল জন। 'যদি যেতেই হয়, চলো, আমাকেও নিয়ে চলো সাথে, তোমার মত বন্ধুর সাথে মরতে আমার কোনই আপত্তি নেই।' এই বলে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ দুই পোঁচ দিয়ে কেটে দিল সে ওর হাত-পায়ের বাঁধন। সাথে সাথেই এক লাফে নেমে পড়লো স্টিউটলি গাড়ি থেকে।

'আরে! ওই দেখো! কে ওই লোকটা? দস্যুটার বাঁধন কেটে দিল! ধরো, ধরো

ওকে!' চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ। নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলেন দ্রুতবেগে সাঁই করে চালালেন উন্মুক্ত তলোয়ার।

ঝনাৎ করে ঠেকিয়ে দিল লিটল জন শেরিফের আঘাত। ছদ্মবেশের নিচ থেকে ইতিমধ্যেই বের করে ফেলেছে সে নিজের তরবারী। আঘাত ঠেকিয়েই ইচ্ছে করলে নিজের তরবারীটা সেঁধিয়ে দিতে পারতো শেরিফের গলায়, কিন্তু তা না করে বাম হাতে খপ্ করে চেপে ধরলো সে শেরিফের তলোয়ার ধরা হাতের কব্জি। জোরে এক মোচড় দিতেই হাত থেকে ছেড়ে দিলেন শেরিফ তরবারীটা। চট্ করে সেটা তুলে নিয়ে উইল স্টিউটলির দিকে বাড়িয়ে দিল লিটল জন। 'নাও, ধরো এটা। মাননীয় শেরিফ ধার দিয়েছেন এটা তোমাকে। জলদি, আমার পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও, উইল—মেরে-কেটে বেরোতে হবে এদের মধ্যে থেকে।'

খ্যাপা ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ, 'ঝাঁপিয়ে পড়ো, ঝাঁপিয়ে পড়ো সবাই এদের ওপর, একসাথে!'

ঠিক এমনি সময়ে বেজে উঠলো রবিনের শিঙা। খটাং করে একটা তীর এসে লাগলো শেরিফের শিরস্ত্রাণে। শেরিফ চেয়ে দেখলেন, কে কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে লড়ছে তাঁর রক্ষীরা। হঠাৎ নিম্নবিত্ত নিরীহ দর্শকদের একাংশ খেপে উঠেছে যেন, শিঙার সংকেত পেয়ে কেউ বের করেছে তলোয়ার, কেউ তীর-ধনুক। ঝনাৎ-ঝন শব্দে বাড়ি খাচ্ছে তলোয়ারের সাথে তলোয়ার, অস্তগামী সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে ইস্পাত। যে যেদিকে পারছে ছুটতে শুরু করেছে শহরবাসীরা। পালাও, পালাও রব উঠেছে।

সাঁই সাঁই আরো কতকগুলো তীর ছুটে গেল শেরিফের দিকে। প্রমাদ গুণলেন তিনি, নিরস্ত্র অবস্থায় তীর খেয়ে মরার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয় বলে মনে করলেন। 'হটে এসো! নইলে মারা পড়বে সব! পিছন দিকে হটে এসো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন তিনি তাঁর বাহিনীকে। এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করা হচ্ছে কি হচ্ছে না দেখার জন্যে না দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া।

ইচ্ছে করলে শেরিফের বেশির ভাগ লোককেই হত্যা করতে পারতো রবিনের দল, কিন্তু তা না করে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিল, যাতে দ্রুত পালায় সেজন্যে গোটা কয়েক তীর পাঠিয়ে দিল ওদের পিছন দিক লক্ষ্য করে।

'আরে! যান কোথায়! দাঁড়ান না!' শেরিফের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো উইল স্টিউটলি। 'পালিয়ে গেলে রবিন হুডকে ধরবেন কি করে?' কিন্তু এত ডাকাডাকি করেও ফেরানো গেল না শেরিফকে, তীরের ভয়ে বাঁকা হয়ে ঘোড়ার পিঠে সেঁটে তীরবেগে ছুটলেন তিনি নগর-তোরণের দিকে।

এবার লিটল জনের বিশাল দুই কাঁধে হাত রেখে ওর চোখে চোখ রাখলো উইল স্টিউটলি। দরদর করে পানি নামলো ওর দু'চোখ বেয়ে। পাগলের মত কোলাকুলি করলো সে। চুমো খেল লিটল জনের দুই গালে। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, 'বন্ধু! প্রাণের বন্ধু!' কাঁদছে আর প্রলাপ বকে চলেছে স্টিউটলি, 'সত্যিকার প্রাণের বন্ধু তোমরা আমার! তোমাদের ভালবাসি, লিটল জন, তোমাদের সবাইকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি! বুকটা আমার কানায় কানায় ভরে গেছে, জন, গর্বে। ভাবতেও পারিনি এ জীবনে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে!' কোন উত্তর দিতে পারলো না দৈত্যাকার লিটল জন। অঝোরে কাঁদছে সে-ও। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে রবিন হুড, হাসছে মিটিমিটি।

সবাইকে ডেকে জড়ো করে রওনা হয়ে গেল রবিন হুড। সবার মাঝে রয়েছে উইল স্টিউটলি। ঝড়ের পর যেমন মেঘগুলো দ্রুত সরে যায়, তেমনি দ্রুত সরে গেল ওরা নগর-তোরণের কাছ থেকে; জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে তে-রাস্তার মাথায়

পড়ে রইলো শেরিফের দশজন আহত লোক।

রবিন হুডের দুঃসাহস দেখে এবার সত্যিই ভয় পেলেন শেরিফ। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তিনি, ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছে তাঁকে আজ রবিন হুড। ইচ্ছে করলেই একটা তীর ঢুকিয়ে দিতে পারতো সে তাঁর কণ্ঠনালী চিরে। মরতে মরতে বেঁচে এসেছেন তিনি আজ। মনে মনে স্থির করলেন, চাকরি যায় যাক, ওদেরকে সহজে ঘাঁটাতে যাবেন না তিনি আর। অনেকদিন ঘর থেকে বেরোলেন না তিনি। কারণ, যদিও সাহস করে মুখের ওপর কেউ কিছু বলে না, লক্ষ্য করেছেন তিনি, তাঁকে দেখলেই লোকের মুখ কেমন যেন হাসি হাসি হয়ে ওঠে।

আট

শেরউডের ভোজ

শেরিফটাকে ভাল মত একটু শায়েস্তা করা দরকার, মনে মনে ভাবলো রবিন। 'একের পর এক আমার বিরুদ্ধে যা খুশি তাই করে চলেছে লোকটা, চুপচাপ হজম করে গেলে করতেই থাকবে, থামবে না। কোনও ছুতোয় ওকে ধরে এনে শেরউডের ভোজ খাওয়ালে কেমন হয়?'

কথাটা মনে আসতেই হো হো করে হেসে উঠলো রবিন হুড। কোন ব্যারন বা জমিদার, অথবা মোটাসোটা মোহান্ত বা বিশপকে ধরতে পারলে সরাসরি টাকাকড়ি কেড়ে নেয় না রবিন কখনো; খুবই সমাদর করে ডেকে নিয়ে আসে আদেরকে নিজেদের ডেরায়, পেট পুরে ভোজ খাইয়ে তারপর তাদের থলি হালকা করে। সত্যিই, শেরিফকে একদিন ডেকে আনতে পারলে মন্দ হতো না।

উইল স্টিউটলিকে উদ্ধার করে আনার পর বেশ কিছুদিন চুপচাপ কাটালো রবিন ও তার দলবল। চুপচাপ থাকা মানে নিষ্ক্রিয় থাকা নয়, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, গান-বাজনা তো আছেই, প্রত্যেকদিন সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হয় কুস্তি, তলোয়ার ও লাঠিখেলা আর তীর-ধনুকের লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায়। এইভাবে দিন দিন আরো দক্ষতা অর্জন করে নিচ্ছে ওরা, নতুন নতুন কৌশল শিখে নিচ্ছে একে অপরের কাছ থেকে।

কিন্তু অল্পদিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলো দুঃসাহসী রবিন। রোমাঞ্চ বিবর্জিত সাদামাঠা জীবন ভাল লাগে না তার। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সেদিন—নাহ, একটু ঘুরে ফিরে আসতে হয়। কাউকে কিছু না বলে লিংকন গ্রীন ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরে নিল সে, তারপর হাঁটতে হাঁটতে শেরউডের ধার ঘেঁষে যাওয়া একটা রাস্তার কাছে এসে থামলো। এদিক-ওদিক চেয়ে সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো সে নটিংহামের দিকে। কিছুদূর গিয়ে গাড়ির শব্দে পিছন ফিরে তাকালো রবিন, দেখলো অল্প-বয়েসী এক মাংস-বিক্রেতা গাড়ি-ভর্তি মাংস নিয়ে খুশি মনে চলেছে নটিংহাম শহরের দিকে।

'সুপ্রভাত,' বললো তাকে রবিন। 'খুব খুশি মনে হচ্ছে যে আজ তোমাকে?'

'নিশ্চয়ই!' জবাব দিল তরুণ। 'কেন খুশি হবো না বলো। দিনটা চমৎকার, শরীরটা ভাল আছে, টাকা-পয়সার অভাব নেই, যাকে ভালবাসি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি আগামী বৃহস্পতিবার—দুঃখ করার কোন কারণ আছে আমার? গোটা লকস্লি শহরে আমার মত সুখী কে আছে আর?'

'লকস্লি শহরে বাড়ি বুঝি তোমার?' বললো রবিন। 'আমারও জন্ম ওই শহরেই। ওখানকার প্রতিটা ঝোপঝাড়, জঙ্গল, পাখির বাসা, ঝর্ণা, এমন কি ঝর্ণার ছোট ছোট মাছগুলো পর্যন্ত আমার চেনা। তা মাংস নিয়ে কোথায় চলেছো তুমি?'

'চলেছি নটিংহামের বাজারে। সত্যিই লকস্‌লি শহরে জন্ম তোমার? নাম কি?'

'আমার নাম রবিন হুড।'

'ওরে সব্বোনাশ!' ভয় পেয়ে গেল তরুণ। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি আমি। আমাদের ওখানে লোকের মুখে মুখে তোমার নাম। কিন্তু আমাকে ধরেছো কেন, আমি তো কারো ওপর কখনও কোন অন্যায় করিনি। শুনেছি নিরপরাধ কাউকে রবিন কিচ্ছু বলে না।'

'ঠিকই শুনেছো,' হাসলো রবিন।'তোমার কাছ থেকে কিছুই কেড়ে নেব না আমি। তোমাকে ভাল লাগলো তাই দু'টো কথা শুধাচ্ছি। স্যাক্সন তরুণের উজ্জ্বল হাসি-মাখা মুখ আমি ভালবাসি, আরো ভালবাসি যদি সে লকস্‌লি শহরের ছেলে হয়, তার চেয়েও বেশি ভালবাসি যদি জানতে পারি আগামী বৃহস্পতিবার সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ভাল-লাগা মেয়েটিকে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে তোমাকে দেখে একটা মতলব ঢুকেছে আমার মাথায়। বলো দেখি, কত পেলে গাড়ি, ঘোড়া, মাংস আর তোমার গায়ের ওই অ্যাপ্রন বিক্রি করবে আমার কাছে?'

'সব মিলে চার মার্ক দাম হয়,' ভেবে চিন্তে বললো তরুণ। 'অবশ্য যদি সব মাংস বিক্রি করতে পারি তবেই।'

কটিবন্ধে গোঁজা একটা থলে টেনে বের করলো রবিন, বাড়িয়ে দিল তরুণের দিকে। 'ছয় মার্ক আছে এতে। আজকের জন্যে কসাই সেজে নটিংহাম শহরে যাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছে আমার। এই ছয় মার্কের বিনিময়ে বেচবে এসব আমার কাছে?'

এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে খুশি মনে থলিটা নিল তরুণ। বললো, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। গাড়ি, ঘোড়া, মাংস আর এই অ্যাপ্রন এখন তোমার।'

'গুনে নাও টাকাটা,' অ্যাপ্রনটা গায়ে আঁটতে আঁটতে বললো রবিন।

'গোনা লাগবে না,' জবাব দিল তরুণ। 'স্বয়ং রবিন হুডের হাত থেকে পেয়েছি এই থলে, আমি জানি, ছয় মার্কের একটা পয়সা কম নেই এতে।'

তরুণ মাংস-বিক্রেতাকে বিদায় দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল রবিন নটিংহামের উদ্দেশে। বাজারে পৌঁছে কসাইদের জন্যে নির্দিষ্ট এলাকায় দোকান সাজিয়ে ফেললো সে ঝট্‌পট্‌। তারপর হাঁক ছাড়লোঃ 'মাংস নেবে···মাংস? খাসী গরু যার যা খুশি। চলে এসো।' চট্‌ করে একটা ছড়াও বানিয়ে ফেললো সে, গানের মত করে আবৃত্তি করছে সেটা বার বারঃ

'তিন পেনির মাংস যদি
এক পেনিতে কিনতে চাও,
জলদি এসো আমার কাছে
যার যা লাগে নিয়ে যাও।'

আবৃত্তি শেষ করেই ঝন ঝন আওয়াজ করে সে ছুরি দিয়ে, তারপর আবার হাঁক ছাড়ে, 'কই, কে নেবে, চলে এসো। তিন পেনির মাংস মোহান্ত বা বিশপের জন্যে ছয় পেনি, শহরের মান্যগণ্যদের জন্যে তিন পেনি, মোটাসোটা গিন্নীদের জন্যে এক পেনি, আর সুন্দরী তরুণীদের জন্যে বিনা পয়সায়—যদি একটা চুমো দেয় আমার গালে। কই, কে নেবে, চলে এসো।'

ক্রমে ভিড় জমে উঠছে ওর দোকানে। যারা কথা শুনে হাসছিল, মনে করেছিল ঠাট্টা, তারা অবাক হয়ে দেখলো মুখে যা বলছে কাজেও ঠিক তাই করছে লোকটা। গৃহিণীদের এক পেনিতে দিয়ে দিচ্ছে তিন পেনির মাংস, হাসিখুশি সুন্দরী তরুণী যদি একটা চুমো দিচ্ছে তাহলে বিনা পয়সায় পেয়ে যাচ্ছে বড়সড় এক চাকা মাংস। তাছাড়া গরীব বা বিধবা স্ত্রীলোক মাংস কিনতে এলে একটা পয়সাও নিচ্ছে না লোকটা। হুড়োহুড়ি লেগে গেল ক্রেতাদের মধ্যে, কে কার আগে কিনবে তাই নিয়ে

প্রতিযোগিতা। অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল সব মাংস।

আশেপাশের মাংস-বিক্রেতারা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষো শুরু করলো রবিনকে নিয়ে। কেউ বলছে, লোকটা নিশ্চয়ই চোর, কারো মাংস ভর্তি গাড়ি চুরি করে নিয়ে এসেছে। অন্যজন বলছে, আরে দূর, চোর হলে এমন খোলামেলা হাসিখুশি ভাব থাকতো না, আমার মনে হয়, ব্যাটা কোন বড়লোকের উড়নচণ্ডী সন্তান, বাপের জমিজমা বেচে টাকা ওড়াচ্ছে ফুর্তি করে। দেখা গেল, বেশির ভাগ মাংস-বিক্রেতারই

ধারণা লোকটা কোন ধনী কৃষকের বখে যাওয়া সন্তান।

কয়েকজন এগিয়ে এলো আলাপ পরিচয় করতে। রবিনকে নিমন্ত্রণ করলো একজন, 'এসো না ভাই, আজ আমাদের কসাই-সমিতির পক্ষ থেকে গিল্ড হলে একটা ভোজ আছে, মাননীয় শেরিফ আয়োজন করেছেন এই ভোজের। আমাদের নতুন সদস্য হিসেবে তুমিও চলো সেখানে। ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, খারাপ লাগবে না তোমার।'

'বেশ তো, যাব না হয়,' জবাব দিল রবিন। 'প্রথম দিনই তোমাদের সাথে ভোজ খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। দাঁড়াও, দোকানটা গুটিয়ে নিই আগে।' একটু ভেবে আবার বললো, 'ঘোড়াটা আমার দরকার, কিন্তু বাকি যা আছে সব বেচে দিতে চাই, লাগবে নাকি তোমাদের কারো?'

ঘোড়াটা রেখে বাকি যা ছিল পানির দামে বেচে দিল রবিন, তারপর খুশি মনে রওনা হলো ভোজ সভায় অংশ নিতে। শেরিফ সেখানে পৌঁছে গেছেন আগেই। হাসিখুশি রবিনকে ঢুকতে দেখে একজন কসাই তাঁর কানে কানে বললো, 'ওই যে লোকটা ঢুকছে দেখছেন...একেবারে বদ্ধ উন্মাদ! তিন পেনির মাংস আজ বেচে দিয়েছে এক পেনিতে। অনেককে বিলিয়ে দিয়েছে বিনা পয়সায়।'

'তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে রবিনকে লক্ষ্য করলেন শেরিফ। কিন্তু কসাইয়ের বিচিত্র বেশ পরে থাকায় চিনতে পারলেন না। 'কে লোকটা?'

'মনে হয় কোন ধনী গৃহস্থের উড়নচণ্ডী বখাটে সন্তান। দু'হাতে ওড়াচ্ছে টাকা।'

এই কথা শুনে রবিনকে কাছে ডেকে বসালেন শেরিফ; কারণ, ধনী লোকের স্বল্পবুদ্ধি উড়নচণ্ডী ছেলে-পিলে তাঁর খুব পছন্দ–বিশেষ করে যদি সে ছেলের পকেট হালকা করার কোন সম্ভাবনা থাকে। খাওয়ার সাথে সাথে হাসি ঠাট্টা গল্প-গুজবে মেতে উঠলো রবিন। ওর রসিকতায় সবার আগে হেসে উঠছেন শেরিফ, চেষ্টা করছেন কথাবার্তার মাধ্যমে আরো ঘনিষ্ঠ হতে, মাঝে মাঝে বাহবার চাপড়ও মেরে বসছেন ওর পিঠে।

ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে রবিন, আজকের এই ভোজের সমস্ত খরচ বহন করবে সে নিজে, কেউ যেন প্রাণ ভরে খেতে বা পান করতে কোনরকম কার্পণ্য না করে। রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন শেরিফ। 'যে দামে মাংস বিক্রি করেছো শুনলাম...অনেক গরু-ছাগল আছে বুঝি তোমাদের? জায়গা-জমি?'

'ঠিক কত একর যে আছে আমি নিজেও জানি না,' বললো রবিন হাসতে হাসতে। 'ওসব হিসেব রাখতো বুড়ো বাপ। অত হিসেব নিকেশ করতে গিয়েই তো মারা পড়লো বেচারা। জমি...তা কয়েকশো একরের কম হবে না, এটুকু আমি জানি। শিংওয়ালা পশু রয়েছে আমার পাঁচশোর ওপর। কিন্তু হলে কি হবে, ওসব দিয়ে আমি কি করবো, আমার দরকার নগদ টাকা।'

লোভে চকচক করে উঠলো শেরিফের দু'চোখ। মনে মনে স্থির করে ফেললেন, এই অপব্যয়ী ছোকরার পকেট থেকে কিছু খসাতেই হবে, তা না পারলে দুঃখ থেকে যাবে আজীবন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনো বিক্রি হয়নি সে-সব?'

'নাহ্, খরিদ্দার পাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, খরিদ্দার আসলে খুঁজিওনি আমি এর আগে। এবার ভাবছি খুঁজতে হবে। খুব সস্তাতেই বেচে দেব আমি সব।'

'কত?' সামনে ঝুঁকে এলেন শেরিফ, 'কত হলে বেচবে?'

ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে মনে মনে হিসেবের ভান করলো রবিন, তারপর বললো, 'আমার ভাইদের সাথে আলাপ না করে জমির কথা বলতে পারছি না, তবে পশুগুলো বেচে দিতে পারি আমি যখন তখন। ওগুলোর ন্যায্য দাম, আমার বিশ্বাস, কমপক্ষে সাড়ে সাতশো পাউণ্ড। তবে পাঁচশো পেলেই ছেড়ে দেব আমি খুশি মনে।'

'পাঁ-চ-শো!' ভুরুজোড়া কপালে তুললেন শেরিফ। কিছু বলতে যাচ্ছিল কসাইদের একজন, চট্ করে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাকে, তারপর বললেন, 'নাহ্, অনেক বেশি দাম চাইছো। তাছাড়া অত টাকা নেইও আমার কাছে। যদি তিনশো পাউণ্ডে হয় তো আমি কিনতে পারি।'

'ঠকা হয়ে যায়,' বললো রবিন। লক্ষ্য করলো দূর থেকে বেশ কয়েকজন মাথা নেড়ে বারণ করছে ওকে, যেন শেরিফকে কোন কথা দিয়ে না ফেলে। কাছাকাছি একজন ছটফট করে কিছু বলে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল শেরিফের ভ্রূকুটি দেখে। যেন এসব কোনদিকে খেয়াল নেই, এমন ভঙ্গিতে রবিন বললো, 'কি যে করি! নগদ টাকাটাও দরকার খুবই। আচ্ছা ঠিক আছে, যান, তিনশো পাউণ্ডই সই। আমি রাজি।'

'ঠিক তো?' হাত বাড়িয়ে দিলেন শেরিফ। সেই হাতের উপর চাপড় মারলো রবিন।

'ঠিক। কিন্তু টাকাটা সাথে করে নিতে হবে আপনার। বাকি বকেয়া···'

'আরে, না, না!' হেসে উঠলেন শেরিফ। 'নগদ তিনশো পাউণ্ড সাথে নিয়ে যাব আমি তোমার সাথে। নামটা কি তোমার, ভাই?'

'লকস্লির রবার্ট বলে ডাকে আমাকে সবাই।'

'ঠিক আছে, রবার্ট, তাহলে এই কথাই থাকলো। আজই বিকেলে তোমার সাথে যাচ্ছি আমি, জিনিস পছন্দ হলে টাকা দিয়ে কিনে রেখে আসবো, কাল আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে ওগুলো। কেমন?'

'কোন আপত্তি নেই,' বললো রবিন। সবাইকে তাড়া দিল, 'কই, হাঁ করে রয়েছো কেন তোমরা সব? চালাও—হাত চালাও, মুখ চালাও।'

ভোজ শেষ হলো। সবাই বলাবলি শুরু করলো, কাজটা শেরিফের উচিত হলো না। এমন ভাবে ঠকানো ঠিক হলো না হাসিখুশি, অপব্যয়ী, নির্বোধ ছেলেটাকে।

যাই হোক, বিকেল হতেই রওনা হয়ে গেল দু'জন ঘোড়ায় চেপে। শেরউড জঙ্গলের কাছাকাছি এসেই কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো শেরিফের, চমকে চমকে তাকাতে শুরু করলেন তিনি এদিক ওদিক। জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে কথাবার্তা কমিয়ে দিলেন তিনি, রবিনের কথার উত্তরে হুঁ-হাঁ করেন শুধু, তাও আবার নিচু গলায়।

'একটু আস্তে কথা বলো,' আরো কিছুদূর এগিয়ে পরামর্শ দিলেন তিনি রবিনকে। 'এই জঙ্গলেই বাস করে ভয়ঙ্কর দস্যু রবিন হুড! ওর হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই।'

জোরে হেসে উঠলো রবিন এই কথা শুনে। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিস্টার শেরিফ। ভাল করেই চিনি আমি রবিন হুডকে। অযথা ভয় পাবেন না। আমার মত নিরীহ একজন লোককে দিয়ে যতটুকু ভয়, তার চেয়ে বেশি ভয় নেই আজ আপনার রবিন হুডকে দিয়ে।'

চট্ করে রবিনের মুখের দিকে চাইলেন শেরিফ। মনে মনে বললেন, 'রবিন হুডের সাথে তোমার এত খাতির থাকাটা তো মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার, ছোকরা। শেরউড থেকে বেরোতে পারলে বেঁচে যাই।'

কিন্তু এগোতেই থাকলো রবিন। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে ঢুকছে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। পাথরের মূর্তির মত একেবারে চুপ হয়ে গেছেন শেরিফ। হঠাৎ একটা মোড়ে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো রবিন। বেশ কিছুটা দূরে একদল হরিণ পার হয়ে যাচ্ছে রাস্তা। হাত তুলে দেখালো সে শেরিফকে, 'ওই দেখুন আমার শিংওয়ালা পশু। কেমন তাজা আর মোটাসোটা! পছন্দ হয়েছে আপনার?'

কথা শুনে ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো শেরিফের। ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি রবিনের মুখের দিকে। 'তামাশা করার জন্যে নিয়ে এসেছো তুমি আমাকে এতদূর?

তোমার সঙ্গে আর এক কদম সামনে এগোচ্ছি না আমি! চললাম! তুমিও সিধে চলে যাও নিজের রাস্তায়!'

হেসে উঠলো রবিন। 'রাগ করছেন কেন, স্যার শেরিফ? আমার ভাইদের সাথে দেখা না করেই চলে যাবেন, তা কি হয়?' চট্ করে এক হাতে চেপে ধরলো সে শেরিফের ঘোড়ার লাগাম, অপর হাতে শিঙাটা মুখে তুলে তিনটে ফুঁ দিল তাতে।

চারপাশ থেকে ছুটে এলো পাঁচ-কুড়ি সবুজ পোশাক পরা তাগড়া জোয়ান, সবার আগে রয়েছে লিটল জন।

'আজ্ঞা করুন, প্রভু!' বিনয়ের অবতার সেজে মাথা ঝুঁকালো লিটল জন রবিনের উদ্দেশে।

'লাগামটা ধরো, লিটল জন,' বললো রবিন। 'দেখতে পাচ্ছো না, আমাদের আজকের ভোজে প্রধান অতিথি হিসেবে কে এসেছেন? ছি, ছি, চিনতে পারছো না এঁকে? আমাদের প্রিয় আইন রক্ষক নটিংহামের মাননীয় শেরিফের চেহারাটা ভুলে গেছো এরই মধ্যে? আমাদের দাওয়াত কবুল করে ধন্য করেছেন তিনি আজ আমাদের।'

সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সবাই খুলে ফেললো মাথার টুপি। কারো মুখে বিন্দুমাত্র হাসির আভাস নেই। এক হাতে লাগাম ধরে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো লিটল জন শেরিফের ঘোড়াটাকে। সবাই চললো পিছন পিছন।

একটি কথাও বেরোলো না শেরিফের মুখ থেকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চারপাশে চাইছেন—যেন হঠাৎ জেগে উঠেছেন ঘুম থেকে। জঙ্গলের আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে মনটা একেবারে দমে গেল তাঁর। তিনশো পাউণ্ড তো যাবেই, প্রাণটা থাকবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, একবার নয়, পর পর বহুবার এদের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছেন তিনি। যখন দেখলেন, সসম্ভ্রমে নিয়ে চলেছে ওরা তাঁকে, কেউ কোন রকম হুমকি দিচ্ছে না, তখন আরো ভয় পেয়ে গেলেন তিনি, টেনে ছেড়ে দেয়া ধনুকের ছিলার মত কাঁপতে শুরু করলো তাঁর বুকের ভেতরটা।

বিশাল এক ওক গাছের নিচে এসে থামলো রবিন, সবুজ ঘাসের ওপর বসে শেরিফকে বসালো তার ডান পাশে। 'জলদি!' হুকুম করলো সে, 'জলদি করে খানাপিনার ব্যবস্থা করো। ভাল ভাল যা কিছু আছে নিয়ে এসো সব। আমাদের পরম পূজণীয় মহাত্মা শেরিফ আজ আমাকে নটিংহামের গিল্ড হলে দাওয়াত খাইয়েছেন…যদিও পয়সাটা দিতে হয়েছে আমাকেই…আমাদের এখানে পদার্পণ করে শুধু মুখে তিনি ফিরে যাবেন, সেটা হতেই পারে না।'

টাকা-পয়সার কথা একবারও উল্লেখ করা হলো না দেখে কিছুটা সামলে নিলেন শেরিফ। মনে মনে বললেন, 'হয়তো ভুলেই গেছে রবিন হুড যে তিনশো পাউণ্ড রয়েছে আমার কাছে।'

শেরিফের সম্মানে লাঠি খেলার আয়োজন করা হলো। এদিকে বাতাসে ভেসে আসছে গনগনে আগুনে হরিণের মাংস আর খাসি-মোরগের রোস্ট, সেই সাথে মাংসের পিঠে ঝলসানোর জিভে-পানি-আসা গন্ধ। খুশি হয়ে উঠলো শেরিফের মন। লাঠি খেলার চমৎকার কৌশল দেখে নিজের অজান্তেই হাততালি দিয়ে উঠছেন তিনি, চেঁচিয়ে উঠছেন, 'বাহ! বেড়ে মেরেছো হে, কালো দাড়ি!' এই লোকটাই যে তাঁর কাছ থেকে রবিন হুডের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে শেরউডে আসা সেই ঝালাইকার, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না।

এবার শুরু হলো তীর-ধনুকের খেলা। একশো ষাট গজ দূরের লক্ষ্য ভেদ করছে একজনের পর একজন তুখোড় তীরন্দাজ। কিন্তু এসব দেখে আনন্দিত না হয়ে বরং বিমর্ষ হয়ে পড়লেন শেরিফ। কারণ, কিছুদিন আগেই তাঁকে বোকা বানিয়ে আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখিয়ে পুরস্কার জিতে নিয়ে এসেছে রবিন নটিংহাম থেকে, সেই সোনার

তীরটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি, ঝুলছে গাছের ডালে। তাঁর মনের ভাব টের পেয়ে এই খেলা বন্ধ করে দিল রবিন। তলোয়ারের খেলা দেখতে হলে আরো খারাপ লাগবে শেরিফের, মনে পড়ে যাবে উইল স্টিউটলিকে উদ্ধার করার সেই দৃশ্য, তাই সেটাও বাদ দিয়ে গানবাজনার আয়োজন করতে বললো সে অনুচরদের। চমৎকার জমে উঠলো গানের আসর, হার্পের সুরলহরী সৃষ্টি করলো অপূর্ব পরিবেশ।

খাবার তৈরি হয়ে যেতেই কয়েকজন এসে ঘাসের উপর বিছিয়ে দিল দস্তরখান, কয়েকজন নিয়ে এলো পিপে ভর্তি নানান জাতের সুপেয় মদ। দস্তরখানের দুই পাশে লাইন করে বসে গেল সবাই। শুরু হলো পরিবেশন। তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেল সবাই, মদ খেল আকণ্ঠ। খাওয়া যখন শেষ হলো, অস্ত গেছে সূর্য, আধখানা ফ্যাকাসে চাঁদ ম্লান আলো দিচ্ছে পাতার ফাঁক দিয়ে।

খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুললেন শেরিফ, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। 'তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললেন তিনি। 'প্রাণ ভরে খেলাম আজ। তোমাদের ব্যবহারেও আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়ে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি আমি। আমি এবার উঠতে চাই। সাঁঝ হয়ে এলো, আর দেরি করলে রাত হয়ে যাবে, পথ হারিয়ে ফেলবো জঙ্গলে।'

রবিন হুডও উঠে দাঁড়ালো, তার সাথে সাথে আর সবাই। 'আপনাকে যেতে যখন হবেই, আটকাবো না,' বললো রবিন। হাসলো। 'তবে মনে হয় কিছু একটা বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন আপনি।'

'কই, না তো! কিছুই তো ভুলে ফেলে যাচ্ছি না!' মুখে কথাটা বললেন বটে কিন্তু মনটা দমে গেল শেরিফের।

'ফেলে যাচ্ছেন না, ভুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, মাননীয় শেরিফ!' বললো রবিন। 'আমাদের এই শেরউডের সরাইখানায় যাঁরাই অতিথি হন তাঁদের ভোজের খরচটা দিয়ে যাওয়াই নিয়ম।'

'ও, এই কথা!' হা হা করে প্রাণহীন ফাঁকা হাসি হেসে উঠলেন শেরিফ। 'তোমাদের সঙ্গে চমৎকার কাটলো সময়টা। চাওয়ার আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, বিশটা পাউণ্ড দিয়ে যাবো আমি তোমাদের।'

'এ কথা বলে দয়া করে লজ্জা দেবেন না,' বললো রবিন। 'আপনি মাত্র বিশটা পাউণ্ড দিলে মুখ দেখাতে পারবো না আমি আর কোনদিন কারো কাছে। সবাই ছি ছি করবে আমাকে কিপ্টে অতিথি ডেকে আনার জন্যে। তাছাড়া আপনি এতবড় একজন রাজ-কর্মচারী, এই সামান্য টাকা দেয়া কি আপনার সাজে? আমার মনে হয় শ তিনেক পাউণ্ড দিলে মানায়–কি বলো তোমরা?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়!' চেঁচিয়ে উঠলো সবাই।

'তিনশো পাউণ্ড!' আঁৎকে উঠলেন শেরিফ। 'তুমি কি মনে করো তোমার এই ফকিরী খানার দাম তিন পাউণ্ডের চেয়ে এক পেনি বেশি হবে?'

'অত কড়া কথা বলবেন না, স্যার শেরিফ,' গম্ভীর হয়ে উঠলো রবিন। 'যদিও আমাকেই দামটা দিতে হয়েছে, তবু আজকের ওই গিল্ড হলের ভোজের জন্যে আপনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা আপনাকে অতটা ভালবাসে না। এই যেমন ধরুন, উইল স্টিউটলির কথা–কদিন আগে যাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাতে যাচ্ছিলেন, কিংবা ধরুন আরো দু'জনের কথা–ক'দিন আগে নটিংহামের খণ্ডযুদ্ধে যারা আহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে আপনার প্রতি তেমন কোন ভালবাসার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না, বরং কেমন একটা আক্রমণাত্মক ভাব লক্ষ্য করছি। ওদেরকে একটু ঠাণ্ডা করার জন্যে যদি কিছু বেশি খরচ হয়ে যায়, সেটা আপনার নিজের

মঙ্গলের জন্যেই হবে।'

এই কথা শুনে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল শেরিফের মুখটা, মাটির দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে কোমরে গোঁজা থলিটা বের করে ছুঁড়ে দিলেন দস্তরখানের উপর।

'গুনে দেখো, লিটল জন,' বললো রবিন হুড। 'আমরাও দেখি। কম-টম থাকলে কে যাবে আবার নটিংহামে বাকিটুকু চেয়ে আনতে?'

গুনতে শুরু করলো লিটল জন। টুং-টাং আওয়াজ হচ্ছে আর কানের ভিতর যেন শেল ঢুকছে শেরিফের। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় ঠিক তিনশো পাউণ্ডই পাওয়া গেল থলিতে। গোণা শেষ হতেই মুদ্রাগুলোর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন শেরিফ, নীরবে এগিয়ে গিয়ে উঠে বসলেন নিজের ঘোড়ায়।

'চলুন, স্যার শেরিফ, আপনাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি,' বলে ঘোড়ার লাগামটা হাতে নিল রবিন। রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললো, 'এরপর আর কাউকে সর্বস্বান্ত করার আগে দয়া করে আজকের ঘটনাটা একটু স্মরণ করবেন। বিদায়, স্যার শেরিফ। হয়তো আবার দেখা হবে কোনদিন।' এই বলে ঘোড়ার পিঠে জোরে একটা চাপড় দিল রবিন।

ছুটতে শুরু করলো ঘোড়া নটিংহামের পথে।

নয়

আবার শেরিফ শেরউডে

বেশ কিছুদিন পরের কথা। হঠাৎ একটা গুজব কানে এলো রবিনের, শেরিফ নাকি আবার শেরউড আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে বিরাট এক বাহিনীও গঠন করেছেন গোপনে।

'ব্যাপারটা গুজব না সত্যি, জানা দরকার,' বললো রবিন। 'আচ্ছা, ভাল কথা··· আমাদের লবের খবর পাওয়া যাচ্ছে না কেন? বেশ অনেকদিন হয়ে গেল না?'

'ঠিকই তো!' বললো লিটল জন। 'বহুদিন খবর নেই ওর। এক কাজ করি, আজই ছদ্মবেশে চলে যাই আমি নটিংহামে। সব খবর নিয়ে আসি গিয়ে। সকালে বাজারে, আর সন্ধ্যায় শুঁড়িখানায় ঢুঁ মারলেই দুনিয়ার সব খবর জানা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সাবধান, লিটল জন,' বললো রবিন। 'খবর আনতে গিয়ে নিজেই খবর হয়ে যেয়ো না আবার। তোমাকে হারাতে চাই না আমি। দুনিয়ার সব খবর একত্র করলেও তোমার···'

'কোন চিন্তা নেই, ওস্তাদ,' বললো লিটল জন। 'নিজের দিকে লক্ষ রাখবো আমি।'

সেইদিন বিকেলের দিকে নটিংহামের নগর-তোরণ দিয়ে বিশাল চেহারার এক পঙ্গু ভিখারী ঢুকলো শহরে। নোংরা ছেঁড়া জামা গায়ে, ভয়ানক ভাবে খোঁড়াচ্ছে লোকটা, এক কাঁধ অপরটার চেয়ে ছয় ইঞ্চি উঁচু, মুখটা বেঁকে আছে একদিকে। তোরণ-রক্ষীরা হাসাহাসি করলো তাকে নিয়ে, কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল ভিখারী, যেন একটু বিশ্রামের জন্যে ছায়া খুঁজছে। বাজার পেরিয়ে একটা সরু গলিতে ঢুকলো ভিখারী, তারপর আরো কিছুদূর এগিয়ে আরও সরু আরেক গলিতে। ছোট্ট একটা দোকানের সামনে দাঁড়ালো লোকটা। লব নামের এক মুচির দোকান ওটা। সাধারণতঃ এই সময়ে তাকে ব্যস্ত ভাবে জুতো সেলাই করতে বা ঠুং-ঠাং শব্দে পেরেক ঠুকতে দেখা যায়, কিন্তু আজ দোকান বন্ধ। দোকানের পিছনে একটা ছোট্ট অন্ধকার মত ঘরের দরজায়

এসে দাঁড়ালো ভিখারী। গলা বাড়িয়ে দেখলো, নোংরা এক বিছানায় শুয়ে আছে লব।

'কি হে, লব? অসুখ করেছে নাকি?' নিচু গলায় জানতে চাইলো ভিখারী।

গলার স্বরটা চিনতে পেরে ধড়মড় করে উঠে বসলো লব বিছানার উপর। 'লিটল জন! তুমি! একমাস ধরে পড়ে আছি বিছানায়। এখন একটু ভালর দিকে। তোমাদের খবর কি?'

'আমাদের সব খবর ভাল। তোমরা জন্যে চিন্তায় পড়ে গেছিল রবিন, তাই আমি এলাম খবর নিতে।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বললো লব। 'কিন্তু কাজটা কি ঠিক হলো? কিছুদিন আগে নাকি ভোজ খাইয়ে তিনশো পাউণ্ড রেখে দিয়েছো তোমরা শেরিফের কাছ থেকে? ধরতে পারলে আস্ত রাখবে সে তোমাকে?'

'আস্ত থাকলে না টুকরো করবে!' হাসলো লিটল জন। 'আমি পঙ্গু এক দীনহীন ভিখারী, আমাকে ধরতেই বা যাবে কেন? যাকগে, একটা গুজব পৌঁছেচে শেরউডেঃ শেরিফ নাকি আবার একটা আক্রমণের আয়োজন করছে? সঠিক খবরটা কোথায় গেলে পাবো বলো তো?'

'কি জানি, আমার কানে তো আসেনি কথাটা,' বললো লব। 'প্রকাশ্যে কিছু করছে না, এটা নিশ্চিত; যদি গোপন কোন পরিকল্পনা নিয়ে থাকে, সংবাদ বের করা সহজ হবে না।'

'বেশ তো, এসেছি যখন, একটু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। আমি বরং শহরটা একপাক ঘুরে আসি। তোমার এখানে শোয়ার একটু ব্যবস্থা রেখো, বাইরে থেকে খেয়েদেয়ে ফিরবো।'

লবের কুঠরী থেকে বেরিয়ে এলো ভিখারী, ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলো, মাথার তালি দেয়া নোংরা টুপিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাজারের ক্রুশটার ধারে। কেউ একটা পয়সাও ফেললো না টুপিতে, কিন্তু পয়সার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ ভিখারীর লোকজনের কথাবার্তা শোনার প্রতি। ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকে তেমন সুবিধে হলো না দেখে শুঁড়িখানার দিকে চললো সে। ওর জানা আছে, শেরিফের লোকজন নিয়মিত আসা-যাওয়া করে এইখানে। দরজা দিয়ে ঢোকার মুখেই বাধা পেল সে। দোকানের ইয়া মোটা মালিক আটকে দিল তাকে।

'ভাগো, ভাগো এখান থেকে! আমার খদ্দেরদের বিরক্ত করা চলবে না। অন্যখানে ভিক্ষা করোগে যাও।'

'ভিক্ষা চাই না, বাবা,' বললো ভিখারী। 'একপাত্র এলের পয়সাও কি নেই মনে করেছো আমার কাছে? আমিও খরিদ্দার। কি? দেখতে চাও?' কোমরে গোঁজা একটা ছোট্ট থলি থেকে কয়েকটা পেনি বের করে দেখালো সে শুঁড়িখানার মালিককে।

'ঠিক আছে, ঢুকতে পারো,' বললো মোটা মালিক। 'তবে মাঝের ঘরে বিশিষ্ট খদ্দেরদের কাছে যেতে পারবে না। ওই যে, ওই টুলে গিয়ে বসে যা খাবার খেয়ে বিদেয় হও।'

তর্ক না করে সেই দিকেই এগোলো ভিখারী, কারণ এখানে বসেও পাশের ঘরের প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথা শুনতে পাবে সে পরিষ্কার। টুলে বসে পরম পরিতৃপ্তির সাথে মদের পাত্রে চুমুক দিচ্ছে, আর চোখ বুজে কান খাড়া করে রেখেছে সে। শেরিফের দু'জন লোক রয়েছে খরিদ্দারদের মধ্যে, সবার সাথে সমান তালে গল্প করছে, কিন্তু কেউ শেরউডে হানা দেয়ার ব্যাপারে কোন কথা বললো না। বেশির ভাগ লোকেরই আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আগামী কালকের শূটিং ম্যাচ। প্রত্যেক অক্টোবরে বিরাট মেলা বসে নটিংহাম শহরে, সেই মেলায় আয়োজন করা হয় তীর-ধনুক প্রতিযোগিতার।

প্রতিযোগিতার কথা শুনে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো ভিখারীর। মনে মনে বললো,

'একটা ধনুক জোগাড় করতে পারলে কাল আমিও যাব ওখানে, কারণ এইসব প্রতিযোগিতার সময় কারো মুখে কোন লাগাম থাকে না। এখানে ওখানে কান পেতে বেড়ালে আসল খবর কানে আসবেই।'

রাত বাড়ছে, আর বসে থাকা সমীচীন হবে না বুঝতে পেরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে এলো সে লবের কুঠরীতে। খড় বিছিয়ে বিছানা করে রেখেছে লব এককোণে, সেই বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লো ভিখারী।

পরদিন দুপুরেই জমে উঠলো বাজারের কাছে লোকজনের ভিড়। ঝকঝকে জামা পরে এককোণে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে তিনজন। গাল ফুলে আপেলের মত দেখাচ্ছে ওদের মুখ। সকাল সকাল ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাকাটা এবং অন্যান্য সব কাজ সেরে নিয়েছে লোকেরা আজ, বিকেলটা যাতে ব্যয় করা যায় আনন্দে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে ঘোষক প্রতিযোগিতার নিয়ম এবং বিজয়ীর পুরস্কার। নতুন একটা রূপোর শিঙায় ভরে বিশটা রূপোর পেনি দেয়া হবে বিজয়ীকে–শুনে সবাই বুঝলো তীব্র প্রতিযোগিতা হবে আজ, অনেক ভাল ভাল তীরন্দাজ আসবে আজকের এই প্রতিযোগিতায়।

বাজারের ক্রুশের পাশে একটা টেবিলে বসে আছে একজন কেরানি কাগজ কলম আর দোয়াত নিয়ে; একজন একজন করে প্রতিযোগীরা এগিয়ে আসছে তার কাছে, নাম লিখিয়ে চলে যাচ্ছে শূটিং ম্যাচের জন্যে নির্দিষ্ট তাঁবুতে। প্রতিযোগীদের লাইনে রয়েছে বিশাল চেহারার সেই কুৎসিত, খোঁড়া ভিখারীটা। তারও কাঁধে ঝুলছে একটা ধনুক, পিঠে তীরভর্তি তূণ, মুচি লবের এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়েছে সে এগুলো।

ভিখারীকে কেরানির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে হো হো করে হেসে উঠলো দর্শকরা। ওর পিছনে দাঁড়ানো লোকটা বিরক্তির সাথে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ভিখারীকে লাইন থেকে।

'অ্যাই, সরো দেখি,' বললো লোকটা। 'এখানে ভিড় করছো কেন?'

ধাক্কা খেয়ে পিছন ফিরে চাইলো ভিখারী। লম্বা চওড়া লাল-মুখো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওর পিছনে, পরনে জঙ্গল-রক্ষীর পোশাক। 'ধাক্কা দিচ্ছেন কেন, ভাই?' বললো ভিখারী। 'আপনার মত আমিও তো এসেছি প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে।'

'বলে কি ব্যাটা!' হাস্যকর মুখ ভঙ্গি করলো লালমুখো লোকটা। 'তুমি এসেছো শূটিং ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে? পাগল হয়েছো নাকি? যাও, ভাগো! যে কাজ তোমাকে সাজে···গম খেতের কাকতাড়ুয়াগুলোর পোশাক চুরি করোগে যাও।'

এই কথা শুনে হাসির হুল্লোড় উঠলো দর্শকদের মধ্যে। ছিন্নবস্ত্র ভিখারীর ঠিক আঁতে ঘা দিয়ে দারুণ এক রসিকতা করেছে জঙ্গল-রক্ষী। কিন্তু সবার মুখের হাসি নিভে গেল, যখন দেখলো আশ্চর্য শক্তিশালী একটা হাত বেরিয়ে এলো ভিখারীর ছেঁড়া জামার আড়াল থেকে, তারপর, যেন তিন বছরের শিশুকে তুলে নিচ্ছে, এমনি অবলীলায় ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে সরিয়ে দিল জঙ্গল-রক্ষীকে একপাশে। নরম গলায় বললো, 'আমি আগে ছিলাম, আমি আগে নাম লেখাবো। আপনার স্মরণ রাখা দরকার, আজকের এই খেলা শুধুমাত্র জঙ্গল-রক্ষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিংবা ভিখারীদের জন্যেও কোন বিধিনিষেধ নেই।'

রেগে আগুন হয়ে গেল জঙ্গল-রক্ষী, একলাফে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলো ভিখারীর নাক লক্ষ্য করে।

'উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও, হ্যাল!' চেঁচিয়ে উঠলো ওর বন্ধু-বান্ধব। 'নাকটা ফাটিয়ে দাও ব্যাটার!'

কিন্তু হ্যালের ঘুসি স্পর্শই করতে পারলো না ভিখারীকে। বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরিয়ে নিয়েছে সে তার মাথা, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে ঘুসি।

'পালাও, জলদি পালাও এখান থেকে!' ভিখারীর কানের কাছে ফিসফিস করে

উঠলো একজন নিরীহ নিম্নমধ্যবিত্ত লোক। 'ঘুসিয়ে ভর্তা করে দেবে হ্যাল তোমাকে!'

'পালাবো কেন?' বললো ভিখারী। 'গোল হয়ে একটা রিং তৈরি করো সবাই। দেখি কেমন ঘুসিয়ে ভর্তা করে হ্যাল আমাকে।'

'রিং বানাও!' রিং বানাও!' খুশি হয়ে চেঁচামেচি শুরু করলো সবাই। 'ভিখারীর সাথে লড়ুক ক্রুফটের হ্যাল, দেখি কে জেতে!'

হঠাৎ এই ঝগড়া বেধে গিয়ে চমৎকার একটা মারপিট দেখার সুযোগ পেয়ে গেছে শহরবাসী। আহ্লাদে আটখানা হয়ে গোল রিং তৈরি করে দিল তারা। খুশি হয়েছে হ্যালও। গায়ের ফতুয়া খুলে ফেললো সে, ধনুকটা ধরিয়ে দিল এক বন্ধুর হাতে, তারপর দুই হাতে থুথু দিয়ে শক্ত করে পাকালো মুঠি। বেয়াড়া ভিখারীকে উচিত শিক্ষাই দেবে সে আজ। সবাই জানে গোটা নটিংহাম শহরে তার সমকক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা আর একজনও নেই।

জামা কাপড় কিছুই ছাড়লো না ভিখারী, সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টাও করলো না। হাতের ধনুকটা শুধু ধরিয়ে দিল একজন সাদামাঠা কৃষকের হাতে। তারপর এমন হাস্যকর ভঙ্গিতে রিঙের একধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত উঁচু-নিচু হয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলো যে হেসে খুন হয়ে গেল দর্শকবৃন্দ, হৈ-হৈ করে উঠলো আনন্দে।

গগন বিদারী হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে শুরু হলো মারপিট। একের পর এক প্রচণ্ড ঘুসি চালিয়ে গেল ক্রুফটের হ্যাল ভিখারীর নাক-মুখ-চোয়াল লক্ষ্য করে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটিবারও লাগাতে পারলো না সে জায়গামত। ভিখারীটা এমনই খোঁড়া, যে যখনই এক পা সামনে বা পিছনে ফেলছে, মাথাটা ওর উঠে যাচ্ছে একফুট উপরে বা একফুট নিচে। আর ব্যাপারটা এমনই বিদ্যুৎগতিতে ঘটছে যে ভালমত লক্ষ্যস্থির করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে হ্যালের পক্ষে। প্রতিটা ঘুসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই দড়াম করে হাতুড়ির ঘায়ের মত একটা করে ঘুসি এসে লাগছে হ্যালের পাঁজরে। ভিক্ষার ঝুলি আর ঢোলা ছেঁড়া জামা-কাপড় সহ এমনই হাস্যকর ভঙ্গিতে উঁচু-নিচু হয়ে লাফাচ্ছে আর খোঁড়াচ্ছে ভিখারী যে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল দর্শকদের। এমন অদ্ভুত লড়াই জীবনে দেখেনি তারা। হঠাৎ করেই শেষ পর্যায়ে চলে এলো লড়াইটা। রাগে অন্ধ হ্যাল তাড়া করে কোনায় এনে ফেললো ভিখারীকে, যেখান থেকে কোন কৌশলেই উদ্ধার নেই।

'কোণঠাসা হয়ে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল হ্যালের বন্ধু-বান্ধব তাকে। 'এইবার! এইবার বাগে পেয়েছো, হ্যাল। দেখিয়ে দাও, জঙ্গল-রক্ষীর ঘুসি কাকে বলে।'

এমনি সময়ে, সবাই যখন বুঝতে পারছে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা হ্যাল এবার শেষ খেলা দেখাবে, অনেকে একটু যেন দুঃখবোধ করছে দীন ভিখারীর করুণ পরিণতির কথা ভেবে–হঠাৎ বিকট এক দৈত্যের মত ঝাড়া সাত ফুট লম্বা হয়ে দাঁড়ালো ভিখারী, এবং এই প্রথম বারের মত শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগিয়ে দিল হ্যালের পাঁজরে। কড়াৎ! পরিষ্কার শুনতে পেল সবাই শব্দটা। পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙে গেছে হ্যালের, ছিটকে কয়েক হাত পিছিয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে মাটিতে। অজ্ঞান। বিস্ময়ের ধাক্কায় থ হয়ে রইলো সবাই কয়েক মুহূর্ত। তারপর কয়েকজন জঙ্গল-রক্ষী একসাথে এগিয়ে এলো লাঠি হাতে–ভিখারীকে আচ্ছামত শায়েস্তা করে ছেড়ে দেবে আজ।

জঙ্গল-রক্ষীদের এই অন্যায় আচরণে রেগে গেল দর্শকবৃন্দ। তারা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি হচ্ছে! অ্যাই, কি হচ্ছে!'

একজন শহরবাসী বাধা দিল জঙ্গল-রক্ষীদের। 'কোন রকম চোরা-গুপ্তা বেআইনী মার মারা হয়নি হ্যালকে। হ্যাল যা করতে যাচ্ছিল, ভিখারীও তাই করেছে–অন্যায়

কিছুই করেনি সে।' এই বলে প্রকাণ্ড এক লাঠি তুলে বোঁ করে মাথার উপর একপাক ঘুরালো লোকটা।

এই লোকের পিছনে সমর্থন জুটে গেল বেশির ভাগ দর্শকেরই। তাদের চিৎকারে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো জঙ্গল-রক্ষীরা। মুখগোমড়া করে হ্যালের জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল ওরা।

'ভিখারী,' জানতে চাইলো সেই লোকটা যে তাকে সমর্থন করেছিল, 'যে-রকম ঘুসি চালাতে জানো, সে-রকম তীর ছুঁড়তে পারো না?'

'পারি, হুজুর,' বললো ভিখারী একগাল হেসে। 'তাও পারি।'

'তাহলে চলো যাই,' সবার উদ্দেশ্যে বললো লোকটা। 'মনে হচ্ছে শুটিং ম্যাচটাও জমে উঠবে আজ।'

সবাই রাজি হলো। কেরানির কাছে নাম লিখিয়ে সবাই মিলে ওকে ঘিরে নিয়ে চললো প্রতিযোগিতা-ময়দানে, যাতে একা পেয়ে আবার আক্রমণ করে না বসতে পারে জঙ্গল-রক্ষীরা।

নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হলো শূটিং। দেখা গেল তীর-ধনুকেও আশ্চর্য পারদর্শিতা রয়েছে ভিখারীর। প্রথম দফায় টার্গেট লক্ষ্য করে যতগুলো তীর ছোঁড়া হলো, তার মধ্যে কেন্দ্রবিন্দুর সবচেয়ে কাছে লাগলো গিয়ে তার তীরটাই। শেষ দফার জন্যে সেরা তিনজনকে রেখে বাকি সবাইকে বিদায় করে দেয়া হলো। এবার অন্য ধরনের একটা লক্ষ্য ভেদ করতে হবে তীরন্দাজদের। বহুদূরে একটা উইলোর ডাল পুঁতে দেয়া হলো মাটিতে, তীর লাগাতে হবে এই ডালে। প্রথম দু'জনের তীর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, কিন্তু লাগলো না ডালে। এবার ভিখারীর পালা। কয়েকটা ঘাস ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিল সে উপর দিকে। বাতাসের গতি বুঝে নিয়ে সোজা দেখে একটা তীর বেছে বের করলো তূণ থেকে। মারলো। চড়াৎ করে দু'ভাগ হয়ে গেল উইলোর ডালটা–ঠিক মাঝখান দিয়ে চিরে বেরিয়ে গেছে তীর।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে পুরস্কার আনতে গেল ভিখারী। মুগ্ধ শেরিফ পুরস্কারের সাথে সাথে প্রচুর বাহবাও দিলেন তাকে। জানতে চাইলেন, 'কি নাম হে তোমার? বাড়ি কোথায়?'

হাঁটু বাঁকা করে সম্মান দেখালো ভিখারী শেরিফকে। মুখে বললো, 'হুজুর, আমার নাম রেনড গ্রীনলীফ, হোল্ডারনেসে জন্ম।'

'দারুণ তীরন্দাজ তুমি, রেনড গ্রীনলীফ। এত চমৎকার তীর ছুঁড়তে জীবনে দেখিনি আমি আর কাউকে!'

'দেখেছো, বাপ!' মনে মনে বললো ভিখারী। 'আমার ওস্তাদ রবিন হুডকে দেখেছো এর চেয়ে অনেক ভাল তীর ছুঁড়তে,' কিন্তু মুখে কিছুই বললো না সে। মৃদু হেসে আবার হাঁটু ভাঁজ করে সম্মান প্রদর্শন করলো।

খুশি হলেন শেরিফ। বললেন, 'এত বড় ধনুর্বিদ তুমি–ভিক্ষার ঝুলি কেন তোমার কাঁধে?'

'কি করবো, হুজুর। পঙ্গু মানুষকে কে দেবে চাকরি?'

'কেউ না দেয়, আমি দেব,' বললেন শেরিফ। 'করবে তুমি চাকরি? বছরে বিশ মার্ক করে পাবে। করবে?'

এক বাক্যে রাজি হয়ে গেল লিটল জন। যে খবরের জন্যে সে এসেছে, সেটা জানার এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর আসবে না। সেইদিনই যোগ দিল সে শেরিফের চাকরিতে।

খায়-দায়-ঘুমায়, কিছুদিন বেশ আরামেই কাটালো লিটল জন শেরিফের বাড়িতে, কোন কাজে হাত দেয় না। দেখে সহ্য হয় না শেরিফের গোমস্তার, প্রায়ই এটা-ওটা

কাজ চাপাবার চেষ্টা করে ওর ওপর। মিটিমিটি হাসে শুধু লিটল জন। বলে, 'আমি তীরন্দাজ, অন্য কাজ পারি না।'

একদিন ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল লিটল জনের। উঠেই শুনতে পেল শিকারে গেছেন শেরিফ শেরউড জঙ্গলে। মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠলো তার শেরউডে ফেরার জন্যে। স্থির করে ফেললো, আজই ফিরে যাবে সে আস্তানায়। এখানে আর করবার কিছুই নেই ওর। পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে শেরউড আক্রমণের কোন পরিকল্পনা নেই শেরিফের, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়ো, গুজব। রাতের পর রাত জেগেছে সে, কান পেতেছে এ-দরজায় ও-দরজায়, দিনের বেলায় ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে কথাবার্তা শুনেছে সবার–কিন্তু কারো কাছ থেকে আভাস পাওয়া যায়নি কোন গোপন চক্রান্তের। কাজেই আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না।

তৈরি হয়ে নিল লিটল জন। কিন্তু খালি পেটে রওনা হতে সায় দিল না মন। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলো বাবুর্চি নেই, বাইরে কোথাও গেছে, কিন্তু একটা শেলফে থরে

থরে সাজানো রয়েছে চমৎকার সব খাবার। শিকার থেকে ফিরে শেরিফ ও তাঁর দলবল খাবেন বলে তৈরি হয়েছে এসব। কালবিলম্ব না করে শুরু করে দিল লিটল জন, যা খুশি টপাটপ তুলছে আর পুরছে মুখে। গলাটা শুকিয়ে এলেই পিপে থেকে মদ ঢেলে গিলছে ঢকঢক। মনের সুখে খেয়ে চলেছে সে, এখান থেকে এক খাবলা তুলছে, ওখান থেকে আরেক খাবলা; পেট ভরে গেছে তবু থামতে পারছে না চারপাশে এত রকমের সুস্বাদু খাবার দেখে–এমনি সময়ে চড়াৎ করে বেতের বাড়ি পড়লো ওর পিঠে।

চমকে পিছন ফিরেই দেখতে পেল সে, দাঁড়িয়ে আছে বাবুর্চি, ঠক ঠক করে কাঁপছে রাগে। তার এত কষ্ট করে তৈরি করা খাবারের ডিশে ডাকাত পড়ায় এবং ডিশগুলোর তছনছ সর্বনাশ অবস্থা দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে বাবুর্চি, চড়াৎ করে আরেক বাড়ি কষিয়ে দিল লিটল জনের কাঁধে।

একহাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো লিটল জন লোকটাকে। 'যাও তো, বাপু! খাবার সময় বিরক্ত করে না।' আরেক গ্রাস তুললো সে মুখে। চিবাতে চিবাতে বললো, 'অত রাগ কিসের? খাবার জন্যেই তো বানিয়েছো এসব, তাই না?'

'তোর খাওয়ার জন্যে বানিয়েছি?' জোরে মাটিতে পা ঠুকলো বাবুর্চি। 'বেরো বলছি! নইলে খুন করে ফেলবো এক্ষুণি!'

'তাই নাকি?' হাসলো লিটল জন। 'তা একা তো আর সেটা সম্ভব নয়, পারলে জনা দশেক লোক ডেকে নিয়ে এসো।'

'কী? তোকে শায়েস্তা করতে লোক লাগবে আমার? আয় দেখি!' সড়াৎ করে একটানে কোমরে ঝুলানো খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ফেললো বাবুর্চি।

অগত্যা খাওয়া ফেলে নিজের তলোয়ারটা বের করতে বাধ্য হলো লিটল জন। শুরু হলো লড়াই। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো লিটল জন অসি-যুদ্ধের সমস্ত কৌশলই রপ্ত আছে বাবুর্চির। পুরো একটা ঘন্টা চললো লড়াই, ঘরময় দাপাদাপিতে জিনিসপত্র ছিটকে পড়লো এদিক-ওদিক, কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত এক হাত তুলে থামতে বললো লিটল জন প্রতিপক্ষকে।

'মাইরি বলছি,' বললো সে। 'দারুণ হাত তোমার তলোয়ারে! তেমনি দুর্দান্ত সাহস। এখানে এই হাঁড়ি-কুঁড়ি নাড়াচাড়া করে অন্যের পেট পূর্তির চিন্তায় কেন অপব্যয় করছো নিজেকে?'

'এছাড়া আর কি করার আছে?' জানতে চাইলো বাবুর্চি।

'এর চেয়ে অনেক আনন্দের, অনেক স্বাধীন আমাদের শেরউডের জীবন। তোমাকে এমন এক জীবনের সন্ধান দিতে পারি, এমন নেতার কাছে নিয়ে যেতে পারি, যার মহান হৃদয়ের স্পর্শে পরিপূর্ণ, সার্থক মনে করবে তুমি নিজেকে।'

'কে? কার কথা বলছো তুমি?'

সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো লিটল জন, 'রবিন হুড!'

নামটা শুনেই ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলো বাবুর্চি। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ লিটল জনের মুখের দিকে, তারপর তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিল খাপের মধ্যে। 'ঠিকই বলেছো, অযথা লড়ছি আমরা। আজ থেকে আমি তোমাদের একজন।'

'এসো তাহলে,' বললো লিটল জন। 'এগুলো ফেলে রেখে লাভ কি? তোমার সাথে লড়তে গিয়ে খিদে লেগে গেছে আবার। এসো, দু'জনে মিলে শেষ করে রওনা হয়ে যাই শেরউডের উদ্দেশে।'

বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করলো ওরা এবার ডিশগুলোকে। দশ মিনিটের মধ্যেই চেটে পুটে শেষ করে ফেললো সব। বিরাট এক ঢেকুর তুলে বললো বাবুর্চি, 'যাচ্ছিই যখন, খালি হাতে যাই কেন? রূপোর ডিনার সেট রয়েছে শেরিফের, কারুকাজ করা

রূপোর গ্লাস, পেয়ালা, জগ–আরো কত কি! গরীব লোকেদের জরিমানা করে সেই টাকায় কিনেছে শেরিফ এসব। ইচ্ছে করলেই সাথে করে নিয়ে যেতে পারি আমরা সব।'

মস্ত এক বস্তায় শেরিফের ঘরে রূপোর বাসন-কোসন যা ছিল সব ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা শেরউডের পথে। হাঁটতে হাঁটতে পৌছে গেল আস্তানায়।

লিটল জনকে দেখে ছুটে এলো রবিন হুড, দু'হাতে ওর দুই কাঁধ ধরে বললো, 'কোথায় ছিলে তুমি, লিটল জন? এদিকে তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে রয়েছি আমরা সেই থেকে! পিঠে এত বিরাট বোঝা কিসের? সাথের এই লোকটিই বা কে?'

'বলছি, সব বলছি,' হাসলো লিটল জন। একে একে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো সবিস্তারে। সব শুনে হেসে খুন হয়ে গেল দলের সবাই। কিন্তু রবিন গম্ভীর। সেটা লক্ষ্য করে জানতে চাইলো লিটল জন, 'কোথাও কোন ভুল করে ফেলেছি, ওস্তাদ?'

'করেছো,' বললো রবিন। 'তুমি ফিরে আসতে পেরেছো, সেজন্যে খুবই খুশি হয়েছি আমি। সাথে করে শেরিফের বাবুর্চিকে নিয়ে এসেছো, ভালই করেছো, শেরউডে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা তাকে। কিন্তু তুমি যে সাধারণ এক চোরের মত শেরিফের বাসন-পেয়ালা চুরি করে নিয়ে এসেছো, সেটা আমি কিছুতেই খুশি মনে মেনে নিতে পারছি না, লিটল জন। শেরিফকে যা শায়েস্তা করার আমি করেছি, তিনশো পাউণ্ড আদায় করে নিয়েছি ওর শয়তানীর শাস্তি হিসেবে। অপরাধ করেছিল, শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু নতুন করে এমন কিছুই তো সে করেনি যার জন্যে তার খাবারের থালা-বাসন চুরি করে নিয়ে আসতে হবে।'

রবিনের বকা খেয়ে খুবই খারাপ লাগলো লিটল জনের। হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটা হালকা করার জন্যে বলে উঠলো, 'চুরি? চুরি কাকে বলছো তুমি, ওস্তাদ? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, দাঁড়াও, এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসছি আমি শেরিফকে। সে যে ওগুলো দান করেছে আমাদের, সেই কথা ওর মুখ দিয়ে বের করে শোনাবো আমি তোমাকে।' বলেই একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল সে জঙ্গলের আড়ালে, কাউকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে।

পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করলো লিটল জন কয়েক মিনিটের মধ্যে। এক জায়গায় দলবল নিয়ে শিকাররত শেরিফকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর পাশে। মাথা থেকে টুপি খুলে এক হাঁটু ভাঁজ করলো সে। বললো, 'কি খবর, হুজুর? শিকার মিললো কিছু?'

'আরে! রেনড গ্রীনলীফ না? কোত্থেকে এলে তুমি? একটু আগেই একটা হরিণ মারার জন্যে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তোমার কথা ভাবছিলাম।'

'আমিও আপনার কথা ভাবতে ভাবতে চলে এসেছি, হুজুর,' বললো লিটল জন। 'পথে এমন এক দৃশ্য দেখলাম, যা বিশ্বাস করবে না কেউ!'

'কি দেখেছো?' জানতে চাইলেন শেরিফ।

'সাত কুড়ি হরিণের একবিশাল পাল!' চোখ বড় করে বললো লিটল জন, 'সবুজ হরিণ!'

'কী যা-তা বলছো!' চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল শেরিফের। 'পাগল হয়েছো তুমি?'

'নিজের চোখে দেখে এসেছি, হুজুর,' বললো লিটল জন। 'আমার সাথে এলে আমি এখনো দেখাতে পারি। কিন্তু আপনার একা যেতে হবে। সবাই এক সাথে গেলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে ওগুলো।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো লিটল জন, পিছন পিছন চললো সবাই ঘোড়ায় চেপে। সাড়ে চার মাইলের মত গিয়ে সবাইকে থেমে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করলো সে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো, 'এসে গেছি প্রায়। এবার এগোতে হবে পায়ে হেঁটে।'

সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন শেরিফ, পায়ে হেঁটে এগোলেন লিটল জনের সাথে। বেশ কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলার পর একটা বাঁক নিতেই দেখা গেল একটা বিশাল ওক গাছের ছায়ায় বসে রয়েছে রবিন তার দলবল নিয়ে। 'ওই দেখুন, হুজুর,' আঙুল তুলে দেখালো লিটল জন। 'ওই যে বিশ্রাম নিচ্ছে সাত-কুড়ি সবুজ হরিণ।'

ঝট্ করে ফিরলেন শেরিফ লিটল জনের দিকে। 'তোমাকে চেনা চেনা লেগেছিল আমার, এখন বুঝতে পারছি তুমি কে। প্রতারণা করেছো তুমি আমার সাথে। আসলে তুমি দস্যু লিটল জন!'

হো হো করে হেসে উঠলো লিটল জন। 'ঠিকই চিনেছেন, হুজুর, ঠিকই বুঝেছেন– তবে একটু দেরিতে। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই সবুজ হরিণের নেতার সাথে।'

ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছে রবিন হুড। 'আরে! আমাদের মাননীয় শেরিফ এসেছেন দেখতে পাচ্ছি! আজ আবার আরেকটা ভোজ খাবার জন্যে এসেছেন বুঝি?'

'না, না!' সভয়ে বললেন শেরিফ, 'আর কোন ভোজের দরকার নেই। খিদেই নেই আমার আজ।'

'তা বেশ তো, খিদে নেই, তেষ্টা তো থাকতে পারে,' বললো রবিন হাসতে হাসতে। 'এই, কে আছো ভাই, আমাদের প্রিয় শেরিফের জন্যে একপাত্র অক্টোবর এল নিয়ে এসো দেখি। তেষ্টায় শুকিয়ে গেছে মাননীয়ের গলা।'

রূপোর একটা পাত্র ভর্তি করে 'এল' নিয়ে এলো একজন, মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশ করে বাড়িয়ে ধরলো রূপোর তস্তরির ওপর রাখা পাত্রটা শেরিফের দিকে। হাত বাড়াতে পারলেন না শেরিফ, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলেন পাত্রটার দিকে। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তিনি, তাঁরই তস্তরির ওপর তাঁরই পাত্রে করে পরিবেশন করা হচ্ছে মদ।

'কি হলো, মাস্টার শেরিফ?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'আমাদের এই রূপালী পরিবেশন পছন্দ হচ্ছে না বুঝি আপনার? এক ব্যাগ ভর্তি বাসন-পেয়ালা পেয়েছি আজ আমরা।' এই বলে লিটল জন আর বাবুর্চির আনা বস্তাটা উঁচু করে তুলে ধরে দেখালো সে শেরিফকে।

তিক্ততায় ভরে গেল শেরিফের মনটা। একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না তিনি, মুখ নিচু করে চেয়ে রইলেন মাটির দিকে। কিছুক্ষণ তাঁর হাবভাব লক্ষ্য করলো রবিন হুড, তারপর বললো, 'শুনুন, মাননীয় শেরিফ, গতবার আপনি যখন শেরউডে এসেছিলেন তখন আপনার নিয়ত ছিল খারাপ, লোভে পড়ে ঠকাতে এসেছিলেন এক বড়লোকের নির্বোধ সন্তানকে; উল্টে ঠকে গিয়েছিলেন নিজেই। কিন্তু এবারের কথা ভিন্ন। কাউকে ঠকাতে বা কারো কোন ক্ষতি করতে আসেননি এবার আপনি। মোটা, লোভী, অর্থপিশাচ ধর্মযাজক কিংবা নিষ্ঠুর, ধনী, অত্যাচারী জমিদারের বাড়তি টাকা কেড়ে নিই আমি, বিলিয়ে দিই যাদের শুষে ওরা ওই টাকা উপার্জন করেছে তাদের মধ্যে। আপনার কোন প্রজা আছে বলে আমার জানা নেই, কারো ওপর অত্যাচার করেছেন বলেও কোন খবর আসেনি আমার কানে। কাজেই আপনার জিনিস আপনি ফেরত নিয়ে যান, ভুলে চলে এসেছিল ওগুলো আমাদের কাছে। থলি থেকে একটা পয়সাও বের করতে বলবো না আমরা আজ আপনাকে। চলুন, আপনার লোকজনের কাছাকাছি পৌছে দিয়ে আসি।'

ভারি বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো রবিন, পিছু পিছু চললেন হতভম্ব শেরিফ, বাকশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে তাঁর। শেরিফের লোকজনের থেকে একশো গজ দূরে এসে থামলো রবিন, বস্তাটা ধরিয়ে দিল শেরিফের হাতে, মুখে বললো, 'আজকের এই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত, মাননীয় শেরিফ।'

পিছন ফিরে দ্রুতপায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রবিন জঙ্গলের মধ্যে। তাজ্জব হয়ে বেশ

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন শেরিফ সেই দিকে চেয়ে। তারপর ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভারি বোঝাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পা বাড়ালেন সামনে।

মস্ত এক বোঝা নিয়ে শেরিফকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল তাঁর সাথের লোকজন। কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পেল না তারা। মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন শেরিফ। নীরবে ঘোড়ার পিঠে চাপালেন তিনি বস্তাটা, তারপর উঠে পড়লেন নিজেও–ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া। সবাই চললো তাঁর পিছন পিছন।

সোজা নটিংহামে ফিরে চললেন শেরিফ। এলোমেলো চিন্তার ঝড় চলেছে তাঁর মাথার ভিতর, কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন না তিনি, এক চিন্তা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে অপরটির গায়ে, গুলিয়ে যাচ্ছে সব। কেমন লোক এই রবিন হুড?

দশ

অ্যালান-এ-ডেল

লিটল জন ফিরে আসার বেশ কিছুদিন পরের কথা। শেরউডে ভোজের জন্যে অতিথি পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক-ওদিক লোক পাঠিয়ে যখন তেমন সুবিধে হচ্ছে না, শুকনো মুখে ফিরে আসছে সবাই, তখন একদিন রবিন ঠিক করলো নিজেই বেরোবে সে। শাঁসালো কোন মক্কেল সঙ্গে না নিয়ে ফিরবে না। সবাইকে বলে গেল, 'ভোজের আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখো, আমি ফিরলেই চড়িয়ে দেবে রান্না।'

আস্তানা থেকে অনেকদূর সরে এসে রাস্তার ধারের জঙ্গলে একটা জুতসই ঝোপ বেছে নিয়ে তার আড়ালে বসে রইলো সে। সেকেণ্ড গড়িয়ে মিনিট হচ্ছে, মিনিট গড়িয়ে ঘন্টা–কিন্তু ভাল কোন শিকারের দেখা আর মেলেই না। বিরক্ত হয়ে উঠলো সে মনে মনে। এক দুই করে ঘন্টার সংখ্যাও বেড়ে চললো। রাস্তা দিয়ে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু সবই খেটে-খাওয়া কৃষক বা শ্রমিক। একবার যদিও বা একটা ঘোড়াগাড়ির সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল, মহিলা যাত্রী দেখে এগোয়নি সে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তবু দেখা নেই কোন মক্কেলের। অনুচরদের টিটকারি কিভাবে সামাল দেবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো রবিন।

এমনি সময়ে অপূর্ব মিষ্টি একটা সুর কানে এলো ওর। গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে কে যেন। সাথে টুং টাং হার্পের তারে নিপুণ টোকার শব্দ। কে লোকটা? বড় আশ্চর্য গলা তো! ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বের করে রাস্তার দিকে চাইলো রবিন।

চমৎকার দেখতে এক যুবক, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালী চুল, মাথায় ছোট একটা টুপি, টুপির একপাশে গোঁজা রয়েছে মোরগের পালক, পরনে উজ্জ্বল লাল রঙের সুন্দর পোশাক; হাঁটছে, মৃদু আঙুল বুলাচ্ছে হার্পের তারে, সেইসাথে গাইছে অপূর্ব এক উচ্ছল প্রেমের গান। এত ভাল লাগলো গানটা যে রবিনের মনে হলো গোটা জঙ্গলটা কাঁপছে খুশির কাঁপনে। জাদু বুঝি একেই বলে! আনন্দের জোয়ার যেন এসে পৌছেছে শেরউড জঙ্গলে। বুকের ভিতরটা কাঁপছে রবিনের। কী অদ্ভুত গলা! কী আশ্চর্য গান!

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো রবিন, সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল ভ্রাম্যমাণ চারণ–যেন মধু বর্ষণ করে গেল। যতক্ষণ শোনা গেল, কান পেতে শুনলো রবিন; ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো যতক্ষণ না অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল গানটা অনেক দূরে। আহা, এত মিষ্টি গান জীবনে শোনেনি সে আর কোন দিন।

পুবদিকে চাইলো রবিন। দেখলো দূরের জঙ্গলে সন্ধ্যার ছায়া নামছে। নাহ, আজ আর কেউ যাবে না এই পথে। ফিরে চললো সে আস্তানার দিকে অপটু কণ্ঠে একটু আগে শোনা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে।

ওকে একা ফিরে আসতে দেখে কনুই দিয়ে পাশের জনকে ধাক্কা মারলো কেউ কেউ, দেখেও দেখলো না রবিন। সবিনয়ে জানতে চাইলো কেউ কেউ, ভোজের আয়োজন হয়েছে, রান্নাটা চড়িয়ে দেবে কিনা, শুনেও শুনলো না রবিন। মনটা আজ ভরে আছে খুশির গানে, গায়ে মাখলো না সে কারও কোন টিটকারি, চুপচাপ খেয়ে নিয়ে ঘুম দিল সেঁটে।

পরদিন সকাল দশটার দিকে বুড়ো ওকের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে রবিন, ওর একপাশে মাথার নিচে দু'হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে উইল স্কারলেট, আরেক পাশে বসে ছুরি দিয়ে চেঁছে ক্র্যাবট্রীর ডাল দিয়ে একটা লাঠি তৈরি করছে লিটল জন, ওদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে আছে আরো কয়েকজন–সবাই গল্প

শুনছে উইল স্কেদলকের মুখে। ইনিয়ে-বিনিয়ে চমৎকার গল্প বলে স্কেদলক, পুরানো কালের রাজা-বাদশা আর নাইটদের কত কাহিনী যে ওর মুখস্থ আছে, সে-হিসেব ওর নিজেরও জানা নেই। আজকের কাহিনী রাজা আর্থারের সময়কার এক ন্যায়নিষ্ঠ নাইট স্যার ক্যারোডকের বীরত্ব, ত্যাগ ও মহানুভবতা; একটি মেয়ের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম; এবং তাঁরা একে অপরের জন্যে কী অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেছেন তাই নিয়ে। গল্প শুনতে শুনতে মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে কয়েকজন, চোখে পানি এসে যাচ্ছে কারও কারও।

'মানুষের মনটাকে অনেক বড় করে দেয় এইসব গল্প,' কাহিনী শেষ হতে মন্তব্য করলো রবিন। 'এইসব মহান পুরুষদের আত্মত্যাগের কথা শুনলে মনে হয় আমরাও আমাদের ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে তাদের মতো মহৎ কিছু করি। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে অবশ্য অতটা বড় হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা করলে কিছুটা তো হওয়া যায়। চাঁদ ধরার জন্যে যে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে, চাঁদকে সে পায় না, তবে যে-লোক কাদা থেকে একটা পয়সা তোলার জন্যে ঝুঁকে রয়েছে নিচে, তার চেয়ে তো অনেক ওপরে উঠতে পারে।'

'তা ঠিক,' সাথে সাথে বললো বাস্তববাদী উইল স্টিউটলি। 'তবে একজন একটা পয়সা পাচ্ছে, অপরজন কাঁচকলা। পয়সা ছাড়া খালি-পেটে থাকতে হচ্ছে ভাববাদীকে। এসব গল্প শুনতেই ভাল, আমার মনে হয় এইসব মহান নায়কদের পদাংক অনুসরণ করতে যাওয়া নেহায়েতই বোকামি।'

'কী পদের মানুষ রে বাবা!' ভুরু কুঁচকে বললো রবিন। 'সব সময় আকাশ-ছোঁয়া ভাবনাগুলো ধরে টেনে এনে ধুলোয় নাক ঘষায়! যাই হোক, তোমার সঙ্গে এইসব চুলচেরা তর্কে পারবো না আমি; টেনে যখন বাস্তব দুনিয়ায় নামিয়েছো, তখন রওনা হয়ে যাও, বাছা, বাস্তব কাজে। সম্মানীয় অতিথি ছাড়া আর কদিন বাদেই আমাদের টাকা-পয়সার টান পড়বে। জনা ছয়েক লোক নিয়ে ফস্‌ ওয়ের দিকে রওনা হয়ে যাও, বা যেদিক খুশি যাও, সন্ধের সময় আজ আমার একজন অতিথি চাই-ই চাই।'

'বেশ তো, যাচ্ছি,' বললো উইল স্টিউটলি। গল্প-গুজব থেকে এইভাবে উঠিয়ে দেয়ায় ক্ষুণ্ন হয়েছে সে। মিষ্টি হেসে বললো, 'ছয় জনের মধ্যে মিজ দ্য মিলার আর আর্থার এ ব্ল্যাণ্ড–এই দুজনকে নেব ভাবছি, কারণ, তুমি তো ভাল করেই জানো, লাঠি-পেটা করায় ওদের জুড়ি নেই। ঠিক বলিনি, লিটল জন?'

রবিন আর লিটল জন ছাড়া বাকি সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। লিটল জনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রবিন বললো, 'ওদের একজনের কথা আমি বলতে পারি। দু'জন সম্পর্কেই ওয়াকিফহাল, এমন আমাদের মধ্যে শুধু একজনই আছেন…নাম বলতে চাই না।'

আবার একচোট হাসির হুল্লোড় উঠলো, তাতে যোগ দিল না একমাত্র লিটল জন। ভুরু কুঁচকে দূরের দিকে চেয়ে রয়েছে সে, যেন কতই চিন্তামগ্ন।

উইল স্টিউটলির বাছাই করা ছয়জন তৈরি হয়ে রওনা দেবে, ঠিক এমনি সময়ে দূর থেকে ভেসে এলো একটা গানের সুর। গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে কে যেন। চট করে গত কালকের সেই কোকিল-কণ্ঠি যুবকের কথা মনে পড়ে গেল রবিনের। কিন্তু সুরের এ কী আশ্চর্য পরিবর্তন! সেই যুবক, নাকি এ অন্য কোন গায়ক? গলাটা তো সেই ছেলেটিরই মনে হচ্ছে! আজ এত করুণ গান কেন ওর কণ্ঠে?

একটু পরেই দেখা গেল যুবকটিকে। সত্যিই, চেহারাতেও আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ধীর ক্লান্ত পায়ে হাঁটছে যুবক, মাথাটা নুয়ে আছে সামনে, চলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে কেউ যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ওর জীবন থেকে সব আনন্দ-উচ্ছ্বাস। ভাবাই যায় না, এই ছেলেটিই কাল গোটা জঙ্গলকে প্রাণতরঙ্গে নাচিয়ে দিয়ে, চারদিকে খুশির

বন্যা বইয়ে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল এই রাস্তা ধরে। আর আজ মনে হচ্ছে শেরউডের বিশাল ওকগুলোও যেন স্তব্ধ হয়ে শুনছে বিলাপ, গোটা জঙ্গল কাঁদছে যুবকের দুঃখে। অদ্ভুত করুণ সুরের মূর্ছনায় ডুকরে উঠছে যেন বিশ্ব চরাচর। চোখে পানি এসে গেল বিশাল দৈত্য লিটল জনের। মাথাটা এপাশ-ওপাশ নেড়ে বললো, 'আহা! এত দুঃখ কেন ছেলেটার?'

'অথচ গতকাল দেখেছি আমি একে, সম্পূর্ণ অন্য রকম,' বললো রবিন। 'কিছু একটা হয়েছে ওর। যাও তো, চট করে ডেকে নিয়ে এসো ওকে। কি হয়েছে শোনা দরকার।'

লিটল জন আর মাচ এগিয়ে গেল। দেখা গেল, বিষণ্নবদনে করুণ গান গাইছে বটে, কিন্তু মোটেও কাপুরুষ নয় যুবক, হেঁড়ে গলায় থেমে দাঁড়াবার নির্দেশ আসতেই ঝট্ করে ফিরলো সে লিটল জন আর মাচের দিকে। চট্ করে একটা তীর যোজনা করলো ধনুকে, প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষা করবে।

একটা হাত তুললো লিটল জন। 'কোন ভয় নেই, হে। তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। ওই দেখো, বসে রয়েছে আমার দলপতি, তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

খুবই আদর করে কাছে বসালো ওকে রবিন। অত্যন্ত ভদ্রভাবে বললো, 'বুঝতেই পারছো, আমরা ডাকাত। দিয়ে যাবার মত বাড়তি কিছু পয়সা-কড়ি আছে তোমার কাছে?'

'পাঁচ শিলিং আর এই আংটি ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কাছে।' পকেট থেকে যা ছিল সব বের করে দিল সে রবিনের হাতে।

'বিয়ের আংটি মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা নিচু করে ফেললো যুবক। 'সাত বছর ধরে সাথে সাথে রেখেছিলাম ওটা, ভেবেছিলাম কাজে লাগবে আজ। নাহ্! এখন আর আমার কাছে কোন দাম নেই ওটার, যার খুশি নিতে পারো।'

'দাম নেই কেন?'

'মেয়েটাকে কেড়ে নিয়েছে ওরা আমার কাছ থেকে।'

'তাই তো বলি, কাল যাকে দেখলাম খুশির বন্যা তুলে লাফিয়ে চলছে, আজ এই আশ্চর্য পরিবর্তন কেন তার! কি হয়েছে খুলে বলো দেখি?'

'কি? তুমি দেখেছিলে কাল আমাকে? ঠিকই বলেছো, কাল খুশি মনে চলেছিলাম আমি অপূর্ব মিষ্টি, দুনিয়ার সেরা সুন্দরী এক মেয়েকে বিয়ে করবো বলে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো যুবক। 'হলো না! চুরমার হয়ে গেছে কলজেটা। আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুড়ো এক ধনী নাইটের সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে তার।'

'হঠাৎ বুঝি মত পাল্টেছে মেয়েটা?'

'না, না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো যুবক। 'ও মত পাল্টাবে কেন? ও তো আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ওর আত্মীয়স্বজন ওকে বিয়ে দেবে না আমার সাথে। টাকা-পয়সা, জমি-জমা, বাড়ি-ঘর কিছুই তো নেই আমার। তাই আজ ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক বুড়ো নাইটের সাথে বিয়ে হচ্ছে ওর। চলে যাচ্ছি আমি।'

'কি নাম তোমার?' জানতে চাইলো রবিন।

'আমার নাম অ্যালান-এ-ডেল।'

'আরে! তোমার নাম তো আমি শুনেছি! তাহলে তুমিই সেই বিখ্যাত গায়ক, ফুলের সুবাসের মত যার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে! রদারস্ট্রীমের অ্যালান না তুমি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল যুবক। ওর কাঁধে হাত রাখলো রবিন। 'বয়স কত তোমার?'

'বিশ বছর।'

'মেয়েটিকে সত্যিই তুমি ভালবাসো?'

'নিজের প্রাণের চেয়েও।'

'সব কথা বলবে আমাদের? মনটা অনেক হালকা হয়ে যাবে তাহলে,' নরম গলায় বললো রবিন।

অবাক হয়ে চাইলো যুবক রবিনের মুখের দিকে। 'তোমাকে দস্যু মনে হচ্ছে না আমার। মনে হচ্ছে, তোমার মত ভাল মানুষ আর হয় না। ঠিক আছে, শোনো তাহলে...' গড় গড় করে বলে গেল অ্যালান, কিভাবে পরিচয় হলো ওর এলেনের সাথে, কিভাবে পরস্পরকে ভালবাসলো ওরা, কিভাবে মন জানাজানি হলো, গোপনে দেখা হলো, সৃষ্টি হলো কত মধুর স্মৃতির।

ভালবাসার এক অপূর্ব কাহিনী মন দিয়ে শুনলো ওরা চুপচাপ। শুনতে শুনতে গলার কাছে কি যেন ঠেকে গেছে বলে মনে হলো লিটল জনের। এত গভীর দুঃখের কথা এমন সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করে গেল যুবক যে চোখের পানি ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়লো উইল স্কারলেটের পক্ষেও। 'বাবা-মার অবাধ্য সে হবে না,' সবশেষে বললো অ্যালান-এ-ডেল, 'হয়তো বিয়ে সে করবে বুড়ো নাইটকে, কিন্তু আমি জানি, দাউ দাউ করে জ্বলবে ওর হৃদয়টা। আমার জন্যে ও...আমি–' আর কোন কথা বলতে পারলো না যুবক। বসে রইলো মাথা নিচু করে।

অনেকক্ষণ পর আবার ওর কাঁধে হাত রাখলো রবিন। 'আচ্ছা, অ্যালান-এ-ডেল, আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি, যেমন করে হোক ব্যবস্থা করতে পারি তোমাদের বিয়ের, তাহলে কি দেবে তুমি আমাকে?'

'টাকা নেই আমার যে দেব,' বললো অ্যালান। 'কিন্তু সত্যিই পারবে তুমি? পারলে বাকি জীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো আমি। তুমি যা বলবে তাই করবো।'

'কেনা গোলাম হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি বলি, তোমার গান আমার খুব ভাল লাগে, থাকবে তুমি আমাদের সাথে এই শেরউড জঙ্গলে?'

'এলেনকে পেলে আমি দুনিয়ার যে কোন জায়গাতেই থাকতে পারবো মনের আনন্দে।'

'বেশ। এবার বলো দেখি বিয়েটা কোথায় হতে যাচ্ছে?'

'এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরের একটা গির্জায়। এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে...'

'চিনতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাব আমি।' একটু চিন্তা করে হাত বাড়ালো রবিন অ্যালানের দিকে, 'তোমার হার্পটা ধার দিতে হবে আমাকে।'

সমস্ত অস্ত্র খুলে লিটল জনের হাতে দিল রবিন, হার্পটা হাতে তুলে নিয়ে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল তাকে। লিটল জনের কানে কানে কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেল গির্জার পথ ধরে, একা।

গির্জার কাছাকাছি এসে টুং টাং মিষ্টি আওয়াজ তুললো রবিন হার্পে। শব্দ শুনে দরজায় এসে দাঁড়ালেন দামী পোশাক পরা একজন বিশপ। বললেন, 'ও, তুমি! আমি ভেবেছিলাম বিয়ে-পার্টির লোকজন এসে গেছে বুঝি। তা, কি করছো তুমি এখানে? কে তুমি?'

মাথা থেকে টুপিটা খুলে লম্বা করে কুর্নিশ করলো রবিন বিশপকে। বললো, 'আমি একজন ভবঘুরে হার্প-বাদক, হুজুর। লোকে বলে, আমার চেয়ে ভাল বাদক নাকি এদিকের গোটা অঞ্চলে আর নেই। শুনলাম আপনার এক বাল্যবন্ধুর বিয়ে পড়াবেন আজ আপনি। এই খুশির দিনে বাজনা শুনিয়ে যদি দু'চারটে পয়সা...'

'বেশ তো,' খুশি হলেন বিশপ। 'ভিতরে এসো। বাজাও দেখি, শোনা যাক তোমার বাজনা।'

‘এখন বাজানো কি ঠিক হবে?’ বললো রবিন। ‘গুরুজনরা বলেন, বর-কনে এসে পৌঁছবার আগে বাজনা বাজালে অমঙ্গল হয়। হুজুর যদি বলেন, আমি শুরু করতে পারি এক্ষুণি, কিন্তু আমাদের ওদিকে একটা কথা আছে…’

‘থাক, থাক। অমঙ্গল হলে এক্ষুণি শুরু করার দরকার নেই। তবে চট্ করে তৈরি হয়ে নাও, ওদের আসার দেরিও নেই বিশেষ।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছলো বুড়ো বর, তার পিছনে পরমা সুন্দরী এক তরুণী।

বিয়ের অনুষ্ঠান দেখবার জন্যে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল গির্জায়, বর-কনেকে ঢুকতে দেখে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলো তারা। এত বুড়ো একটা লোকের সঙ্গে অমন ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা এক মেয়ের বিয়ে হতে যাচ্ছে দেখে অসমর্থনের একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মধ্যে। কারণ, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নাইটটি কেবল থুত্থুড়ে বুড়োই নয়, বাম কাঁধে তার মস্ত এক কুঁজ, তার ওপর একটা চোখ আবার কানা। অথচ নিষ্পাপ তাজা গোলাপের মত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে।

কিন্তু জোব্বা পরা ধর্মযাজক আর ধনী নাইটের পোশাকের জাঁকজমক দেখে কেউ জোরে কিছু বলতে সাহস পেল না। সবার মনের কথা বেরিয়ে এলো রবিনের বিস্মিত উচ্চকণ্ঠ থেকে।

‘আশ্চর্য!’ বলে উঠলো সে। ‘অনেক অনেক বিয়ে দেখেছি, বাবা; কিন্তু এমন বেমানান জোড়া তো আর দেখিনি!’

‘চুপ করো!’ ধমকে উঠলেন বিশপ। ‘বর-কনে হাজির হয়ে গেছে, এক্ষুণি শুরু হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।’

‘তা হোক,’ বললো রবিন, ‘কিন্তু এই বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাধ্য হয়ে এই বিদঘুটে বিয়েতে রাজি হয়েছে কনে। তাকে নিজের পছন্দ মত বর বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।’

‘আবার বক বক করে!’ রেগে উঠলেন বিশপ। ‘বকশিশ যদি পেতে হয়, বক বক বন্ধ করে বাজনা শুরু করো। এক্ষুণি বেদির দিকে পা বাড়াবে কনে।’

‘বাজনা?’ হেসে উঠলো রবিন হুড। ‘ঠিকই বলেছেন, হুজুর, এখন বাজনা বাজানোই উচিত। তবে, সত্যি বলতে কি, হার্পের চেয়ে শিঙাটাই আমি বেশি ভাল বাজাতে পারি।’ এই বলে কাপড়ের নিচ থেকে বিউগলটা বের করে মুখে তুললো সে।

তীক্ষ্ণ তিনটে আওয়াজ বেরোলো শিঙা থেকে। পরমুহূর্তে কোত্থেকে দৌড়ে এসে হুড়মুড় করে গির্জায় ঢুকলো চব্বিশ জন সশস্ত্র তীরন্দাজ। তাদের পুরোভাগে অ্যালান-এ-ডেল।

মহা হৈ-হট্টগোল বেধে গেল গির্জার ভিতর। রাগে নীল হয়ে গেছেন বিশপ। রাগে কাঁপছে বুড়ো নাইটও। কারণ, অ্যালান-এ-ডেলকে দেখামাত্র ছুটে গিয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কনে। এগোতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে নাইট, অ্যালানের দলবলের চেহারা-সুরত দেখে সাহস হলো না কিছু করতে। গোটা গির্জার উপস্থিত সবাই এবার ফিরলো রহস্যময় হার্প-বাদকের দিকে–যার শিঙাধ্বনি ডেকে এনেছে অবস্থার এই আশ্চর্য পরিবর্তন।

একটা হাত মাথার উপরে তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল রবিন। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল শোরগোল। সবাই শুনতে চায় কি বলার আছে ওই রহস্যময় যুবকটির।

‘অ্যালান-এ-ডেল,’ উঁচু গলায় জানতে চাইলো রবিন, ‘তুমি এলেনকে ভালবাসো?’

‘সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসি,’ জবাব দিল অ্যালান, ‘চিরকাল বাসবো।’

‘বেশ,’ বললো রবিন, ‘এবার এলেনের বক্তব্য শোনা যাক। এলেন, তুমি অ্যালান-এ-ডেলকে ভালবাসো?’

'বাসি!' ছোট্ট করে জবাব দিল এলেন।

'তোমরা পরস্পরকে বিয়ে করতে রাজি আছো?' আবার জানতে চাইলো রবিন।

'আছি,' সমস্বরে বললো দু'জন।

'বেশ। এবার আমার দু'টো কথা শুনুন, উপস্থিত দর্শক ও সুধিবৃন্দ!' গলার স্বর আরও একটু চড়িয়ে দিল রবিন। 'আমরা সবাই জানতে পারলাম, এই দুটি তরুণ-তরুণী পরস্পরকে ভালবাসে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে মেয়েটিকে বিয়ে দেয়া হচ্ছে এক ধনকুবের, কুৎসিত, বৃদ্ধ নাইটের সাথে। আমি মনে করি, টাকার জোরে নিষ্পাপ এক প্রেমকে পায়ের তলায় পিষে মারার, দু'টি তরুণ জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার মত এমন নির্মমতা, এত বড় নিষ্ঠুর অধর্ম আর হয় না। আমি প্রস্তাব করছিঃ বুড়ো পাত্রকে বাদ দিয়ে আজই অ্যালানের সাথে এলেনের বিয়েটা সর্বসমক্ষে সুসম্পন্ন হয়ে যাক।' বিশপের দিকে ফিরলো সে, 'নিন, শুরু করুন।'

'কে রে ব্যাটা তুই!' রেগেমেগে হুঙ্কার ছাড়লেন বিশপ, 'বাজনা বাদকের ছদ্মবেশে গির্জায় ঢুকে এখন রাজার মত হুকুম করা হচ্ছে!'

'ঠিকই বলেছেন, বিশপ,' শান্ত গলায় বললো রবিন। 'সাত-কুড়ি দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী যুবক আমাকে রাজার সম্মান দিয়ে থাকে। আমি রবিন হুড।'

রবিন হুড! নামটা শুনে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল গির্জার সবাই। দু'চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে সবাই লোকের মুখে মুখে বিখ্যাত হয়ে ওঠা স্বনামধন্য দুর্দান্ত যুবকটিকে। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল নাইটের, ঠক ঠক করে কাঁপতে লেগেছেন বিশপও।

'এইবার, বিশপ,' মৃদু হেসে বললো রবিন, 'বিয়েটা পড়িয়ে দিন।'

'না,' দুই হাঁটু ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে বিশপের, কিন্তু মুখে একটা একগুঁয়ে ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন তিনি।

'কেন নয়, জানতে পারি?'

'এ দেশের আইন অনুযায়ী তিনবার জানতে হবে এ বিয়েতে কারও কোন আপত্তি আছে কিনা,' বললেন বিশপ। 'তা নইলে সিদ্ধ হবে না বিয়ে।'

'বেশ তো, চট্ করে জিজ্ঞেস করে ফেলুন তিনবার।'

'না। পবিত্র গির্জার মধ্যে তুমি জোর করে ঢুকে গায়ের জোরে যা খুশি তাই...'

'পবিত্র গির্জার মধ্যে যা খুশি তাই অধর্মের কাজ করার অধিকার আপনিই বা কোথায় পেয়েছেন, বিশপ?' রেগে গেল এবার রবিন। 'শুনুন, গায়ে আমার অনেক জোর আছে, কিন্তু সেটা আপনার মত দুর্বলের ওপর প্রয়োগ করতে চাই না। খুবই ছোট মনের মানুষ আপনি, লোকে মানছে আপনাকে শুধু ওই পোশাকটার জন্যে। আপনি রাজি না হলে টেনে খুলে নেয়া হবে আপনার ওই পোশাক, আমার লোক সেটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে যা করার করবে।'

দ্বিধায় পড়ে গেছেন বিশপ। তাই দেখে মৃদু হাসলো রবিন। বুঝলো, আর একটু ভয় না দেখালে কাজ হবে না। চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল সে। সাথে সাথে দু'জন এগিয়ে এসে খুলে ফেললো বিশপের জোব্বা। উঁচু গলায় হাঁক ছাড়লো রবিন, 'লিটল জন, এদিকে এসো। এই কাপড় পরে বিশপ হয়ে যাও দেখি!'

একগাল হেসে আলখেল্লাটা গায়ে চড়ালো লিটল জন। ওকে ওই পোশাকে এমন বিদঘুটে লাগলো দেখতে যে গোটা গির্জার সবাই হাসতে শুরু করলো। কিন্তু লিটল জন গম্ভীর। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছে সে কাজটা। বিশপের জায়গায় বিশপের পোশাকে বিশপের গাম্ভীর্য নিয়ে কাজ শুরু করলো সে। হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাচ্ছে সবাই, সেদিকে খেয়াল নেই, তিনবার যদি যথেষ্ট না হয়, সেই ভয়ে সাতবারের আগে থামলো না সে, তাও থামতো না, রবিন যদি হাঁক ছেড়ে থামতে না বলতো।

এইবার বিশপের দিকে ফিরলো রবিন হুড। 'বিয়েটা ভালোয় ভলোয় পড়িয়ে

দেবেন,' জানতে চাইলো সে, 'না, বন্দী হয়ে শেরউডে যাবেন আমাদের সাথে? চটপট ভেবে বলুন, কোনটা করবেন।'

শেরউডে ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে পিলে চমকে গেল বিশপের। শিউরে উঠলেন তিনি। চট্ করে রাজি হয়ে গেলেন বিয়ে পড়াতে। আলখেল্লা খুলে দিল লিটল জন। শুরু হলো অনুষ্ঠান।

কনে সম্প্রদানের প্রশ্ন উঠতেই এগিয়ে এলো রবিন হুড।

'আমি সম্প্রদান করছি এলেনকে অ্যালান-এ-ডেলের হাতে। তোমরা সুখী হও, এই আমার কামনা। যদি কেউ তোমাদের সুখের পথে কাঁটা হয়, কেউ কোনো গোলমাল করতে চায়, আগে বোঝাপড়া করতে হবে তাকে আমার সাথে।'

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে শেষ হলো বিয়ের অনুষ্ঠান। যেমন এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল দস্যুদল গির্জা থেকে–তাদের সাথে শেরউডের পথে পা বাড়ালো নব-দম্পতি।

চলতে চলতে এক সময় রবিনের পাশে চলে এলো অ্যালান-এ-ডেল, ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো করে চুমো খেলো তাতে। কৃতজ্ঞ, মৃদুকণ্ঠে বললো, 'ধন্যবাদ!'

এগারো

সন্ন্যাসী টাক

অ্যালান-এ-ডেলের বিয়ের বেশ কিছুদিন পরের কথা। একদিন ঘুম থেকে উঠে দিনটা এত চমৎকার লাগলো রবিনের কাছে যে সবাইকে ডেকে ঘোষণা করে দিল, 'আজ কারও কোন কাজ নেই, ছুটি!'

ঝলমলে রোদ উঠেছে পরিষ্কার নীল আকাশে, অনেক বেশি সবুজ মনে হচ্ছে জঙ্গলটা, মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে বিশাল সব ওকের প্রকাণ্ড শাখাগুলো, নিচে সবুজ ঘাসের উপর চলেছে ঝিলিমিলি আলোছায়ার খেলা–বাচ্চা ছেলের মত নেচে উঠলো সবার মন।

খেলাধুলায় মেতে উঠলো সবাই। কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ লাফাচ্ছে; কেউ মেতে গেছে কুস্তিতে, কেউ লাঠি খেলায়; কেউ নাচছে, কেউ গাইছে–যার যা খুশি। কয়েকটা দল তীর-ধনুক নিয়ে বেরোলো হরিণ শিকারে। এই রকম একটা দলের সাথে বেরিয়ে পড়লো রবিনও। লিটল জন, মাচ আর উইল স্কারলেট রয়েছে এই দলে। হঠাৎ পাঁচশো ফুট দূরে একটা সবুজ মাঠে চরতে দেখা গেল একদল হরিণকে। ইচ্ছে করলেই আরো বেশ অনেকটা কাছে যাওয়া যায় হরিণগুলোর, কিন্তু কি মনে করে চ্যালেঞ্জ করে বসলো রবিন, 'দেখি এতদূর থেকে এক তীরে হরিণ ফেলতে কে পারে।'

বলতে না বলতেই একসাথে তীর ছুঁড়লো তিনজন। একটা বাচ্চা হরিণ পড়লো উইল স্কারলেটের তীরে, মাচের তীরে পড়লো বড়সড় একটা হরিণী, কিন্তু লিটল জনের তীরে ঘায়েল হলো পৌনে দুশো গজ দূরের এক মস্ত শিংওয়ালা তাগড়া হরিণ।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো রবিন লিটল জনের কৃতিত্বে। 'বাহ! দারুণ দেখিয়েছো, লিটল জন! তোমার জুড়ি নেই। যদি খবর পেতাম, একশো মাইল দূরে রয়েছে তোমার সমান এক তীরন্দাজ, আমি হেঁটে গিয়ে ডেকে আনতাম তাকে।'

কথাটা শুনে হেসে উঠলো উইল স্কারলেট।

'হাসছো যে?' জানতে চাইলো রবিন।

'এক মজার লোকের কথা মনে পড়লো, তাই। লিটল জনের জুড়ি খুঁজতে একশো

মাইল যাওয়ার দরকার নেই, মামা; তার চেয়ে অনেক কাছেই রয়েছে একজন।'

'তাই নাকি? কোথায়? কে সে?'

'ফাউন্টেন্‌স অ্যাবিতে থাকে এক মস্ত মোটা সন্ন্যাসী, নাম—সন্ন্যাসী টাক,' বললো উইল স্কারলেট। 'ধনুক প্রতিযোগিতায় লিটল-জনকে হারাতে তো পারবেই, বলা যায় না, হয়তো তোমাকেও হারিয়ে দেবে।'

'কথাটা জেনে বলছো, না শুনে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

হাসছে উইল স্কারলেট। বললো, 'জেনে। ইচ্ছে করলে তুমি নিজেও জেনে নিতে পারো। তবে, একটু উদ্ভট ধরনের লোক, তুমি ডাকলেই সুড়সুড় করে চলে না-ও আসতে পারে।'

কথাটা শুনেই মনস্থির করে ফেললো রবিন হুড—যেমন করে হোক, এই লোককে ভিড়াতে হবে নিজের দলে। কিছুদিন থেকে মনে মনে একটা অভাব অনুভব করছিল সে, উইল স্কারলেটের কথায় হঠাৎ পরিষ্কার বুঝতে পারলো অভাবটা ঠিক কিসের। ওদের আস্তানায় উপাসনার কোন ব্যবস্থা নেই। ধরা পড়ার ভয়ে শহরের গির্জাতেও যেতে পারে না ওরা। এই রকম চলতে থাকলে ক্রমে অধর্ম ঢুকবে ওদের মধ্যে। নিজেদের একজন পুরোহিত থাকলে এই সেদিন অ্যালান-এ-ডেলের বিয়েতে এত হাঙ্গামা করার কোন দরকারই পড়তো না। সত্যিই একজন পুরোহিত দরকার ওদের, আর সে-লোক যদি লড়ুয়ে মেজাজের হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। যেমন করে হোক সন্ন্যাসী

টাককে তার চাই।

তৈরি হয়ে নিল রবিন। আর দেরি না করে আজই খুঁজে বের করবে সে মোটা সন্ন্যাসীকে। ইস্পাতের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রওনা হয়ে গেল সে ফাউন্টেনস অ্যাবির উদ্দেশে, কয়েকজন অনুচরকে সাথে নিল। উইল স্টিউটলির হাতে দিয়ে গেল ওর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের ভার।

হাঁটতে শুরু করলো ওরা জংলা পথ ধরে। মাঝে মাঝে ছোট ঝর্ণা পড়ছে পথে, হঠাৎ দেখা হয়ে যাচ্ছে একদল হরিণের সাথে, ভয় পেয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে তারা শুকনো পাতা মাড়িয়ে; কখনো ঘন হয়ে আসছে জঙ্গল, আবার কখনো হালকা। হাসি, গল্প আর গানে মশগুল হয়ে চলেছে ওরা, কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে খেয়াল নেই।

বিকেলের দিকে শান্ত একটা রূপালী নদীর ধারে এসে পৌঁছলো ওরা। তীর ঘেঁষে সরু একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে গুণ-টানা ঘোড়ার পায়ের চাপে। সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে মস্ত সব মালবাহী নৌকো টেনে নিয়ে যায় ওরা শহরের বাজারে। কিন্তু এখন গোটা এলাকা নির্জন, নিশ্চুপ। হাঁটছে ওরা, দু'চোখ ভরে দেখছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে পানিতে, ফড়িংগুলো স্থির হয়ে বাতাসে ভেসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তীর বেগে ছুটছে যেদিক খুশি, ঝুপ করে পানিতে পড়ছে মাছরাঙা—পরমুহূর্তে ছোট্ট একটা মাছ ঠোঁটের ফাঁকে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসছে কোনও ডালে।

ফাউন্টেনস অ্যাবির কাছাকাছি পৌঁছে সঙ্গীদের অপেক্ষা করতে বলে একা এগিয়ে চললো রবিন হুড। কিন্তু প্রথম বাঁকটা নিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। কথা বলছে যেন কারা। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো রবিন। কাছেই কোথাও সরস কথোপকথন হচ্ছে দু'জনের মধ্যে, কিন্তু অবাক হয়ে গেল সে দু'জনের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য মিল দেখে। আওয়াজটা আসছে নদীর তীরের কয়েকটা ছোট-ছোট ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে।

'আশ্চর্য! ব্যাপারটা কি একটু দেখতে হয়!' মনে মনে ভাবলো রবিন, তারপর পা টিপে নদীর খাড়া পাড়ের কাছে এসে শুয়ে পড়লো ঘাসের উপর; একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল নিচের দিকে।

মস্ত এক ওয়াটার-উইলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে নদীর দিকে কিছুটা ঝুঁকে, চমৎকার ছায়া পড়েছে তার নিচে। সেই ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর বসে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রয়েছে বিশাল মোটা বেঁটে-খাটো এক লোক। দ্বিতীয় লোকটিকে দেখা গেল না কোথাও। মোটা লোকটার মাথাটাও প্রকাণ্ড, এবং ঠিক একটা ফুটবলের মত গোল। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত কপালের উপর আর ঘাড়ের পিছনটায় কোঁকড়া কালো চুল, কিন্তু চাঁদিটা হাতের তালুর মত পরিষ্কার। মুখ ভর্তি কালো কোঁকড়া দাড়ি। বিশাল মোটা ঘাড়টা রয়েছে তেমনি বিশাল এক কাঁধের উপর। ঢোলা পোশাক, খুলে রাখা মঠবাসীর টুপি, জপমালা আর মাথার টাকটা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে লোকটা একজন সন্ন্যাসী, এ ছাড়া চেহারা-সুরতের আর কোথাও ধর্মীয় কিছুর ছাপ নেই—যে-কেউ দেখলে এক কথায় বলবে ভয়ঙ্কর এক ডাকাত। ঘন কালো একজোড়া ভ্রূর নিচে ক্ষুদে একজোড়া চঞ্চল চোখ, দেখে মনে হয় প্রতিমুহূর্তে মজার কিছু ঝিলিক দিচ্ছে ওর মাথার ভেতর। ইস্পাতের শিরস্ত্রাণটা পাশে খুলে রেখে পা ছড়িয়ে বসে আছে লোকটা, দুই হাঁটুর ওপর রাখা মস্ত এক পাত্র থেকে বাম হাতে বড় বড় মাংসের টুকরো তুলছে আর টপাটপ মুখে পুরছে, ডান হাতে ধরা পাঁউরুটিতে মাঝে মাঝে একটা করে কামড় বসাতে ভুলছে না। খানিক পর পর বড়সড় একটা মদের বোতল মুখে তুলে ভিজিয়ে নিচ্ছে গলাটা।

'সর্বনাশ!' মনে মনে বললো রবিন। 'এ যে আস্ত এক রাক্ষস দেখছি! আর কি তৃপ্তির সঙ্গেই না খাচ্ছে! যতদূর মনে হয় আর কেউ নেই, এই লোকই কথা বলছিল

নিজের সাথে নিজে। একে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যাবে কোন্ দিকে থাকে সন্ন্যাসী টাক।'

চুপচাপ শুয়ে লক্ষ রাখলো রবিন সন্ন্যাসীর ওপর, আর আপন মনে হাপুস-হুপুস খেয়ে চললো সন্ন্যাসী। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে কথা বলে উঠলো সন্ন্যাসী। 'ছি ছি, তুমি দেখছি মোটেই খাচ্ছো না! এভাবে কদিন শরীর টিকবে বলো? কদিন বাঁচবে? দাও দেখি, রুটিটা এবার আমার হাতে দাও, তুমি বরং খানিক মাংস মুখে তোল।' বলেই ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল সে রুটিটা, মুক্ত ডান হাত চালালো মাংসের পাত্রে। মুখে বললো, 'ধন্যবাদ, বন্ধু, দু'জনের রুটি একা খেতে পারছিলাম না, এবার খানিক মাংস খেয়ে স্বাদ পাল্টানো যাক।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল রবিনের চোখ। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে। বেশি খাওয়া ভাল না, তাই নিজেকে দুই ভাগ করে নিয়েছে সাধুটা; সাধাসাধি করে একে অন্যকে খাওয়াচ্ছে পুরো একজনের খাবার। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই নরম লতাপাতায় হাত মুছে মদের বোতলটা তুলে নিল সে একহাতে।

'দেখো, যুবক,' বলছে সন্ন্যাসী নিজেকে, 'তোমার মত চমৎকার মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। যেমন সুন্দর তুমি দেখতে, তেমনি সুন্দর তোমার মন। তোমাকে ভালবাসি আমি, বিশ্বাস করো, দুনিয়ার কোন প্রেমিক তার প্রিয়াকে এতটা ভালবাসতে পারবে না।...এই নির্জনে এসব কথা বলে কেন মিছেমিছি লজ্জায় ফেলছো, ভাই! তবে, কেউ যখন কাছেপিঠে নেই, আমার মনের কথাটাও জানিয়ে দিই এই ফাঁকে ঃ আমিও তোমাকে ভালবাসি, ঠিক তুমি যতটা ভালবাসো ততটাই।...তা বেশ তো, এই কথার ওপর দু'ঢোক পান করা যাক। কি বলো? না, না, কোনো কথা শুনছি না, আগে তুমি। তোমার পর খাবো আমি।' এই বলে ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল সে বোতলটা। '...ঠিক আছে, তুমি যখন ছাড়বেই না, কি আর করা! তোমার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।' বড় করে দু'ঢোক খেয়ে বোতলটা প্রায় অর্ধেক করে ফেললো সাধু, তারপর বললো, 'এবার ভাই, তুমি।' আবার ডান হাতে চলে এলো বোতলটা। '...আমিও মন-প্রাণ দিয়ে তোমার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' এই বলে বোতলের বাকি মদটুকু দুই ঢোকে শেষ করে বোতলটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো মোটা সন্ন্যাসী।

নিঃশব্দে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল রবিন হুডের। এক হাতে চেপে ধরে রেখেছে নিজের মুখ, পাছে শব্দ বেরিয়ে সচকিত করে দেয় লোকটাকে। উপুড় হয়ে শুয়ে ভূমিকম্পের মত কাঁপছে ওর সর্বশরীর।

আবার শুরু করলো সন্ন্যাসী, 'খাওয়া-দাওয়া তো হলো, এবার একটা গান শুনতে পেলে বেশ হতো। গাও না, ভাই, একটা গান?...আরে, না। গান জানি না আমি। তাছাড়া গলাটা আজ ভাল নেই। দেখছো না কেমন কোলা ব্যাঙের মত আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে?...কে বলেছে ব্যাঙের আওয়াজ? আমার কাছে তো মনে হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির মিষ্টি সুর। গাও, ভাই, শোনাও একটা গান। তোমার ওই গলার গান শুনলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারাটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবো আমি। প্লীজ, ধরো একটা গান।...তোমার নিজের এমন চমৎকার গলা, তোমার সামনে গাইতে কিন্তু সত্যিই লজ্জা করছে আমার, ভাই। ঠিক আছে, ধরেছো যখন, শোনাচ্ছি। কিন্তু তার চেয়ে ভাল হয়, যদি দুজনে একসাথে গাই।...বেশ তো, তুমি পুরুষের অংশটা গাও, আমি মেয়েদের অংশটা ধরবো।...হ্যাঁ, সেই ভাল।' এই বলে প্রথমে মোটা হেঁড়ে গলায় এক লাইন গাইলো, তারপর গলাটাকে যতটা সম্ভব চিকন করে উঁচু পর্দায় নিজেই ধরলো দ্বিতীয় লাইন।

নিজেকে আর সামলাতে পারলো না রবিন, হো হো করে হেসে উঠে পাড় বেয়ে

নেমে এলো নিচে। কিন্তু কোনো দিকে খেয়াল নেই সন্ন্যাসীর, দুই চোখ বুজে গরুর মত চেঁচাচ্ছে সে–অর্থাৎ গান গাইছে। পুরো গানটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ খুললো না। চোখ খুলেই রবিনকে হাসতে দেখে ঘন কালো ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো সন্ন্যাসীর। চট্ করে শিরস্ত্রাণটা মাথায় পরে নিয়ে গর্জে উঠলো সে, 'অত হাসির কি হয়েছে শুনি?'

'হাসি আসছে আপনার দুরবস্থার কথা ভেবে,' বললো রবিন।

'দুরবস্থা?'

'সে কথায় পরে আসছি, আগে বলুন দেখি, হোলি ফাদার, এদিকের এলাকাটা ভালমত চেনা আছে আপনার?'

'আছে, মোটামুটি। কেন?'

'ফাউন্টেনস অ্যাবি বলে একটা জায়গা কি চেনা আছে আপনার?'

'আছে, মোটামুটি। কেন?'

'ওই ফাউন্টেনস অ্যাবির সন্ন্যাসী টাককে খুঁজছি আমি। তার সাথে পরিচয় আছে আপনার?'

'আছে, মোটামুটি। কেন?'

'বলতে পারবেন, তাঁকে কোথায় পাবো? নদীর এপারে, না অপর পারে?'

'তোমার হয়তো জানা নেই, বৎস, অপর পার ছাড়া নদীর আর কোন পার হয় না।'

'তাই নাকি?' অবাক হলো রবিন, 'প্রমাণ করতে পারবেন?'

'পানির মত,' হাসলো সন্ন্যাসী। আঙুল তুলে অপর পারটা দেখালো। 'ওই দিকটা যে অপর পার, মানো?'

'নিশ্চয়ই।'

'অথচ ওই দিকটা হচ্ছে নদীর এক পার। কি, ঠিক বলেছি?'

'একেবারে ঠিক।'

'কিন্তু ওটা যদি এক পার হয়, এদিকটা অপর পার। অথচ আগেই মেনে নিয়েছো যে ওই দিকটা অপর পার। অতএব, নদীর দুই পারই অপর পার। ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়, হুঁহ্।'

'চমৎকার!' বললো রবিন। 'কিন্তু, ফাদার, আপনার এই যুক্তিতর্কে আমার কোন লাভ হচ্ছে না। আমি যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়েছি। ঠিক আছে, প্রশ্নটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে করছি। সন্ন্যাসী টাককে কি আমরা যে-পারে দাঁড়িয়ে আছি সেই পারে পাবো, না এই মুহূর্তে আমরা যে-পারে দাঁড়িয়ে নেই সেই পারে?'

'এইবার বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছো। কথার কারসাজি দিয়ে তোমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তাকে এই মুহূর্তে কোন্ পারে পাবে তা বলতে পারবো না, তবে এটুকু বলতে পারি, তার মঠে যেতে হলে তোমাকে নদীটা পেরোতে হবে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' বললো রবিন।

'এবার বলো, হাসছিলে কেন?'

'হাসছিলাম আপনার দুরবস্থার কথা ভেবে। এত চমৎকার পানাহার আর গান বাজনার পর কাপড় ভিজিয়ে নদী পেরোতে কি আপনার ভাল লাগবে?'

'বুঝলাম না।'

'দেখতেই পাচ্ছেন, হোলি ফাদার, কি সুন্দর জামা-কাপড় পরে আছি আমি,' বললো রবিন হুড। 'এই কাপড় ভিজিয়ে নদী পেরোনো কি উচিত হবে? তাই আমি ঠিক করেছি, আপনার কাঁধে চড়ে পার হবো নদীটা।'

'কী! এত বড় সাহস!' কথা শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে গেল সন্ন্যাসীর। 'এত বড় স্পর্ধা তোমার! আমাকে বলে কিনা···কি মনে করেছো তুমি নিজেকে? দাঁড়াও তোমাকে আমি, তোমাকে আমি···'

সড়াৎ করে তলোয়ারটা বের করলো রবিন খাপ থেকে। মুহূর্তে বোবা হয়ে গেল মোটা সন্ন্যাসী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো রবিনকে। তারপর নিরুপায় অবস্থা বোঝাতে নাক-চোখ-মুখ কুঁচকে এমন বিদঘুটে ভঙ্গি করলো যে হাসি চেপে রাখা দায় হলো রবিনের পক্ষে।

বিনা বাক্যব্যয়ে নিচু হয়ে বসলো সন্ন্যাসী, খুশি মনে খোলা তলোয়ার হাতে তার বিশাল কাঁধে চড়ে বসলো রবিন। নদীর কোথাও কোমর পানির বেশি নেই, কিন্তু এখানে ওখানে পিচ্ছিল পাথর পড়ে থাকায় সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোলো সন্ন্যাসী।

ওপারে পৌঁছে তড়াক করে নামলো রবিন সন্ন্যাসীর কাঁধ থেকে। ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে, এমন সময় ইস্পাত-কঠিন একটা হাত জড়িয়ে ধরলো ওকে, পরমুহূর্তে দেখতে পেল, ক্ষুরধার এক ছোরা ধরা রয়েছে ওর গলায়।

'আরে! এ কি করছেন, হোলি ফাদার!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'পাদ্রীদের রক্তপাত ঘটানো নিষেধ, জানা নেই আপনার?'

'রক্ত যদি ঝরে, তুমি নিজেই দায়ী থাকবে তার জন্যে, বৎস,' শান্ত গলায় বললো সন্ন্যাসী। 'আমার কথা মত কাজ করলে একফোঁটা রক্ত বেরোবে না। কথা না শুনলে ঠিক তিন আঙুল ফাঁক করে দেব গলাটা।'

'কি করতে হবে?' জানতে চাইলো রবিন।

'আমার জিনিসপত্র সব ওপারে রয়ে গেছে,' বললো সন্ন্যাসী। 'হাঁপিয়ে গেছি বড্ডো, তোমার সাহায্য ছাড়া তো, বাছা, যেতে পারছি না ওপারে।'

এই বিশাল ধড় কাঁধে নিয়ে নদী পেরোবার কথা ভাবতেই গলাটা শুকিয়ে এলো রবিনের। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এ থেকে উদ্ধার পাওয়ারও কোন উপায় নেই। তীক্ষ্ণ ছোরাটা ঠেকে রয়েছে ওর কণ্ঠনালীতে। জোরাজুরি করে কোন লাভ নেই, শুধু গলার স্বরই নয়, সন্ন্যাসীর গায়ের জোরও ঠিক ষাঁড়ের মত।

বাধ্য হয়ে কাঁধে তুলে নিলো রবিন ভয়ঙ্কর রকমের ভারি সন্ন্যাসীকে। মড় মড় শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পিঠের হাড়গুলো। বাঁকা হয়ে যেতে চাইছে শরীরটা। তার ওপর নদীর কোথায় খানা-খন্দ আর পিচ্ছিল পাথর রয়েছে জানা নেই ওর। টালমাটাল অবস্থায় এগোলো সে, পিছলে পড়ে যেতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচে গেল বারকয়েক। দরদর ঘাম ছুটলো ওর, হাঁ করে শ্বাস টানছে, মনে হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক পাউণ্ড করে বেড়ে যাচ্ছে সন্ন্যাসীর ওজন।

এদিকে রবিনের কাঁধে মহানন্দে বসে আছে সন্ন্যাসী। এক হাতে ধরে রেখেছে ওর চুলের মুঠি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে পেটের কাছে খোঁচাচ্ছে, আর মুখে বলছে, 'হ্যাট...হ্যাট, চু চু চু!' শিশুর মত হাসছে প্রাণখোলা হাসি।

সব কষ্টেরই শেষ আছে। লাল হয়ে গেছে রবিনের মুখ, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছলো সে অপর পারে। লাফ দিয়ে নামলো সন্ন্যাসী রবিনের কাঁধ থেকে। তীর বেয়ে ওপরে উঠতে যাবে, এমন সময় চট্ করে ওর একটা পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো রবিন। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়লো সন্ন্যাসী—এতই জোরে, যে মাথা থেকে ছিটকে ছয় হাত দূরে গিয়ে পড়লো শিরস্ত্রাণটা। একটানে তলোয়ারটা বের করলো রবিন আবার।

'এই বার?' তর্জনী দিয়ে কপাল আর ভুরু থেকে ঘাম ঝরিয়ে জানতে চাইলো রবিন, 'আবার আমাকে ওপারে দিয়ে আসবে, নাকি এক কোপে ফাঁক করে দেব টাকটা।'

'দেবো, দেবো!' চেঁচিয়ে উঠলো সন্ন্যাসী। রবিনের রুদ্রমূর্তি আর ঝকঝকে তলোয়ার দেখে মনে হলো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছে সে।

আবার উঠলো রবিন সন্ন্যাসীর কাঁধে। পানিতে নামলো সন্ন্যাসী। নদীর মাঝামাঝি

গিয়ে একটু থামলো মোটা সন্ন্যাসী। হাসি ফুটে উঠলো রবিনের মুখে, ভাবলো পিচ্ছিল পাথর পাশ কাটাবার জন্যেই এই বিরতি। কিন্তু হাসিটা মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধ থেকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল সন্ন্যাসী রবিনকে। ডিগবাজী খেয়ে হড়াশ করে পড়লো সে পানিতে। মাঝ-নদীতে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে রবিন, কিন্তু সেটা দেখা কিংবা সাহায্য করার জন্যে দাঁড়ালো না সন্ন্যাসী, ফিরে গেল নিজের পারে।

সামলে নিয়ে রবিন যখন আবার দু'পায়ে খাড়া হলো দেখলো তীরে দাঁড়িয়ে হেসে খুন হয়ে যাচ্ছে মোটা সন্ন্যাসী ওর চুপচুপে ভেজা করুণ অবস্থা দেখে। রাগে অন্ধ হয়ে গেল রবিন হুড। 'দাঁড়াও! দেখাচ্ছি মজা! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন!' বলে খোলা তলোয়ার হাতে পানির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে এগোলো সে সন্ন্যাসীর দিকে।

রবিনের এই অগ্নিমূর্তি দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না সন্ন্যাসী। ধীরে সুস্থে মাটি থেকে তুলে শিরস্ত্রাণটা পরে নিল মাথায়, তারপর ঢোলা কাপড়ের মধ্যে থেকে বের করলো মস্ত এক তলোয়ার, আর ছোটোখাটো একটা ঢাল। কোন কথাবার্তা বিনিময় হলো না, রবিন তীরে এসে পৌছুতেই শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই।

লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, একবার পার বেয়ে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে; দু'জনই খুঁজছে একে অন্যের দুর্বলতা, ঝনঝন শব্দ হচ্ছে ঢাল তলোয়ারের সংঘর্ষে—কিন্তু কেউ কাউকে কাবু করতে পারা তো দূরের কথা স্পর্শই করতে পারছে না। পুরো একটা ঘন্টা সমানে সমান লড়ে গেল দু'জন। কখনো পানিতে নেমে, কখনো ডাঙায়; বিপুল বিক্রমে লড়ে চললো দু'জন; মারছে, ঠেকাচ্ছে, একদিকে আক্রমণের ভান করে অন্য দিকে আক্রমণ করছে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যে-যার তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে বিশ্রামের জন্যে থামলো ওরা।

'একটা সন্দেহ জাগছে আমার মনে, হোলি ফাদার,' বললো রবিন।

'কি সন্দেহ, প্রিয় বৎস?' হাসিমুখে জানতে চাইলো সন্ন্যাসী।

'আপনি নিজেই কি ফ্রায়ার টাক, মানে, ফাউন্টেনস অ্যাবির সন্ন্যাসী টাক?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'কসম খোদার, এমন দাঙ্গাবাজ সন্ন্যাসী জীবনে আর দেখিনি আমি!'

হা হা করে হেসে উঠলো সন্ন্যাসী। 'দাঙ্গার আর কি দেখেছো, বাছা! থাকতো যদি তীর ধনুক,দেখতে কি রকম চমকে দিতাম তোমার পিলেটা!'

'আমার প্রশ্নের কিন্তু জবাব দেননি এখনও আপনি।'

'কেন দেব? তোমাকে চিনি আমি যে নিজের পরিচয় দেব? কে তুমি ? নিজের পরিচয় দাও আগে।'

'পরিচয় দেয়ার আগে আমার শিঙাটা একটু বাজাবার অনুমতি দেবেন?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' জবাব দিলো সন্ন্যাসী। 'যত খুশি শিঙা ফোঁকো, আমার কোন আপত্তি নেই।'

রবিনের শিঙার শব্দ পেয়ে ছুটে এলো ওর চার-সঙ্গী। ভয়ঙ্কর দর্শন চারজন সশস্ত্র তাগড়া জোয়ান লোককে ছুটে আসতে দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল মোটা সন্ন্যাসীর ক্ষুদ্র চোখ দুটো। মনে হলো যেন ভয় পেয়েছে। বললো, 'আশ্চর্য! মাটি ফুঁড়ে হাজির হলো নাকি? কারা এরা? তুমিই বা কে?'

'এরা আমার অনুচর। আমি রবিন হুড।'

'তাই নাকি!' বিস্মিত দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখলো সন্ন্যাসী রবিনকে। 'তোমার মহত্ত্ব আর বীরত্বের কথা লোকের মুখে মুখে অনেক শুনেছি আমি।'

'এবার তাহলে, হোলি ফাদার, আপনার পরিচয়টা...'

'পরিচয় দেয়ার আগে আমার বাঁশীটা একটু বাজাতে চাই,' বললো সন্ন্যাসী।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' জবাব দিল রবিন। 'যতবার খুশি।'

গলায় ঝুলানো একটা হুইসেল মুখে তুলে ফুঁ দিল সন্ন্যাসী। সাথে সাথেই প্রচণ্ড গর্জন করে কোত্থেকে যেন ছুটে এলো বিশাল চেহারার চারটে ভয়ঙ্কর-দর্শন হাউণ্ড। সন্ন্যাসীর দু'পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল ওরা, চোখ গরম করে চাইছে রবিন ও তার দলবলের দিকে।

'এরা আমার অনুচর। আমি সন্ন্যাসী টাক,' রবিনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বললো সন্ন্যাসী। 'এবার বলে ফেলো, বৎস, কি উদ্দেশ্যে খোঁজ করছো তুমি আমাকে?'

'আপনাকে আমাদের দরকার,' সোজা সাপ্টা বললো রবিন। 'শহরের গির্জায় যেতে পারি না আমরা। উপাসনার কোন ব্যবস্থা নেই আমাদের শেরউডে। যাতে অধার্মিক হয়ে না যাই, সেজন্যে একজন পুরোহিত একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের জন্যে। কিন্তু যাকে-তাকে তো আর শেরউডে ডাকা যায় না। আপনি যদি আমাদের সাথে যান, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে মাথায় তুলে রাখবো আপনাকে।'

দুই কান পর্যন্ত বিস্তারিত হলো সন্ন্যাসীর হাসি। 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদেরকে আমার খুব পছন্দ। অনেকদিন ভেবেছি, যাই, শেরউডে গিয়ে খুঁজে বের করি মহানহৃদয় রবিন হুডকে; ওকে বলি, দলে নাও আমাকে, তোমাদের ধর্মকর্মের দিকটা দেখবো আমি। ভালই হলো। তুমি নিজেই যখন এসে হাজির হয়েছো, আমি এক্ষুণি প্রস্তুত। চলো, এগোনো যাক।'

এইভাবে যোগ দিল বিখ্যাত সন্ন্যাসী টাক রবিন হুডের দলে। পরবর্তীকালে অসংখ্য গাথা রচনা হয়েছিল তার কীর্তিকলাপ নিয়ে। এতবড় জ্ঞানী, যুদ্ধবাজ, মহৎ সন্ন্যাসী সে-যুগে আর ছিল কিনা সন্দেহ।

শেরউডের সবাই দারুণ খুশি হলো সন্ন্যাসী টাককে পেয়ে। মস্ত এক ভোজের আয়োজন করে সম্মানিত করলো ওরা সন্ন্যাসী টাকের পদার্পণের দিনটিকে।

বারো

দুখী নাইট

দিন যায়।

রূপালী বৃষ্টি, ঝকঝকে রোদ, সবুজ-মাঠ-ময়দান আর অপূর্ব ফুলের সম্ভার নিয়ে বসন্ত আসে শেরউডে, চলে যায়। তারপর ঝাঁঝালো হলুদ রোদ, ভ্যাপসা গরম, দীর্ঘ গোধূলি আর পাহাড়ী পরীদের কোমল রাত নিয়ে আসে গ্রীষ্ম, চলে যায়। আসে শরৎ, ফসল ওঠে কৃষকের ঘরে, সবার মনেই খুশি-খুশি ভাব, সেই সাথে আসন্ন শীতের প্রস্তুতি, সবুজ পাতাগুলো ক্রমে খয়েরী হয়ে আসে। এরপর উত্তুরে হিমেল হাওয়া ডেকে নিয়ে আসে শীত, সেই সাথে শুভ্র তুষার, বাক্স থেকে বেরোয় স্মৃতির গন্ধ মাখা গরম জামা, ঘরের কোণে চুলোয় গন-গন করে আগুন।

দিন যায়। বছরের পর বছর ঘুরে ঘুরে আসে শীত বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ—আগে যেমন আসতো, এখনও তেমনি আসে, ভবিষ্যতেও আসবে। কিন্তু মানুষ আসে একবারই, যখন যায় চিরকালের জন্যেই যায়; কেউ শুকনো পাতার মত ঝরে বিলীন হয়ে যায়, কেউ রেখে যায় কিছু কথা।

এক সুন্দর সকালে ঘুম থেকে উঠেই ডাক দিল রবিন লিটল জনকে। 'দেখেছো, লিটল জন, কি তাজা বাতাসটা? চলো বেরিয়ে পড়া যাক। একদল নিয়ে তুমি রওনা হয়ে যাও পুবে, আমি আরেক দল নিয়ে যাই পশ্চিম দিকে—দুইজনেই যদি শেরউডে

ভোজের জন্যে মেহমান নিয়ে ফিরতে পারি তাহলে দারুণ মজা হবে।'

'ঠিক বলেছো,' লাফিয়ে উঠলো লিটল জন। 'এক্কেবারে মনের মতন কথা। এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি আমি—অতিথি না নিয়ে ফিরবো না আজ।'

একদল নিয়ে বেরিয়ে গেল লিটল জন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেক দল নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন হুড।

রবিনের সাথে রয়েছে উইল স্কারলেট, মাচ, ওয়াটসন, অ্যালান-এ-ডেল, উইল স্কেদলক, মিজ দ্য মিলার, এবং আরো অনেকে। জনা কুড়ি অনুচর রয়ে গেছে ভোজের আয়োজনে সন্ন্যাসী টাককে সাহায্য করার জন্যে, বাকি সবাই রয়েছে হয় রবিন, নয় লিটল জনের সাথে।

আগে আগে হাঁটছে রবিন, পিছন পিছন চলেছে আর সবাই। মাঝে মাঝে জঙ্গল ছেড়ে খোলা উপত্যকার ওপর দিয়ে ফসলের খেত আর কুটিরগুলোকে পাশ কাটিয়ে আবার গিয়ে ঢুকছে রাস্তাটা জঙ্গলে। হাঁটতে হাঁটতে ম্যান্সফীল্ড শহর ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর চলে গেল ওরা। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পড়লো, তবু থামলো না রবিন, হাঁটতে হাঁটতে ডার্বিশায়ারের অ্যালবার্টনও ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে একটা গির্জার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। দু'দিক থেকে দুটো রাস্তা এসে মিশেছে এখানে। রাস্তার দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড়। ঝোপের আড়ালে বসে খেয়ে নেয়া যাবে দুপুরের খাবারটা, সেই সাথে নজর রাখা যাবে দুটো রাস্তার ওপরই—তাই এইখানেই কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

এত হাঁটাহাঁটিতে খিদে লেগে গেছে সবারই, দ্বিতীয়বার বলতে হলো না কাউকে, যে-যার খাবার বের করে খাওয়া শুরু করলো বিনা বাক্যব্যয়ে।

দুটো রাস্তার একটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে ওপাশে। পাহাড়ের ওপাশে কয়েকটা বাড়ির ছাত দেখা যাচ্ছে, একটা উইণ্ড মিলের পাখা ঘুরছে ধীর বাতাসে—পাখার অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে ঘুরে।

খাওয়া শেষ করে অনেকক্ষণ বসে রইলো ওরা ঝোপের আড়ালে, কেউ কেউ শুয়ে পড়লো ঘাসের উপর; অপেক্ষা করছে ওরা, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে রাস্তার দিকে—কিন্তু কারো দেখা নেই। শেষ পর্যন্ত যখন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে যাবে রবিন, এমনি সময়ে একজন লোকের মাথা দেখা গেল পাহাড়ের উপর। এদিকেই আসছে কেউ ঘোড়ায় চেপে। লাফিয়ে উঠে বসলো রবিন। 'নাইট! নাইট একজন!'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নাইট। আরও কিছুটা কাছে আসতেই দেখা গেল যদিও পোশাক-পরিচ্ছদ খুবই দামী, চেহারায় গভীর বিষাদের চিহ্ন রয়েছে নাইটের। পোশাকটা দামী হলেও সোনার চেন বা মণিমুক্তোর কোন চিহ্ন নেই লোকটার শরীরের কোথাও। বয়স্ক লোক, মাথাটা নুয়ে রয়েছে বুকের কাছে, হাত দুটো ঝুলে আছে শরীরের দু'পাশে। হতাশ, মন্থর গতি—যেন দুনিয়ার কোথাও গিয়ে কিছুই পাওয়ার নেই তাঁর, গভীর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার রেখা পড়েছে তাঁর মুখে। ঢিল হয়ে রয়েছে ঘোড়ার মুখের রাশ, মাথা নিচু করে হাঁটছে ঘোড়াটা, যেন প্রভুর দুঃখে দুঃখিত সে-ও।

'কপালটাই খারাপ আজ,' বললো রবিন। 'যাও বা একটা নাইট পাওয়া গেল, মনে হচ্ছে দুঃখের ভারে শুয়ে পড়বে এখুনি। তবে কাপড়-চোপড়ের অবস্থা তো মনে হচ্ছে মোটামুটি ভালই। যাই, অন্ততঃ দু'চারটে কথা বলে আসি। বলা যায় না, কিছু মালপানি মিলেও যেতে পারে,' উঠে দাঁড়ালো সে। সঙ্গীদের বললো, 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, প্রথমে আমি একা কথা বলে দেখি।'

রাস্তা পার হয়ে গির্জার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রবিন, দুখী নাইট কাছাকাছি আসতেই এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো ঘোড়ার লাগামটা। 'থামুন, স্যার নাইট,' বললো

সে। 'দু'চারটে কথা আছে আমার, শুনে যান।'

'কে তুমি, ভাই,' বললেন নাইট। 'রাজপথের ওপর এভাবে পথিককে দাঁড় করাচ্ছো... কে তুমি?'

'কঠিন একটা প্রশ্ন করেছেন, স্যার নাইট!' জবাব দিল রবিন। 'কেউ আমাকে বলে দয়ালু, কেউ বলে নিষ্ঠুর; এ বলে সৎ, ভালো লোক, ও বলে জঘন্য চরিত্রের এক চোর। কোলা ব্যাঙের গায়ে যতগুলো দাগ আছে, একটা মানুষকে তত ভাবে দেখা যায়; এটা নির্ভর করে যার-যার দেখার ভঙ্গির ওপর। আপনি কিভাবে দেখবেন সেটা আপনিই জানেন। আমার নাম রবিন হুড।'

'আচ্ছা! তুমিই সেই স্বনামধন্য রবিন?' নাইটের ঠোঁটের কোণে একটু যেন হাসির আভাস ফুটে উঠলো। 'তোমার সম্পর্কে অনেক শুনেছি আমি, বেশির ভাগই ভাল কথা, তবে খারাপও যে শুনিনি তা নয়—কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে একটু বুদ্ধি খরচ করে বুঝে নিয়েছি, কেন সেই বিশেষ ব্যক্তিটি খারাপ বলছে তোমাকে। যাই হোক, এ থেকে হয়তো অনুমান করতে পারবে তোমার সম্পর্কে আমার মনোভাব। এবার বলো, কি চাও তুমি আমার কাছে।'

'আপনার ভদ্র, নম্র, মার্জিত কথাগুলো খুবই ভাল লাগলো আমার, স্যার নাইট,' বললো রবিন। 'আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে আমি আমাদের শেরউড জঙ্গলে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে। আমাদের সাথে ভোজ খেতে হবে আজ আপনার, স্যার নাইট।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বললেন নাইট। চেহারাটা আরো যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে। 'কিন্তু একজন দুঃখী অতিথি তোমাদের ভাল লাগবে না। ভোজের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে তোমাদের আমাকে সাথে নিলে। তার চেয়ে বরং রাস্তা ছাড়ো, আমি চলে চাই নিজের পথে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা আসলে একটু অন্যরকম, স্যার নাইট,' বললো রবিন। 'আপনাকে নিজের পথে চলে যেতে দিতে পারি না আমরা। শেরউডের গভীর জঙ্গলে আমরা একটা সরাইখানার মত খুলেছি। কিন্তু আমাদের ওখানে অতিথি আসতে চায় না সহজে। তাই আমরা প্রায়ই অতিথির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি, যেখানে পাই ধরে নিয়ে যাই তাদের, ভোজের পর খরচা বাবদ কিছু পাবো এই আশায়।'

'তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি,' গম্ভীর হয়ে গেলেন নাইট। 'কিন্তু ভুল লোক ধরেছো আজ, রবিন। আমার কাছে টাকা পয়সা নেই।'

'তাই বুঝি?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাইটের চোখের দিকে তাকালো রবিন। 'মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু তবু, স্যার নাইট, কিছু মনে করবেন না, অনেক বড় বড় বিশিষ্ট সম্মানিত ভদ্রলোককে আমি নির্জলা মিথ্যা বলতে শুনেছি—কাজেই আপনার কথার সত্যতা আমি নিজে যাচাই করে দেখবো।' এই বলে দুটো আঙুল মুখে পুরে তীক্ষ্ণ একটা শিস দিল রবিন। হুড়মুড় করে ছুটে এলো চার-কুড়ি জোয়ান। গর্বের সাথে বললো রবিন, 'এরা সবাই আমার বিশ্বস্ত সহচর। আনন্দ বা দুঃখ যা পাই, লাভ বা লোকসান যা হয় সমান ভাগে ভাগ করে নিই আমরা। এবার বলুন তো, স্যার নাইট, ঠিক কত টাকা আছে আপনার কাছে?'

কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না নাইট, ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে তাঁর গাল দুটো, মাথাটা নুয়ে পড়তে চাইছে নিচের দিকে। হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে কি যেন তাড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি, তারপর সোজা চাইলেন রবিনের মুখের দিকে। বললেন, 'অযথা লজ্জা পাচ্ছি কেন? লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। ঠিক আছে, শোনো, ভাই, মাত্র দশটা শিলিং আছে আমার থলিতে; এছাড়া স্যার রিচার্ড অফ দ্য লী-র আর কিছুই নেই সারা দুনিয়ায়।'

কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই বেশ কিছুক্ষণ, তারপর রবিন বললো,

'আপনার কাছে আর টাকা পয়সা নেই…আপনি শপথ করে বলছেন?'

'বলছি,' মাথা ঝাঁকালেন স্যার রিচার্ড। 'যা আছে এই আমার শেষ সম্বল, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু থলি বলে নয়, আসলে কোথাও আর কিছু নেই। দেখো, নিজেই পরীক্ষা করে দেখো সত্যি বলছি কিনা।' এই বলে থলিটা বের করে বাড়িয়ে দিলেন তিনি রবিনের দিকে।

'রেখে দিন ওটা, স্যার রিচার্ড,' বললো রবিন। 'আপনার মত এমন মিষ্টভাষী ভদ্র নাইটের কথা আমি অবিশ্বাস করতে চাই না। অত্যাচারী, অহঙ্কারী আর নিষ্ঠুর উদ্ধত ধনী লোকের মাথা আমি নত করে ছেড়ে দিই ঠিকই, কিন্তু বিনয়ী, নম্র, দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি সাধ্যমত। আসুন, স্যার রিচার্ড, টাকা নেই তো কি হয়েছে, তবু আপনি আমন্ত্রিত, চলুন আমাদের সাথে যোগ দেবেন আজ শেরউডের ভোজে। আমাদের ক্ষমতা সীমিত, কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হয়তো আমাদের সাহায্য কাজে লেগে যাবে আপনার।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু,' বললেন স্যার রিচার্ড। 'তোমার সদিচ্ছার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদিও আমার দুঃখ দূর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তোমার সাদর আমন্ত্রণ আমি খুশি মনেই গ্রহণ করছি।' এই বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। হাঁটতে শুরু করলো বাকি সবাই। স্যার রিচার্ডের দু'পাশে হাঁটছে রবিন হুড আর উইল স্কারলেট, বাকি সবাই চলছে পিছন পিছন।

কিছুদূর চুপচাপ হেঁটে মুখ খুললো রবিন। 'জিজ্ঞেস করা হয়তো ঠিক হচ্ছে না, হয়তো পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে আপনাকে কষ্টই দেয়া হচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস না করে পারছি না—আচ্ছা, স্যার নাইট, আজ আপনার এই অবস্থার কারণটা কি? মনের কথা বলে ফেললে হয়তো আপনার দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে।'

'ঠিকই বলেছো, রবিন, বলে ফেললে মনের ভার অনেকটা হালকা হয়ে যায়। তাছাড়া সবাই যখন জানে, তুমি জানলে আমার কোন ক্ষতি নেই। ব্যাপারটা হচ্ছেঃ আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। আমার দুর্গ, জমিদারী, সব বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করেছিলাম আমি এমেট মঠের মোহান্তের কাছে। আগামী তরশু টাকা শোধ দেয়ার শেষ তারিখ। যদি ওই তারিখের মধ্যে পুরো দেনা শোধ না করতে পারি, আমার সর্বস্ব চলে যাবে মোহান্তের হাতে। আর, একবার গিলে ফেললে এমেটের মোহান্তের হাত থেকে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয় কারো পক্ষেই।'

'আমি বুঝি না,' বললো রবিন। 'সূর্যের তাপে তুষার যেমন গলে, আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেদের হাতে পড়লে ঠিক তেমনি ভাবে কেন গলে বেরিয়ে যায় টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত।'

'আমার ওপর অবিচার করছো তুমি, রবিন,' বললেন প্রৌঢ় স্যার রিচার্ড। 'ভেবেছো, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে গিয়ে সব কিছু খুইয়ে বসেছি—ব্যাপারটা আসলে তা নয়। সবটা শুনলে বুঝতে পারবে। বিশ বছর বয়েসের এক ছেলে আছে আমার। এই বয়সেই নাইট উপাধি অর্জন করে নিয়েছে সে। গত বছর চেস্টারে নাইটদের বল্লম-যুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত ছিলাম সেখানে, আমার ছেলেও গিয়েছিল। গর্বের সাথে দেখছিলাম আমরা আমাদের ছেলের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, ওর সাথে খেলতে গিয়ে একের পর এক হারছিল আর সব নাইট। অবশেষে ল্যাংকাস্টারের স্যার ওয়াল্টার নামলেন যুদ্ধে। বয়স কম হলে কি হবে, আশ্চর্য নৈপুণ্যের সাথে প্রতিটা আঘাত ঠেকিয়ে দিল আমার ছেলে। কিন্তু ও যখন পাল্টা আক্রমণ করলো, সামাল দিতে পারলেন না স্যার ওয়াল্টার, দুর্ভাগ্য আমাদের, দুটো বর্শাই ফেটে চুর চুর হয়ে গিয়েছিল, কি করে যেন আমার ছেলের বর্শার একটা চটা ওঁর চোখ দিয়ে ঢুকে মগজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ঘোড়ার ওপর বসা অবস্থাতেই মারা গেলেন

তিনি তৎক্ষণাৎ। উপস্থিত সবাই বললো এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, কিন্তু স্যার ওয়াল্টারের প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়স্বজন মানলো না সে-কথা। তারা ব্যাপারটাকে এমনই ঘোলাটে করে তুললো যে ছেলেকে নির্ঘাৎ জেল থেকে রক্ষা করার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিলাম আমি ছয়শো পাউণ্ড। কিন্তু এতেও ওদের খাঁই মিটলো না, আইনের নানান বিদঘুটে প্যাঁচে ফেলে ঘোলাপানি খাইয়ে ছেড়ে দিল আমাকে। সে-সব সামলাতে গিয়ে এমেটের মোহান্তের কাছে হাত পাততে হলো আমার। বিপদের সময় সে-ও সুযোগ নিতে ছাড়লো না, সামান্য টাকার বিনিময়ে বন্ধকী দলিল করিয়ে নিল গোটা সম্পত্তির। যা হোক, ছেলেটাকে যে বাঁচাতে পেরেছি, এটুকুই আমার সান্ত্বনা। বাস্তব অবস্থাটা আমি মেনে নিয়েছি, সম্পত্তি হারিয়ে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু এই অসম্মানজনক পরিবেশে আমার স্ত্রীর কি অবস্থা হবে তাই ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বার বার।'

'আপনার ছেলে এখন কোথায়?' জানতে চাইলো রবিন।

'প্যালেস্টাইনে লড়াই করছে এখন আমার ছেলে। শুনেছি, খুবই বীরত্বের সাথে লড়ছে সে।'

'সত্যিই,' বললো রবিন, 'দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন আপনি। তা, কত টাকা ধার নিয়েছিলেন আপনি এমেটের মোহান্তের কাছ থেকে?'

'মাত্র চারশো পাউণ্ড।'

রেগে গেল রবিন। 'আশ্চর্য রক্ত-চোষা লোক তো! ঘর বাড়ি দুর্গ সহ একটা গোটা জমিদারী দখল করতে যাচ্ছে ব্যাটা মাত্র চারশো পাউণ্ডের বিনিময়ে! আচ্ছা, সর্বস্ব হারিয়ে আপনি কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?'

'আমার জন্যে কোন চিন্তাই করি না আমি,' বললেন স্যার রিচার্ড। 'যেটুকু যা দুশ্চিন্তা করছি, তা শুধু আমার স্ত্রীর কথা ভেবে। কোন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় তাদের দান ও কৃপার ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে হবে ওর। মনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে, কিন্তু টুঁ শব্দ করবে না ও, আমি জানি। সেজন্যেই খারাপ লাগছে এত। আমার কি, বুড়ো হয়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু এখনও অক্ষম হয়ে পড়িনি—আমি ঠিক করেছি চলে যাবো প্যালেস্টাইনে, ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে বাপ-ব্যাটা যুদ্ধ করবো একসাথে।'

এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল, এবার হঠাৎ কথা বলে উঠলো উইল স্কারলেট, 'আচ্ছা, এই বিপদের সময় আপনার বন্ধু-বান্ধবরা এগিয়ে এলো না কেউ? কেউ সাহায্য করলো না?'

'নাহ্,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন স্যার রিচার্ড।'কেউ না। যখন আমার অনেক টাকা ছিল, তখন বন্ধু বান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভালবাসার প্রতিযোগিতা লেগে যেত, প্রত্যেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতো অন্যের চেয়ে সে-ই বেশি ভালবাসে আমাকে। সবাই সরে পড়েছে এখন। কারণ ওরা জানে, শুধু যে গরীব হয়ে গিয়েছি তাই নয়, প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু রয়েছে আমার।' দুঃখের হাসি হাসলেন স্যার রিচার্ড, 'ওরা জানে, আর কোনদিনই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না আমি।'

'এই বিপদে আপনার কোন বন্ধু নেই, একথা ভাববেন না, স্যার রিচার্ড,' বললো রবিন হুড। 'যারা দুর্বল, যারা পরনির্ভরশীল, তারা সরে গেছে আপনার ওপর আর নির্ভর করা যায় না বলে। গর্ব করছি না, কিন্তু আমি দুর্বলও নই, পরনির্ভরশীলও নই। দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন মন থেকে। আপনার এই বিপদে হয়তো আমি কোন সাহায্যে লাগতে পারবো।'

ম্লান হাসলেন স্যার রিচার্ড। মাথা নাড়লেন এপাশ ওপাশ। বললেন, 'তোমার আশ্বাসের জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাহায্য তো দূরের কথা, এটুকুও পাইনি আমি কারো কাছে গত একটা বছর। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, তোমাদের সহানুভূতি পেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেল আমার মনটা।'

গ্রীনউড গাছের নিচে ওরা যখন পৌছলো, তখন শেষ বিকেল। দূর থেকেই দেখতে পেল ওরা লিটল জন আর তার দলবল পৌছে গেছে সেখানে আগেই। অতিথি নিয়ে ফিরেছে ওরাও, হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপকে ধরে এনেছে রাস্তা থেকে। রেগে একেবারে টং হয়ে আছেন বিশপ, গাছের নিচে পায়চারি করে ফিরছেন, যেন মুরগীর খাঁচায় আটকা পড়া খেঁকশেয়াল! তাঁর পিছনে কালো কাপড় পরা তিনজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে। ছয়টা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে গাছের ডালে। বোঝা যাচ্ছে একটায় চড়ে যাচ্ছিলেন বিশপ, বাকি পাঁচটার পিঠে বোঝাই মালপত্র। একটা মাঝারী আকারের বাক্সের ওপর চোখ পড়তেই খুশি হয়ে উঠলো রবিন হুড; লোহার পাত জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে ওটাকে শক্তভাবে।

রবিন আর তার দলবলকে দেখেই বীরদর্পে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিলেন লর্ড বিশপ, কিন্তু প্রহরায় মোতায়েন এক অনুচর হাতের মোটা লাঠিটা সমান্তরাল করে ধরে ঠেকালো তাঁকে। বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, কিন্তু ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো আরো, কঠোরতর তিরস্কারের ভাষা বেরোতে শুরু করলো তাঁর মুখ থেকে।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' দূর থেকেই হাঁক ছাড়লো রবিন। 'আপনি কষ্ট করে আমার কাছে আসবেন কেন, লর্ড বিশপ, আমিই আসছি আপনার কাছে। আপনাকে এখানে দেখে আমার কী যে খুশি লাগছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।'

রবিন হুড কাছে এসে দাঁড়াতেই তীব্র ভৎর্সনার সুরে নালিশ জানালেন হেরিফোর্ডের বিশপ। 'একজন লর্ড বিশপের সাথে তোমাদের এটা কোন্ ধরনের ব্যবহার, আমি জানতে চাই। কারো সাথে কোন ঝগড়া নেই ফ্যাসাদ নেই, নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, চলেছিলাম রাজপথ ধরে, এই তিনজন সাধু, পাঁচটা মালটানা ঘোড়া, আর দশ জন পাহারাদার নিয়ে; এমন সময় ইয়া লম্বা বিকট চেহারার এক লোক পেছনে তিন চার কুড়ি গুণ্ডা নিয়ে হুকুম করলো আমাকে থামতে। খেয়াল করো, আমাকে—হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপকে থামতে বলছে! পেছনে চেয়ে দেখি—জাহান্নামে যাক ব্যাটারা!—সব কটা পাহারাদার স্রেফ হাওয়া হয়ে গছে। শোনো, ওই বিরাট দৈত্যের মত লোকটা আমাকে শুধু থামিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, হুমকি দিয়েছে, বাড়াবাড়ি করলে নাকি রবিন হুড আমাকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেবে! শুধু তাই নয়, যা ইচ্ছে তাই বিচ্ছিরী সব গাল দিয়েছে লোকটা আমাকে ঃ মোটা পুরুত, মানুষখেকো বিশপ, অর্থলোলুপ রক্তচোষা সুদখোর··· আরো কত কি! তার ওপর আমি এখানে আসার পর কোত্থেকে মোটা এক কপট-সন্ন্যাসী এসে আমার ঘাড়ে চাপড় মেরে কথা বলার চেষ্টা করেছে—যেন আমি তার ইয়ার-দোস্ত!'

'কি বললে? মুখ সামলে কথা বলো বলে দিচ্ছি!' এক লাফে বিশপের সামনে এসে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী টাক। বিশপের নাকের কাছে এমন জোরে তুড়ি বাজালো যে চমকে আধ হাত সরে গেলেন বিশপ। 'আমি কপট সন্ন্যাসী? তোমার থেকে কোন্ দিক থেকে আমি কম সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবে? জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে···· কোন্‌টায় কম? গোটা বাইবেল মুখস্থ বলতে পারি আমি, তা জানো? কুড়েঁঘরে জন্ম আমার, তা নইলে আজ তোমার চেয়ে অনেক অনেক উঁচুস্তরের বিশপ হতে পারতাম আমি। কপট বলার স্পর্ধা দেখিয়ো না হে, পরীক্ষায় নামলে হেরে যাবে। শুধু একটা দিকে, স্বীকার করি, কিছুটা কম আছি আমি তোমার থেকে, অত ভয়ংকর রকমের মোটা হতে পারিনি এখনও।'

ঝগড়াটে বিড়ালের মত ফুঁসে উঠলেন বিশপ এই কথায়, চোখ পাকিয়ে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করছেন তিনি সন্ন্যাসী টাককে; টাকও চোখ-মুখ পাকিয়ে এমন এক ভেংচি ধরলো যে স্যার রিচার্ড সহ হেসে উঠলো সবাই। কিন্তু রবিন গম্ভীর। 'সরে যান, ফাদার টাক,' বললো সে, 'সরুন দেখি। এতবড় সম্মানিত লর্ড বিশপকে হেয় প্রতিপন্ন করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। আমি খুবই দুঃখিত, মাননীয় লর্ড বিশপ। আপনার সাথে আমার

লোকজন এত খারাপ ব্যবহার করেছে শুনে আমি সত্যিই দুঃখিত। কোথায় লিটল জন, সামনে এসে দাঁড়াও!'

কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ালো লিটল জন। বিশপের দিকে ফিরলো আবার রবিন। 'এই লোকটাই দুর্ব্যবহার করেছিল আপনার সঙ্গে, লর্ড বিশপ?'

'হ্যাঁ, এই লোকই,' বললেন বিশপ। 'খুবই খারাপ লোক, সন্দেহ নেই।'

'লিটল জন, তুমি আমাদের মাননীয় লর্ডকে মোটা পুরুত বলেছো?' রবিনের কণ্ঠে স্পষ্ট তিরস্কার।

'বলেছি,' নিচু গলায় বললো লিটল জন।

'তুমি এঁকে মানুষখেকো বিশপ বলেছো?'

'বলেছি।' যেন অপরাধ স্বীকার করছে আসামী, এমনি ভঙ্গিতে বললো লিটল জন।

'তুমি এঁকে অর্থলোলুপ রক্তচোষা সুদখোর বলেছো?'

'বলেছি।' কাঁদো কাঁদো হয়ে এলো লিটল জনের গলা।

'ছি ছি, এতটা ভাবতেও পারিনি আমি!' বলেই বিশপের দিকে ফিরলো রবিন। 'বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড বিশপ। ওর একটা কথাও অবিশ্বাস করতে পারছি না—আর যাই করুক, কোনদিন মিছে কথা বলে না ও।'

গোটা জঙ্গল কাঁপিয়ে হেসে উঠলো সবাই। চিবুক থেকে শুরু করে মাথা-জোড়া টাক পর্যন্ত লাল হয়ে গেল বিশপের, বার দুই মুখ খুললেন কিছু বলার জন্যে, কিন্তু আওয়াজ বেরোলো না।

'কিছু মনে করবেন না, লর্ড বিশপ,' আবার বললো রবিন, 'আমরা একটু কর্কশ প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু আপনি যতটা ভাবছেন ততটা খারাপ লোক নই। এখানে এমন একজনও পাবেন না যে আপনার মাথার একটা চুল স্পর্শ করবে।' বলেই আবার সংশোধন করলো রবিন, 'চুল অবশ্য নেই, কিন্তু থাকলেও স্পর্শ করতো না। আমি বুঝতে পারছি, আমাদের রসিকতায় আপনি আহত বোধ করছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা এখানে সবাই সমান। আমাদের এখানে বিশপ নেই, ব্যারন নেই, আর্ল নেই—কারো ওপর মাতব্বরি করার কেউ নেই। আমাদের পরিচয়ঃ আমরা মানুষ। আমাদের সাথে সমান ভাবে যদি মিশতে পারেন, কথা দিচ্ছি, ভাল লাগবে আপনার।' চারপাশে তাকালো রবিন। 'কই, ভোজের আয়োজন কদ্দূর? যার যা যন্ত্রপাতি, নিয়ে এসো সব... ভোজের আগে খেলা দেখাবে না মেহমানদের?'

ছুটলো সবাই। কেউ ছুটলো হাঁড়ি-চুলোর দিকে, কেউ গেল লাঠি, তলোয়ার বা তীর-ধনুক আনতে। স্যার রিচার্ডকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল রবিন হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের সাথে। 'আপনি জেনে সুখী হবেন, মাননীয় লর্ড বিশপ, আজকের ভোজে আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, লী-র স্যার রিচার্ড উপস্থিত থাকছেন। আপনারা দু'জনই আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি।'

'স্যার রিচার্ড,' ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললেন বিশপ, 'সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক আমরা দুজনই, দুজনেই আজ হেনস্তা হচ্ছি এইসব—' গুণ্ডা-বদমাশ বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে চট করে তাকালেন বিশপ রবিনের মুখের দিকে।

'বলুন, বলুন! যা বলতে যাচ্ছিলেন বলে ফেলুন, বিশপ,' হাসতে হাসতে বললো রবিন। 'শেরউডে আমরা কেউ মুখে লাগাম এঁটে কথা বলি না। বলতে চেয়েছিলেনঃ এইসব চোর-গুণ্ডা-বদমাশদের হাতে, তাই না?'

'ওই রকমেরই কিছু হয়তো বলতে চেয়েছিলাম,' বললেন লর্ড বিশপ। 'কিন্তু, স্যার রিচার্ড, একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না, এই একটু আগে এদের কদর্য রসিকতায় আপনাকে হাসতে দেখেছি আমি। হেসে উঠে এদের আস্কারা না দিয়ে ভ্রূকুটির মাধ্যমে এদের নিরুৎসাহিত করাই আপনার উচিত ছিল বলে আমি মনে করি।'

'আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর উদ্দেশ্যে হাসিনি আমি,' বললেন স্যার রিচার্ড। 'রসিকতা রসিকতাই। এটুকু বলতে পারি, ওই রসিকতা যদি আমাকে কটাক্ষ করে করা হত, তবু আমি হাসতাম।'

একজন এসে গ্রীনউডের নিচে ঘাসের ওপর হরিণের চামড়া বিছিয়ে দিয়ে গেল। খুবই সমাদর করে অতিথিদের বসালো রবিন তার ওপর। নিজেও বসলো। কাছে পিঠেই রইলো দলের হোমরা-চোমরা কয়েকজনঃ লিটল জন, উইল স্কারলেট, মাচ, উইল স্টিউটলি ও অ্যালান-এ-ডেল। ফাঁকা জায়গাটার একেবারে শেষ মাথায় গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হলো একটা মালা, একজনের পর একজন ছুঁড়তে শুরু করলো তীর। এতই আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করলো ওরা সেদিন যে রীতিমত তাজ্জব হয়ে গেলেন স্যার

রিচার্ড আর লর্ড বিশপ। একশো চল্লিশ গজ দুরে ঝোলানো মাত্র নয় ইঞ্চি ব্যাসের একটা মালার বৃত্ত লক্ষ্য করে তিনটে করে তীর ছুড়লো এতজন মানুষ, অথচ মাত্র দুটো তীর লাগলো মালার বাইরে, বাকি সবগুলো লক্ষ্যভেদ করলো। ইতিমধ্যেই গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টায় দুই অতিথির বেদনা ও বিরক্তি যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে রবিন। ছেলেমানুষের মত হাততালি দিয়ে উঠছেন লর্ড বিশপ, হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হাসছেন স্যার রিচার্ড।

'জীবনে এমন আশ্চর্য শূটিং দেখিনি আমি,' বললেন হেরিফোর্ডের বিশপ। 'কিন্তু রবিন, শুনেছি, তোমার নাকি তুলনা হয় না। দেখাবে নাকি এক হাত?'

'আঁধার হয়ে আসছে,' বললো রবিন, 'অস্পষ্ট হয়ে আসছে সবকিছু। ঠিক আছে, তবু দেখি চেষ্টা করে কি করতে পারি।'

উঠে দাঁড়ালো রবিন, কোমর থেকে ছোরাটা বের করে ছোট্ট একটা হেজেলের শাখা কেটে বাকল ছাড়াতে শুরু করলো। বুড়ো আঙুলের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হবে ছড়িটা। সেটা হাতে নিয়ে মাপা পদক্ষেপে হেঁটে চলে গেল আশি গজ দূরে। ওখানে ছড়িটা মাটিতে পুঁতে দিয়ে ফিরে আসতেই ইউ গাছের ডাল দিয়ে তৈরি রবিনের বিশাল ধনুকটা এগিয়ে দিল অ্যালান-এ-ডেল। বাঁকা করে ছিলা পরিয়ে নিল রবিন ধনুকটায়, তারপর তূণ থেকে সবক'টা তীর মাটিতে নামিয়ে বেছে বেছে বের করলো একটা পছন্দসই তীর। ধনুকে তীর যোজনা করে বাম পা সামনে বাড়িয়ে তৈরি হলো সে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই, কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই, গাছ থেকে পাতা পড়লেও আওয়াজ শোনা যাবে এখন। ধনুক ধরা বাম হাতটা সোজা করছে রবিন, সেইসাথে ডান হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তীর বাধানো ছিলাটা কানের পাশে। একটা শ্বাস নিতে যতটা সময় লাগে তার চেয়েও কম সময় নিল রবিন লক্ষ্যস্থির করতে। টংকার ধ্বনির সাথে সাথেই ছুটলো তীর। এতই দ্রুত, যে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা গেল না ওটাকে। তীরের পিছু পিছু ছুটলো দৌড়বাজ উইল স্কেদলক, মাটি থেকে উপড়ে তুলে নিয়ে এলো হেজেল-কাঠিটা। আশ্চর্য! কাঠির গায়ে বিঁধে রয়েছে তীরটা। প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি উঠলো দর্শকদের মধ্যে। যারা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিল, ছুটে এলো তারাও। যোগ্য নেতার বিস্ময়কর নৈপুণ্যে গর্বে ফুলে উঠেছে সবার বুক।

কাউকে প্রশংসার কোন সুযোগ না দিয়ে বসে পড়লো রবিন, লাঠি খেলা শুরু করবার নির্দেশ দিল। লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো কয়েকজন। স্থান-কাল ভুলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন লর্ড বিশপ তুমুল লড়াই দেখে। এইভাবে সন্ধ্যা পেরিয়ে ঘনিয়ে এলো শেরউড জঙ্গলের আশ্চর্য সুন্দর রাত।

হার্পে সুর বেঁধে নিল এবার অ্যালান-এ-ডেল। ওর অপূর্ব কণ্ঠের গান শুনে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো শ্রোতাদের। একে একে কয়েকটা গান গাইলো সে—ভালবাসার, যুদ্ধের, মহিমার, দুঃখের। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। এত সুন্দর গান কে গায় দেখার জন্যেই যেন মস্ত এক রূপালী চাঁদ উঠলো আকাশে। চিক চিক করছে এখন গাছের পাতাগুলো। মিষ্টি বাজনা, ভাবগম্ভীর গানের আবেগ, রূপালী চাঁদ আর বিশাল ওকের দোলায়িত শাখার ছন্দ মিলে আশ্চর্য এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো শেরউড জঙ্গলে।

অবশেষে দু'জন এসে সংবাদ দিল, খাবার তৈরি। অতিথিদের নিয়ে এগোলো রবিন। ঘাসের উপর সাদা দস্তরখান বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, অনেকগুলো মশাল জ্বেলে আলোকিত করা হয়েছে জায়গাটা, সুস্বাদু খাবারের গন্ধে জিভে জল এসে গেল সবার। বসে পড়লো সবাই—হৈ-চৈ আর হাসি-গল্পের সাথে সাথে চললো রসনাতৃপ্তি। খাওয়া শেষ হতেই এলো টলটলে এল-ভর্তি মদের পাত্র। এমনি সময়ে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল রবিন। চুপ হয়ে গেল সবাই।

'একটা গল্প শোনাতে চাই আমি তোমাদের সবাইকে,' শুরু করলো রবিন। বেশি

বাগাড়ম্বর না করে সংক্ষেপে স্যার রিচার্ডের দুর্ভাগ্যের কথা জানালো সে সবাইকে। সামান্য টাকার বিনিময়ে এত বিরাট জমিদারী ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে শুনে কঠোর হয়ে গেল রবিনের সমস্ত অনুচরের মুখ। কিন্তু বিশপের মুখটা বিবর্ণ হয়ে আসছে ক্রমেই, মদের পাত্রে চুমুক দিতেও ভুলে গেছেন, এই কাহিনীর অন্তরালে বিপদের আভাস টের পাচ্ছেন যেন তিনি। ঠিকই আঁচ করেছিলেন বিশপ, কাহিনী শেষ করে রবিন ফিরলো তাঁর দিকে। বললো, 'আপনার কি মনে হয়, লর্ড বিশপ? এটা ঘটতে দেয়া কি উচিত হবে? সমাজের এত উঁচু আসনে অবস্থান আপনাদের, সেখান থেকে আপনাদেরই একজনকে নেমে গিয়ে মাথা নত করে অন্যের গলগ্রহ হতে হচ্ছে, সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারী হতে হচ্ছে, একজন ধার্মিক খ্রিস্টান হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য?'

কোন জবাব দিলেন না বিশপ, ভাবুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাটির দিকে।

'গোটা ইংল্যাণ্ডে আপনিই সবচেয়ে ধনী বিশপ,' আবার বললো রবিন। 'আপনি কি পারেন না এই বিপদগ্রস্ত নাইটের এমন দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে?'

তবু কোন জবাব দিলেন না বিশপ।

এবার লিটল জনের দিকে ফিরলো রবিন। 'তুমি আর উইল স্টিউটলি গিয়ে মাল-টানা ঘোড়া পাঁচটাকে নিয়ে এসো এখানে।' আলো যেখানটায় সবচেয়ে বেশি সেখান থেকে দস্তরখান সরিয়ে জায়গা করে দিল সবাই, ঘোড়া পাঁচটাকে নিয়ে ফিরে এলো লিটল জন আর উইল স্টিউটলি। হাঁক ছাড়লো রবিন, 'মালপত্রের তালিকা কার কাছে?'

কালো পোশাক পরা তিনজন সন্ন্যাসীর মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি ভয়ে ভয়ে বললো, 'আমার কাছে আছে। দয়া করে আমাকে মারধোর করবেন না।'

'না, ফাদার, কোন ভয় নেই,' আশ্বাস দিল রবিন। 'নিরীহ মানুষের কোন ক্ষতি করি না আমি কখনও। তালিকাটা দিন আমার হাতে।' সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মালের তালিকা নিয়ে উইল স্কারলেটের দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে।

'পড়ো দেখি এক এক করে।'

শুরু করলো উইল স্কারলেটঃ

'তিন বেল সিল্ক, অ্যাংকাস্টারের টেক্সটাইল ডিলার কুয়েন্টিনের জন্যে।'

'এটা ছোঁবো না আমরা,' বললো রবিন। 'আমরা জানি সৎপথে নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে সে।' কাজেই না খুলে সিল্কের গাঁট তিনটে সরিয়ে রাখা হলো একপাশে।

'বিউমন্টের অ্যাবির জন্যে এক বেল সিল্ক মখমল।'

'সিল্ক মখমল দিয়ে কি করবে পুরোহিতরা?' নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করলো রবিন। উত্তর দিল নিজেই, 'ঠিক আছে, যদিও ওদের কাজে লাগছে না এসব, তবু সবটা নেব না আমরা। তিন ভাগ করে ফেল, একভাগ বিক্রি করে টাকাটা দান করা হবে গরীব-দুঃখীদের, এক ভাগ রাখবো আমরা, বাকি ভাগটা নিয়ে যা খুশি করুকগে যাক অ্যাবির সন্ন্যাসীরা।' কথা মত তিন ভাগ করে দু'ভাগ সরিয়ে রাখা হলো আলাদা জায়গায়, বাকি একভাগ রাখা হলো সিল্কের গাঁটের পাশে।

'দুই কুড়ি মোমবাতি, সেন্ট টমাসের উপাসনা ঘরের জন্যে।'

'ওগুলো ওদেরই দরকার, যেমন আছে রেখে দাও কুয়েন্টিনের সিল্কের পাশে।'

এইভাবে একের পর এক পড়ে যেতে থাকলো উইল স্কারলেট, একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যেতে থাকলো রবিন, সেই মত ভাগ হয়ে যেতে থাকলো সাথে সাথেই। কোন জিনিস স্পর্শ করলো না রবিন, কিন্তু বেশির ভাগই বস্তা খুলে তিনভাগ করা হলোঃ দানের জন্যে, নিজেদের জন্যে এবং মালিকের জন্যে। সিল্ক, মখমল, সোনার কারুকাজ করা কাপড়, দামী মদ, আরো কত কি—প্রায় ভর্তি হয়ে এলো ফাঁকা জায়গাটা। এবার তালিকার সর্বশেষ আইটেম ঘোষণা করা হলোঃ

'হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের একটি বাক্স।'

ঘোষণা শুনে কেঁপে উঠল বিশপের অন্তরাত্মা। বাক্সটার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু অবাধ্য চোখ আঠার মত লেগে আছে ওটার গায়ে, সরাতে পারছেন না।

'কি আছে এর ভেতর, লর্ড বিশপ?' জানতে চাইলো রবিন।

'মনে নেই,' ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলেন বিশপ।

হাসলো রবিন। 'এর চাবিটা কি আপনার কাছে আছে?'

মাথা নাড়লেন বিশপ। ক্ষীণ আশা ছিল তাঁর মনে, খোলার অসুবিধে দেখে রবিন হয়তো ছোঁবে না বাক্সটা। কিন্তু মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে গেল তাঁর মুখটা রবিনের পরবর্তী নির্দেশ শুনে।

'যাও, উইল স্কারলেট, তলোয়ার নিয়ে এসো একটা,' বললো রবিন। 'তোমার গায়ে তো খুব জোর, দেখি ডালাটা এক কোপে কাটতে পারো কিনা।'

অল্পক্ষণেই ফিরে এলো উইল স্কারলেট মস্ত এক তলোয়ার নিয়ে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কোপ মারলো সে, কিন্তু কাজ হলো না এক কোপে; লোহার পাত দিয়ে মোড়া বাক্সটা খুলতে প্রয়োজন হলো তিন কোপের। ডালাটা তুলতেই চারপাশে উপচে পড়লো একগাদা সোনার মোহর, মশালের লালচে আলোয় ঝলসে উঠলো সেগুলো। মর্মর ধ্বনির মত একটা বিস্মিত গুঞ্জন বেরোলো উপস্থিত সবার কণ্ঠ থেকে, কিন্তু যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো সবাই, এক পা এগোলো না সামনে।

'অ্যালান-এ-ডেল, উইল স্কারলেট আর লিটল জন, তিনজন মিলে গুণে দেখ কত আছে,' নির্দেশ দিল রবিন।

বেশ অনেকক্ষণ লেগে গেল সব টাকা গুণে হিসেব করতে। সব শেষ হতে উইল স্কারলেট ঘোষণা করলো, মোট আছে পনেরশো সোনার গিনি। টাকা গুণতে গিয়ে এক টুকরো কাগজ পেয়েছে সে, তার উপরের লেখাটাও জোরে পড়ে শুনিয়ে দিল সে সবাইকে। সবাই শুনলো এই টাকাগুলো সংগ্রহ হয়েছে হেরিফোর্ড অঞ্চলের জনসাধারণের কাছ থেকে বিশপের আদায়কৃত খাজনা, জরিমানা ও বাজেয়াপ্তির মাধ্যমে।

বিশপের দিকে ফিরলো রবিন হুড। 'মাননীয় লর্ড বিশপ, বাক্সের ভিতর কি আছে তা যখন আপনার মনেই ছিল না, ইচ্ছে করলে আমি আপনার মনে পড়িয়ে না দিলেও পারতাম। আপনার সামনে বাক্সটা না খুললেও চলতো। আসলে আপনাকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বাক্সে যা আছে তার তিন ভাগের এক ভাগ আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। আপনার এবং আপনার লোকজনের আমোদ-প্রমোদ ও ভোজের খরচ বাবদ এক ভাগ রাখছি আমি। বাকি একভাগ যাবে দান খয়রাতে। শুনেছি, জীবনে একটা পয়সা দান করেননি আপনি কাউকে, এবার আপনাকে কিছু পুণ্য কামাই করে দেব আমরা।'

হেঁট হয়ে যাওয়া মাথা উঁচু করলেন বিশপ, কিন্তু কথা বললেন না একটাও। তিন ভাগের একটা ভাগ ফেরত পাচ্ছেন জেনে নিজের ইষ্টদেবতাকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি মনে মনে।

লী-র নাইট স্যার রিচার্ডের দিকে ফিরলো এবার রবিন। 'স্যার রিচার্ড, এক ধর্ম ব্যবসায়ী রক্ত-চোষার খপ্পরে পড়ে সম্পত্তি হারাতে বসেছিলেন আপনি, ওদেরই আর একজনের উপচে পড়া টাকা দিয়ে যদি এমেটের লোভী মোহান্তকে ঠেকানো যায়, তাহলে আমার মনে হচ্ছে বিচারটা ন্যায্য হয়। কি বলেন? এখান থেকে চারশো পাউণ্ড আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি আমরা, মোহান্তের ধার শোধ করে ছাড়িয়ে নিন আপনার সম্পত্তি।'

থ হয়ে রবিন হুডের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্যার রিচার্ড অনেকক্ষণ, যেন কি

বললো রবিন বুঝতে পারেননি তিনি, তারপর ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এলো তাঁর চোখের দৃষ্টি। বললেন, 'তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, রবিন, জানি না। তোমার মহৎ মনের পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কিছু মনে করো না, ভাই, তোমার দান আমি গ্রহণ করতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীকে আত্মীয়-স্বজনের দয়া দাক্ষিণ্যের অবমাননা থেকে রক্ষা করতে আমি আরেকজনের দান গ্রহণ করতে পারি না। ভালবাসার দান হলেও না। তবে যদি ধার হিসেবে দাও, নিতে পারি। ঠিক এক বছর এক দিনের দিন ফেরত দেব আমি এই টাকা—হয় তোমার কাছে, নয়তো হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের কাছে।'

'বেশ,' হাসলো রবিন, 'ধার হিসেবেই নাহয় নেবেন। কিন্তু বিশপকে ফেরত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার হাতে দেবেন, আমি বিলিয়ে দেব গরীব-দুঃখীর মধ্যে।'

রবিনের নির্দেশে একটা চামড়ার থলিতে ভরা হলো চারশো পাউণ্ড স্যার রিচার্ডের জন্যে।

উঠে দাঁড়ালেন স্যার রিচার্ড। 'এবার আমাকে উঠতে হয়, রবিন। বেশি দেরি দেখলে উদ্বিগ্ন হবেন আমার স্ত্রী।'

সবাই উঠে দাঁড়ালো স্যার রিচার্ডের সম্মানে। রবিন বললো, 'কিন্তু আপনাকে তো এভাবে একা ছেড়ে দেয়া যায় না, স্যার রিচার্ড। পথ হারিয়ে ফেলবেন জঙ্গলে।'

এগিয়ে এলো লিটল জন। 'অনুমতি দিলে সাজ-পোশাক পরা বিশজন লোক নিয়ে আমি এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি ওঁকে।'

'ঠিকই বলেছো, লিটল জন,' বললো রবিন, 'যুদ্ধের পোশাক পরে নিতে বলো বিশজনকে। উপযুক্ত সম্মানের সাথে এগিয়ে দিয়ে এসো স্যার নাইটকে।'

এগিয়ে এলো উইল স্কারলেট। 'গলায় সোনার চেন আর পায়ের গোড়ালিতে সোনার স্পার ছাড়া ঠিক মানাচ্ছে না স্যার রিচার্ডকে, ওগুলো হলে ঠিক নাইটের মতই লাগতো দেখতে।'

'ঠিকই বলেছো, উইল স্কারলেট,' বললো রবিন, 'সোনার চেন আর সোনার স্পার দিয়ে সাজিয়ে দাও স্যার নাইটকে।'

এগিয়ে এলো উইল স্টিউটলি। 'রবিন হুড আর তার প্রিয় অনুচরদের তরফ থেকে স্যার রিচার্ডের স্ত্রীর জন্যে ওই মখমলের গাঁট আর সোনার কারুকাজ করা কাপড়গুলো যদি উপহার হিসেবে যায়, তাহলে কেমন হয়?'

এই প্রস্তাবে সবাই খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো। রবিন বললো, 'ঠিকই বলেছো, উইল স্টিউটলি। তাই করো।'

এই প্রাণঢালা ভালোবাসার বহর দেখে বাক রুদ্ধ হয়ে গেল স্যার রিচার্ডের। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চারপাশে সবার মুখের দিকে চাইলেন তিনি, তারপর অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা দেখে নিয়ো, বন্ধুগণ, তোমাদের এই ভালবাসা আর কৃপার কথা কোনদিন ভুলবে না লী-র স্যার রিচার্ড। তোমাদের জন্যে আজ থেকে আমার দুর্গ-তোরণ খোলা রইলো। যদি কোনদিন কোন প্রয়োজন পড়ে, কিংবা কোন বিপদ হয়, বিনা দ্বিধায় চলে এসো আমাদের কাছে। আমি বা আমার স্ত্রী বেঁচে থাকতে দুর্গের প্রতিটা দেয়াল গুঁড়িয়ে না দিয়ে কেউ তোমাদের গায়ে হাত তুলতে পারবে না। আমাকে তোমরা…আমি তোমাদের—' আর কিছু বলতে পারলেন না তিনি, চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন একপাশে।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লাইন করে দাঁড়ালো বিশজন অনুচর লিটল জনের পিছনে। রবিন হুড এগিয়ে এসে একটা সোনার চেন পরিয়ে দিল স্যার রিচার্ডের গলায়।

ইতিমধ্যেই সোনার স্পার এঁটে দিয়েছে উইল স্কারলেট তাঁর পায়ের গোড়ালিতে। ঘোড়াটা নিয়ে এলো লিটল জন, তাতে উঠে বসলেন নাইট। কিছুক্ষণ রবিনের দিকে চেয়ে রইলেন স্যার রিচার্ড, তারপর হঠাৎ ঝুঁকে চুমো খেলেন তার গালে। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা, মশালের আলোয় ঝকঝক করছে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলাগুলো, চমৎকার দেখাচ্ছে। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা।

'আমারও উঠতে হয়,' বললেন হেরিফোর্ডের বিশপ। 'রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক।'

একটা হাত রাখলো রবিন বিশপের বাহুতে। 'অত তাড়াহুড়ো করবেন না, লর্ড বিশপ,' বললো সে। 'এমেটের মোহান্তের কাছ থেকে স্যার রিচার্ড বন্ধক ছাড়িয়ে নেয়ার আগে আপনাকে আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। আপনার তরফ থেকে কোন গোলমালে পড়ুক স্যার রিচার্ড তা চাই না বলেই তিনটে দিন আমাদের সাথে থাকছেন আপনি। শুনেছি, শিকারের খুব শখ আপনার; দেখবেন, চোখের পলকে কেটে যাবে তিন দিন। তিনটে দিন মহানন্দে কাটিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় রীতিমত খারাপই লাগবে আপনার।'

রবিনের কথাই সত্য হলো। মন খারাপ হয়ে গেল বিশপের এই মজার জীবন ছেড়ে আবার কাজকর্মের মধ্যে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে। কিন্তু সেটা সাময়িক, বিরক্তির ভাবটাই প্রকট হয়ে রইলো তাঁর মনে। অবশিষ্ট মালপত্র সহ রওনা হয়ে গেলেন তিনি। একদল লোক দিল রবিন সাথে, যেন আর কোন ডাকাতের পাল্লায় পড়ে এটুকুও খোয়া না যায়।

যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করলেন বিশপ মনে মনেঃ একদিন সুযোগ পাবই, রবিন, কড়ায় গণ্ডায় শোধ তুলে নেব সেদিন। তুমি এখনও চেনোনি আমাকে!

তেরো

সুন্দরী মেরিয়ান

মাঝে মাঝেই মন খারাপ হয়ে যায় রবিনের।

দলবল নিয়ে রোমাঞ্চ আর আনন্দের মাঝে বেশ আছে সে শেরউড জঙ্গলে, কারো তোয়াক্কা রাখতে হয় না, কাউকে পরোয়া করতে হয় না; যা খুশি করছে, যেমন খুশি চলছে; কিন্তু তবু কি যেন অপূর্ণ রয়ে গেছে তার জীবনে, মনে হয় কী হলে যেন আরও ভাল হতো। মনটা ছেয়ে যায় বিষাদে।

এই রকম দুর্বল মুহূর্তে একজনের মুখের ছবি বার বার ভেসে ওঠে ওর মনের পর্দায়। একটি মেয়ে। সেই ছেলেবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছে ওরা। পাশের বাড়ির একজন সৎ লোকের একমাত্র মেয়ে, সুন্দরী মেরিয়ান। গভীর বন্ধুত্ব ছিল ওদের দু'জনে সেই শৈশব থেকে কৈশোর ছাড়িয়ে তারুণ্য পর্যন্ত। একসাথে খেলেছে, পাখির বাসা খুঁজেছে, ছিপ ফেলেছে ঝর্ণার জলে, গাছে উঠেছে, দৌড়ের পাল্লা ধরেছে বড় বড় ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ ময়দানে। বিশেষ করে মনে পড়ে ওর তারুণ্যের সেই সব দিনের কথা, যখন হঠাৎ ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে কেমন যেন লাল হয়ে উঠেছে দু'জনের মুখ।

তারপর তো জঙ্গল রক্ষীদের চক্রান্তে দস্যু হয়ে গেল রবিন হুড। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দু'জনের। সেই থেকে আর দেখা হয়নি ওদের। একজন দস্যু হিসেবে মেরিয়ানের বা তার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস হয়নি ওর কোনদিন। বার বার শয়নে স্বপনে ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে মেরিয়ানের অপূর্ব সুন্দর মুখটা, মাথা ঝাঁকিয়ে

সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে ভাবনাটা। নাহ্, সে-সুখ নেই ওর কপালে।

এদিকে রবিনের চলে যাওয়ার পর একে একে অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে মেরিয়ানের জীবনেও। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে অবস্থার। বাবা-মা মারা গেছেন, আত্মীয়স্বজনের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাচ্ছে প্রতিপদে, এসেছে যৌবন, সেই সাথে পাড়া-প্রতিবেশীদের সুযোগ গ্রহণের অপচেষ্টা। বার বার মনে পড়ে ওর রবিনের কথা, সেই দুর্দান্ত সাহসী ছেলেটা, যার হাতে প্রাণ-মন সঁপে দিয়েছিল সে কৈশোরে, ও থাকলে আজ কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারতো না, ওর এই দুরবস্থা দেখে কিছু একটা ব্যবস্থা করতোই। কিন্তু হঠাৎ একদিন কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা। সেই যে গেল, আর কোন খবরই পাওয়া গেল না রবিনের।

ইদানীং কিছুদিন ধরে দস্যু রবিন হুডের কথা শোনা যাচ্ছে লোকের মুখে মুখে। ওর বীরত্ব ও কীর্তি-কাহিনীর কথা গান বেঁধে গাইছে চারণেরা, সন্ধ্যায় উনুনের ধারে বসে আলাপ করছে মানুষ। রবিন হুডের মহত্ত্ব আর দুঃসাহসের গল্প শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারলো মেরিয়ান যে এ লোক আর কেউ নয়, ওর শৈশবের বন্ধু—সেই রবিন। মনে মনে স্থির করে ফেললো, এই নির্বান্ধব, দুঃসহ পরিবেশ ত্যাগ করে শেরউডে গিয়ে খুঁজে বের করবে সে রবিনকে, দেখবে এখনও ওকে মনে রেখেছে কিনা সে। কিন্তু কাজটা একজন মহিলার, বিশেষ করে যুবতীর জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাই অনেক ভেবেচিন্তে ছদ্মবেশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল সে। একদিন বালক-ভৃত্যের উর্দি পরে তীর-ধনুক আর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে রবিনের খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেল, তবু থামলো না।

শেরউডে পৌঁছে বিশাল ওকের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছে আর চারপাশে তাকাচ্ছে মেরিয়ান, কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করবে কোন্দিকে রবিন হুডের আস্তানা।

এদিকে সেদিনই সকালে আস্তানা ছেড়ে ছদ্মবেশে বেরিয়েছে রবিন হুড খবর সংগ্রহের জন্যে। শোনা যাচ্ছে হেরিফোর্ডের বিশপ নাকি নটিংহামে পৌঁছে কড়া শাসানী দিয়েছেন শেরিফকে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আশু উন্নতি করতে না পারলে স্বয়ং রাজার কানে তুলবেন তিনি রবিন হুডের বাড়াবাড়ি এবং শেরিফের অক্ষমতার কথা। এ ব্যাপারে শেরিফ কি করতে যাচ্ছেন সেটা আগেভাগেই ওর জানা দরকার, তাই এক চোখে একটা ঠুলি বেঁধে নিয়ে অসংখ্য তালি দেয়া ভিখারীর পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে সে, মাথায় পরেছে বড়সড় একখানা তোবড়ানো টুপি—সামনের দিকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে টুপিটা, যাতে সহজে চেনা না যায়।

ঘন্টাখানেক চলার পর ছিমছাম, সুন্দর চেহারার এক বালক-ভৃত্যকে দেখতে পেল সে; জঙ্গল-পথ ধরে সোজা হেঁটে আসছে ওর দিকে। একলাফে রাস্তা থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো রবিন। কে ছেলেটা, কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে জানা দরকার। কিন্তু তার আগে জানা দরকার ছোকরা একা কিনা। এতদিনে বহু লোকের শত্রুতা অর্জন করেছে সে, এটা তাদেরই কারো ফাঁদ হওয়া বিচিত্র নয়। আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখলো সে ছেলেটার ওপর। নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে ছেলেটা। বোঝা যাচ্ছে সাথে আর কোন লোক নেই। কাছাকাছি আসতেই এক লাফে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো রবিন, কর্কশ কণ্ঠে হুকুম করলো থামার জন্যে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ছেলেটা। জিজ্ঞেস করলো রবিন, 'কে তুমি? কি চাও তুমি শেরউডে?'

ছেলেটা আসলে ছদ্মবেশী মেরিয়ান। দারুণ ভয় পেয়েছে সে ভিতরে ভিতরে ডাকাতের মত লোকটাকে দেখে, কিন্তু মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে খানিকটা, ডান হাতটা চলে এসেছে ওর তরবারীর বাঁটে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, এ লোক রবিনের দলের কেউ হতেই পারে না, এখন দৃঢ়

মনোভাব না দেখালে নাস্তানাবুদ হতে হবে এর হাতে। মুখে বললো, 'খবরদার, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! সরে দাঁড়াও, নইলে বাধ্য হবো তলোয়ার বের করতে। কে আমি, কি চাই সেটা তোমার না জানলেও চলবে।'

'চলবে না,' এপাশ ওপাশ মাথা দোলালো রবিন। 'হয় আমাকে বলবে কোথায় কেন চলেছো, নয়তো এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে তোমাকে যে-পথে এসেছো সেই পথে।'

'ফিরে যেতে হবে?' ভুরু কুঁচকে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করার চেষ্টা করলো মেরিয়ান। 'ফেরাও দেখি কতবড় সাধ্য তোমার!'

'বাহ্! দারুণ বীর মনে হচ্ছে, ছোকরা!' হাসলো রবিন। 'ওই খেলনা তলোয়ার দেখিয়ে কাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছো তুমি? আমি কি এখনো তোমার মত দুধের বাচ্চা রয়েছি নাকি হে?'

'এই খেলনার ধারই সহ্য করা মুশকিল হয়ে যাবে তোমার পক্ষে,' বলেই সড়াৎ করে টান দিয়ে বের করে আনলো মেরিয়ান তলোয়ারটা। 'পথ ছাড়ো, নইলে কপালে খারাবি আছে আজ তোমার!'

'কোথায় যাচ্ছো বলবে না?'

'না। যেমন করে পারি জঙ্গলের মাঝখানে পৌঁছতেই হবে আমার।'

সন্দেহ আরও বেড়ে গেল রবিনের। স্পাই নয় তো? আমার আস্তানার খবর নিতে পাঠিয়েছে হয়তো একে শেরিফ। সিদ্ধান্ত নিল, কিছুতেই একে আর এক পা সামনে বাড়তে দেয়া উচিত হবে না। বললো, 'আমি বারণ করছি তোমাকে। ভালো চাও তো মানে মানে ফিরে যাও, নইলে আমিও বাধ্য হবো তলোয়ার বের করতে।'

'বের করো না,' বললো মেরিয়ান। 'কিছু দিয়েই ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

মস্ত একখানা তলোয়ার বের করলেই ছোকরা ঘাবড়ে যাবে, এই ভেবে এক টানে বের করলো রবিন ওর বিশাল ক্ষুরধার তরবারী, তারপর ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো সামনে। কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালো না ছেলেটা, ঝনাৎ করে ঠেকিয়ে দিল প্রথম আক্রমণ। অবাক হলো রবিন পরিচারকের পারদর্শিতা দেখে। সমানে সমান লড়ে চলেছে সে সাহসের সাথে।

ঝন ঝন আওয়াজ হচ্ছে তরবারীর ঠোকাঠুকিতে। নিজের পুরো শক্তি বা কৌশল প্রয়োগ করছে না রবিন, একটা কচি ছেলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাতে মন সায় দিচ্ছে না। ফলে অনেকক্ষণ ধরে চললো লড়াই। একবার অরক্ষিত অবস্থায় বেকায়দায় পড়ে গেল রবিন, সামান্য একটু কেটে গেল ওর গাল। মনে মনে প্রশংসা করলো সে ছেলেটার সাহস ও নৈপুণ্যের, শান্তিপূর্ণ একটা মীমাংসায় আসার জন্যে একটা হাত তুলে থামতে বললো ওকে।

'দাঁড়াও। নিজের পরিচয় দেবে না তুমি, ফিরেও যাবে না, কেন কোথায় চলেছো তাও বলবে না—বুঝলাম, এবার অন্য একটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি ঃ আমি তোমার সাথে গেলে কোন আপত্তি আছে?'

'নেই, যদি তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারো রবিন হুডের আস্তানায়,' জবাব দিল ছেলেটা।

'রবিন হুডের আস্তানায়!' অবাক হয়ে গেল রবিন। 'রবিন হুডের কাছে চলেছো তুমি?'

'হ্যাঁ। পারবে তুমি আমাকে ওর কাছে নিয়ে যেতে?' আকুল আবেদন ফুটে উঠলো ছেলেটার কণ্ঠে।

'পারবো,' বললো রবিন, 'কিন্তু ওর কোন ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না। তোমার উদ্দেশ্য জানতে না পারলে কি করে তোমাকে নিয়ে যাই তার কাছে, বলো?'

'তুমি রবিন হুডের লোক?' জিজ্ঞেস করলো ছেলেটা।

'খুবই প্রিয় লোক,' জবাব দিল রবিন। 'আমি তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'ওহ্! তাই নাকি?' দুঃখ প্রকাশ পেল ছেলেটির কণ্ঠে। 'তাহলে তো ভারি অন্যায় হয়ে গেছে! আগেই পরিচয় দাওনি কেন? তোমার গাল কেটে যাওয়ায় আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'ও কিছু না,' বললো রবিন। 'কিন্তু এখনও তুমি বলোনি কেন দেখা করতে চলেছো রবিন হুডের সাথে।'

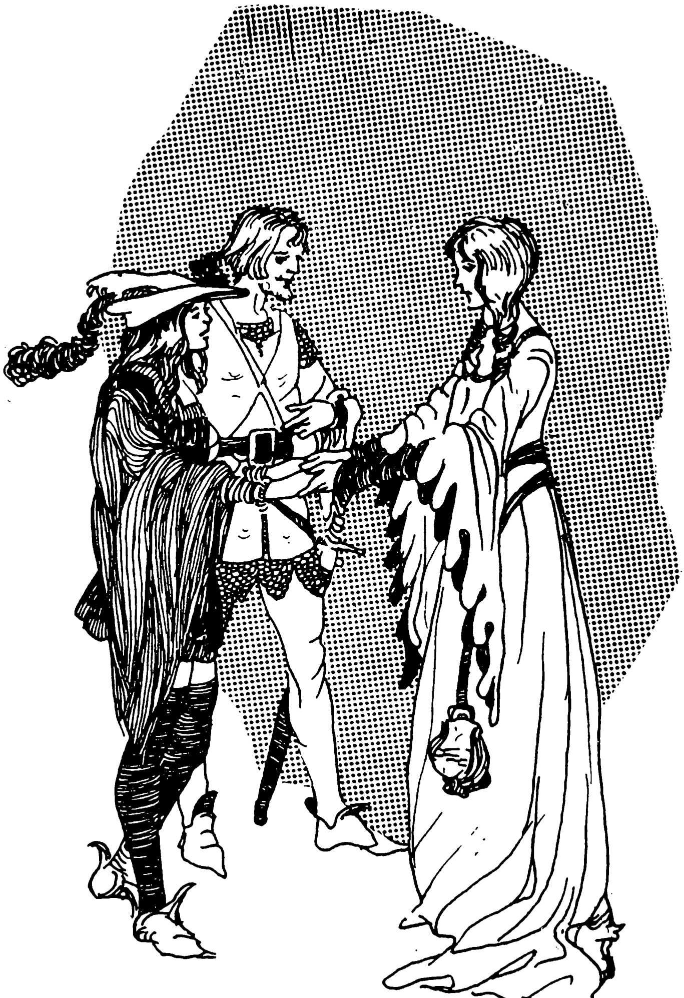

ধীরে ধীরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো মেরিয়ানের গাল দুটো। চোখের দৃষ্টি নেমে গেল মাটির দিকে। মৃদুকণ্ঠে বললো, 'আমি ওকে ভালবাসি।'

'তুমি ওকে ভালবাসো!' কপালের মাঝামাঝি জায়গায় উঠে গেল রবিনের ভুরুজোড়া, ছানাবড়া হয়ে গেছে দুই চোখ। 'তুমি…'

'ছেলের ছদ্মবেশে আছি,' বললো মেরিয়ান। 'আসলে আমি মেয়ে। সেই ছোটবেলা থেকে ভালবাসি আমি ওকে। একসাথে খেলেছি, একসাথে বড় হয়েছি আমরা। তোমার কাছে আমার অনুরোধ থাকলো, আমার গোপন কথাটা ওকে বলে দিয়ো না। আমি দেখতে এসেছি এখনও আমাকে ওর মনে আছে কিনা, এখনও ও আমাকে ভালবাসে কিনা। যদি দেখি ও আমাকে ভুলে গেছে, তাহলে চুপচাপ সরে পড়বো আমি, পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে ওর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চাপবো না। আমাকে নিয়ে যাবে তুমি ওর কাছে?'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রাইলো রবিন মেরিয়ানের মুখের দিকে। চিনতে পারলো অবশেষে। দুকূল ছাপিয়ে বন্যার মত ভিড় করে আসতে চইছে ওর মনের মধ্যে অসংখ্য স্মৃতি। কিন্তু সামলে নিল সে নিজেকে। মৃদু হেসে বললো, 'বেশ, তোমার গোপন কথাটা ওকে বলে দেব না। চলো রওনা হয়ে যাই।'

হাঁটতে হাঁটতে একটা ঝর্ণার পাশে পৌঁছে থেমে দাঁড়ালো রবিন। বললো, 'এসো, এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেয়া যাক।'

বসলো ওরা। ঝর্ণার কুলকুল, পাখির গান, রোদ আর এলোমেলো হাওয়া আজ অদ্ভুত ভাল লাগছে রবিনের; বিশাল ওকের গুঁড়ি, ঝোপ-ঝাড়, ঘাস, পাতা যা চোখে পড়ছে সবই মনে হচ্ছে অপূর্ব সুন্দর। ঘুরেফিরে মেরিয়ানের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর স্থির হতে চাইছে ওর দৃষ্টিটা বার বার। খুক খুক করে একটু কেশে নিয়ে বললো, 'তুমি যখন তোমার মনের কথা আমাকে বললে, আমারটাও তোমাকে বলা উচিত। আমিও একটা মেয়েকে ভালবাসি। সেই ছোটবেলা থেকে। ওকে ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই ভাল লাগে না আমার। একসাথে খেলেছি, পাখির বাসা পেড়েছি, ঝর্ণার ধারে মাছ ধরেছি, মস্ত মাঠে দৌড়ে উধাও হয়ে গিয়েছি দু'জন হাত ধরাধরি করে। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল ওদের বাড়ি। ওর বাবা ছিলেন এক মস্ত ধার্মিক, মহৎ মানুষ। ফুলের মত কোমল ছিল মেয়েটির মন, গোলাপের মত ছিল ওর মুখটা। এত সৌন্দর্য আর কোথাও খুঁজে পাইনি আমি। আজও চোখ বুজলেই দেখতে পাই আমি ওকে পরিষ্কার।'

'মিলন হয়নি?' জানতে চাইলো মেরিয়ান। 'ওকে বিয়ে করোনি কেন?'

'ওকে যে ভালবাসি একথা জানাবার আগেই তো হঠাৎ করে দস্যু হয়ে যেতে হলো আমাকে। যদি আমাকে ফিরিয়ে দেয়, এই ভয়ে আর আমি যেতে পারিনি ওর কাছে।'

'কিন্তু যাওয়া উচিত ছিল,' বললো মেরিয়ান। 'হয়তো মেয়েটা এখনও অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে, আমি যেমন অপেক্ষা করেছি রবিনের জন্যে। মেয়েটার জন্যে বড় দুঃখ হচ্ছে আমার।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন ভরসা দিচ্ছো, যাব আমি। কিন্তু তোমার কাছে অনুরোধ থাকলো, ওকে আবার বলে দিয়ো না। আজও ওকে ছাড়া আর কাউকে ভাল লাগে না আমার, কত বিনিদ্র রাত যে আমার কেটেছে ওর কথা ভেবে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। ভেবেছি, ওকে পেলে জীবনটা পরিপূর্ণ হয়ে যেতো আমার।'

'হিংসে লাগছে মেয়েটার কপাল দেখে। কি নাম ওর?'

'ওর নাম মেরিয়ান।'

'আশ্চর্য! আমার নামও তো মেরিয়ান!'

'আর আমার নাম রবিন হুড।'

এবার কপালে চোখ ওঠার পালা মেরিয়ানের। চোখের ঠুলি খুলে ফেললো রবিন, টুপিটা নামালো মাথা থেকে।

পরিষ্কার চিনতে পারলো এবার ওকে মেরিয়ান। উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকে।

'রবিন! আমার রবিন!'

'আমার মেরিয়ান!' হাসলো রবিন, 'কথা দিচ্ছি, তোমার গোপন কথা জানিয়ে দেব না রবিনকে।'

'পাজি কোথাকার!' কিল দিল মেরিয়ান রবিনের পিঠে। 'তোমার কথাও আমি জানি!'

সুখ-দুঃখের অনেক কথা হলো দুই বন্ধুতে। তারপর উঠে দাঁড়ালো রবিন। 'চলো, তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই সবার সাথে।'

আস্তানায় ফিরে অ্যালান-এ-ডেলের স্ত্রী এলেনের হাতে ছেড়ে দিল রবিন মেরিয়ানকে। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো ওকে এলেন। সন্ধের সময় সবাই যখন ফিরলো ডেরায়, এলেনের পোশাক পরা মেরিয়ানকে নিয়ে গেল রবিন দলের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। পরিচয় পর্ব শেষ হতেই বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে হেলে-দুলে সামনে এসে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী টাক। 'তৈরি হয়ে নাও, বৎস! শুভস্য শীঘ্রম!'

'তার মানে?' অবাক হলো রবিন।

'মানে আর কিছুই নয়, তোমাদের বিয়েটা আজই পড়িয়ে দিতে চাই। কতদিন আর বাঁচবো বলো? দেখছো না, কত শুকিয়ে গেছি! ভোজের সংখ্যা যেমন দিন দিন কমে আসছে, না খেয়েই মারা যাবে এই সন্ন্যাসী বেচারা। বিয়ের ছুতোয় একটা যদি ভোজ-টোজ...'

লিটল জন আর উইল স্কারলেট ছুটলো হরিণ মেরে আনতে, জনা দশেক অনুচর লেগে গেল মস্ত এক ভোজের আয়োজনে, হৈ-চৈ পড়ে গেল গোটা দলের মধ্যে, এক বাক্যে সায় দিল সবাই সন্ন্যাসী টাকের প্রস্তাবে।

মহা ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়ে গেল রবিনের সাথে মেরিয়ানের। আমোদ-ফূর্তি, গান-বাজনা, গল্প-হাসি-তামাশা, হরিণের মাংস দিয়ে ভুরিভোজন চললো অনেক রাত পর্যন্ত; সেই সাথে চললো গ্লাসের পর গ্লাস অকটোবর এল। মস্ত চাঁদটা পশ্চিম আকাশে হেলে না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতে গেল না কেউ।

এইভাবে বরণ করে নিল ওরা সুন্দরী মেরিয়ানকে শেরউডের রানী হিসেবে।

চোদ্দ

ঋণ পরিশোধ

ঠিক এক বছর একদিনের দিন রবিন হুডের ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন স্যার রিচার্ড অফ লী।

আগের সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত বিষাদ-মলিন ভাবের লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর এখনকার চেহারা বা চাল চলনে। চমৎকার একটা ঘোড়ায় চেপে আগে আগে চলেছেন তিনি, হাসি খুশি একটা ভাব চোখে-মুখে, পেছনে কয়েকটা মালবাহী ঘোড়া, তার পেছনে একদল সশস্ত্র দেহরক্ষী—বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে দলটা শেরউডের দিকে। এমেটের মোহান্তের কাছ থেকে জমিদারী ছাড়িয়ে নিয়ে একটা বছর প্রচুর পরিশ্রম করে আগের চেয়েও অনেক ভাল অবস্থায় পৌছে গেছেন স্যার রিচার্ড।

প্রচুর ধন-সম্পদ রোজগার হয়েছে, অঢেল প্রাচুর্য এসেছে তাঁর জীবনে, রাজকীয় মহলে বেড়ে গেছে মান-সম্মান। কিন্তু এইসবের মূলে যে লোকটা, যার সময়োচিত সহায্য না পেলে আজ নিঃস্ব পথের ভিখারী হতে হতো তাঁকে, সেই রবিন হুডের কথা সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রেখেছেন তিনি। আজ তার ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট দিন, তাই খুশি মনে চলেছেন শেরউডের উদ্দেশে।

চলতে চলতে নদীর ধারে একটা মস্ত ময়দানে বিরাট এক আনন্দমেলার আয়োজন দেখে সেতু পেরোতে গিয়েও কি মনে করে থামলেন তিনি। হাজার পদের রকমারী মাল দিয়ে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে বসেছে হরেক রকম দোকানী, একদিকে জমে গেছে গানের আসর, অন্যখানে চলছে ম্যাজিক; অসংখ্য লোক গিজগিজ করছে গোটা ময়দান জুড়ে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়েছে কুস্তির মঞ্চে। দামী পুরস্কারের আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক বড় বড় কুস্তিগীর এসেছে এই গ্রাম্য মেলায়। প্রথম পুরস্কারঃ সোনার কারুকাজ করা জিন আর লাগাম পরানো একটা ঘোড়া, দ্বিতীয় পুরস্কারঃ একটা সাদা ষাঁড়, তৃতীয় পুরস্কারঃ সুন্দর এমব্রয়ডারী করা একজোড়া দস্তানা, চতুর্থ পুরস্কারঃ একটা সোনার আংটি, এবং পঞ্চম পুরস্কারঃ এক পিপে মদ। বেলা পড়তে দেরি আছে এখনো, হাতে সময় আছে যথেষ্ট, তাই ঘন্টাখানেক এখানে থেমে কুস্তি দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন স্যার রিচার্ড।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি একজন বিশাল-দেহী কুস্তিগীরের নৈপুণ্য দেখে। কোন প্রতিযোগীই দু'এক মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারছে না তার সামনে। এ-গ্রামের চ্যাম্পিয়ান, ও-এলাকার সেরা কুস্তিগীর, অমুক নামজাদা পালোয়ান একে একে সবাই ঢুকছে রিঙে, প্রবল বিক্রমে লড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু ইয়া-লম্বা সেই লোকটা অল্পক্ষণের মধ্যেই অপূর্ব কায়দায় মাথার ওপর তুলে নিচ্ছে তাদের অনায়াসে, এমন এক আছাড় মারছে যে আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না ওরা।

'কে লোকটা!' বলাবলি করছে লোকজন। 'এমন অদ্ভুত দক্ষতা আর দেখিনি, বাবা! কিসের প্রতিযোগিতা, এই লোকের কাছে অন্যেরা দেখছি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত!'

একের পর এক হার মানছে প্রতিযোগীরা বিশাল দৈত্যের মত লোকটার কাছে, প্রশংসার হর্ষধ্বনি উঠছে দর্শকদের মধ্যে থেকে; কিন্তু কিছুক্ষণ পর প্রশংসার পাশাপাশি একআধটা কঠোর বাক্যও শোনা যেতে লাগলো কারও কারও মুখ থেকে। এইসব মন্তব্য আসছে একদল জঙ্গল-রক্ষীর মুখ থেকে। ওরা রেগে গেছে বিশাল চেহারার লোকটার ওপর, কারণ প্রচুর টাকা বাজি ধরেছে ওরা হিউবার্ট বলে একজন রক্ষীর বিজয়ের আশায়; এই লোকের কাছে যদি হিউবার্টের পরাজয় হয় তাহলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে ওদের। থেকে থেকেই টিটকারী দিচ্ছে ওরা, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও! আগেভাগেই যতো পারো দেখিয়ে নাও বাহাদুরী। আসছে হিউবার্ট, কুস্তি কাকে বলে শিখিয়ে দেবে ও তোমাকে, একটা হাড়ও আস্ত রাখবে না।'

এইসব মন্তব্যে সবাই বরং খুশিই হয়ে উঠলো ভাল একটা প্রতিযোগিতা দেখা যাবে, এই ভেবে। সবাই আশা করছে হিউবার্ট রিঙে এলে জমে যাবে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সত্যিই যখন সে ঢুকলো রিঙে, হতাশ হতে হলো দর্শকবৃন্দকে। প্রথম দিকে একটু দাপাদাপি করলেও কিছুতেই এঁটে উঠতে পারলো না সে দৈত্যটার সাথে, অতি সহজেই মাথার ওপর তুলে নিয়ে প্রচণ্ড এক আছাড় মারলো সে হিউবার্টকে। চারদিকে হাত-পা ছড়িয়ে উইণ্ডমিলের পাখার মত দুই পাক ঘুরে দড়াম করে মাটিতে পড়লো সে চিৎ হয়ে, আর উঠলো না।

'ফাউল হয়েছে!' চিৎকার করে উঠলো জঙ্গল-রক্ষীরা। 'ফাউল ক্যাচ! ফাউল থ্রো! নো থ্রো!'

'না, না!' বলে উঠলেন স্যার রিচার্ড। 'ঠিকই আছে, কোন ফাউল হয়নি! নিয়মের

বাইরে কিচ্ছু করেনি লম্বা লোকটা।'

জঙ্গল-রক্ষীরাও ভাল করেই জানে সেটা, কিন্তু গলাবাজি কমালো না, গোলমাল পাকিয়ে নিজেদের চ্যাম্পিয়ানের মান বাঁচাবার চেষ্টা করছে ওরা, তাছাড়া হেরে যাওয়া বাজির টাকা যাতে দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করছে। রিঙের চারপাশে হৈ-হল্লা বেধে গেল। চিৎকার করছে সবাই, কেউ বিশাল পালোয়ানের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। বিপক্ষেই মন্তব্য হচ্ছে বেশি, কারণ একের পর এক নামজাদা কুস্তিগীরদের পরাজিত করে তাদের সমর্থকদের অসন্তোষের কারণ হয়েছে সে, তাছাড়া স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সমর্থক হিসেবে লোকটার নিজস্ব কেউ নেই এখানে, যারা তাকে সমর্থন করছে তারা শুধু 'ভাল খেলা'র স্বার্থেই করছে তা।

'কোথায় যেন দেখেছি লোকটাকে,' মনে মনে বললেন স্যার রিচার্ড। 'মনে হচ্ছে দেখেছি কোথাও। কিন্তু কোথায়? কোথায় দেখেছি একে?'

একটু চিন্তা করেই হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন স্যার রিচার্ড, এগোলেন সামনের দিকে। মনে পড়েছে তাঁর, এ লোককে দেখেছেন তিনি রবিন হুডের আস্তানায়। হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপকে ধরে এনেছিল এই লোক। এই লোকই রবিনের নির্দেশে চারশো পাউণ্ড গুণে থলিতে তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে। সহজে ভুলে যাওয়ার মত চেহারা নয় লোকটার।

ঠিকই ধরেছেন স্যার রিচার্ড, এই বিশাল দৈত্যের মত পালোয়ান আমাদের লিটল জন ছাড়া আর কেউ নয়। আস্তানা ছেড়ে কাজে বেরিয়েছিল সে, কাজ সেরে ফেরার পথে এই আনন্দমেলার আয়োজন দেখে এবং কুস্তির কথা শুনে লোভ সামলাতে পারেনি। প্রথমে ভেবেছিল খেলাটা দেখবে শুধু, কিন্তু রিঙের ধারে এসেই মনটা কেমন যেন করে উঠলো, তার ওপর পুরস্কারের কথা শুনে নিজেকে আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, গ্লেডের উইল নাম ধারণ করে খাতায় নাম লিখিয়ে নেমে পড়েছে রিঙে, একের পর এক হারিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

'বের করে দাও ওকে রিং থেকে!' হুংকার ছাড়ছে জঙ্গল-রক্ষীরা। 'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফাউল করে আসছে লোকটা। ওকে বের করে দিয়ে আবার শুরু হোক খেলা।'

অনেকেই প্রতিধ্বনি তুললো এই কথার সমর্থনে, কারণ তাহলে তাদের কুস্তিগীর আবার সুযোগ পাবে, কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকেরা প্রবল আপত্তি তুললো, কারণ তাদের মতে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত খেলা খেলেছে লম্বা দৈত্য।

হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেল লিটল জন। রাগের মাথায় উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে কয়েকজন জঙ্গল-রক্ষী উঠে এসেছে রিঙের মধ্যে, এক্ষুণি রিং ছেড়ে বেরিয়ে না গেলে খুন করে ফেলবে। কিন্তু ভুল লোককে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল ওরা, ভয় কাকে বলে জানা নেই লিটল জনের, কোন হুমকির তোয়াক্কা না করে বিশাল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল সে মোকাবিলার জন্যে। মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে লিটল জন, নিদেন পক্ষে ভয়ানক ভাবে জখম হবে, এ কথা বুঝতে পেরে দেহরক্ষীদের নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন স্যার রিচার্ড।

'দাঁড়াও!' হুংকার ছাড়লেন তিনি। 'খবরদার, কেউ হাত তুলবে না এই লোকের গায়ে!'

শেরিফের লোকজন এই কথায় কান দিত না, কিন্তু যখন দেখলো সশস্ত্র দেহরক্ষী রয়েছে স্যার নাইটের সাথে, তার ওপর প্রচুর জন সমর্থন রয়েছে তাঁর পেছনে, যারা এতক্ষণ নীরব ছিল তারাও চিৎকার করছে এখন তাদের বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে, তখন মানে মানে পিছিয়ে গেল।

'আপনাকে আমরা চিনি,' জনতার মধ্যে থেকে অনেকেই চেঁচিয়ে উঠলো স্যার রিচার্ডের উদ্দেশ্যে। 'বিনা দ্বিধায় আস্থা রাখা যায় আপনার ওপর। আপনিই বিচারক

হয়ে মীমাংসা করে দিন, স্যার।'

আরো দুই কদম এগিয়ে এলেন স্যার রিচার্ড। সবাই চুপ করে গেল তাঁর রায় শোনার জন্যে।

'আপনারাই বলুন,' উচ্চকণ্ঠে বললেন স্যার রিচার্ড, 'ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতার সুনাম আছে বিশ্বজোড়া, কিন্তু এ-ই কি তার নমুনা? ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্রোধের কাছে পরাজিত হবে আমাদের খেলোয়াড়ী মনোভাব? প্রত্যেকটি ধরার কৌশল, প্যাঁচ, আছাড় আমি নিজ চোখে দেখেছি, নিয়মের বাইরে কিছুই করেনি এই লোকটা—এ কথা আমি যেমন জানি, আপনারাও ঠিক তেমনি জানেন। যাকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরাজিত করতে পারবো না, রিঙের মধ্যে দাঁড়িয়ে সৎ ভাবে খেলে হারাতে পারবো না, তাকে গলাবাজি করে হটিয়ে দেব মঞ্চ থেকে, নিষ্পাপ খেলাধুলার এই কি নিয়ম?'

কলুষমুক্ত খেলাধুলোর মধ্যে ক্রোধ, স্বার্থপরতা বা অন্যায়ের স্থান নেই এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চুপ হয়ে গেল বিপক্ষের লোকজন। জঙ্গল-রক্ষীরা শুধু নিজেদের মধ্যে গজগজ করতে থাকলো, সশস্ত্র দেহরক্ষী নিয়ে নাইট এসে বাধা না দিলে আজকে বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিত ওরা ঢ্যাঙা দৈত্যের।

বিচারে স্থির হলো, নিঃসন্দেহে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হয়েছে গ্লেডের উইল, পরবর্তী পুরস্কারের জন্যে নিজেদের মধ্যে আবার লড়বে বাকি সবাই। আবার শুরু হলো কুস্তি। শেষও হলো। পুরস্কার বিতরণের পর শেষ-পুরস্কার বিজয়ীর কাছ থেকে পাঁচ মার্ক দিয়ে মদের পিপেটা কিনে নিলেন স্যার রিচার্ড, সাথে সাথেই সেটার মুখ খুলে ঘোষণা করে দেয়া হলো যার যত খুশি মদ খেতে পারে পিপে থেকে। দর্শকরা সবাই খুশি হয়ে উঠলো এই ঘোষণায়, কিন্তু শেরিফের লোকজন মোটেই খুশি হতে পারলো না, মুখ কালো করে হেরে যাওয়া বাজির টাকা শোধ করলো ওরা, ভুরু কুঁচকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে লিটল জনের দিকে।

ঘোড়াটা পরীক্ষা করে দেখছিল লিটল জন, খুবই পছন্দ হয়েছে ওটা ওর, এমনি সময়ে কেমন করে জানি গুজব ছড়িয়ে পড়লো দর্শকদের মধ্যে; চাপা গলায় বলাবলি করছে সবাইঃ আজকের প্রথম পুরস্কার বিজয়ী বিশাল চেহারার কুস্তিগীর আসলে রবিন হুডের লোক। স্যার রিচার্ড ছাড়াও আরো কোনো লোক হয়তো চিনে ফেলেছিল লিটল জনকে। যদিও ছদ্মবেশে রয়েছে সে, শরীরের বিশাল কাঠামো আর চওড়া কাঁধ সে লুকাবে কোথায়?

গুজবটা জঙ্গল-রক্ষীদের কানে আসতেই লাফিয়ে উঠলো ওরা। সত্য না মিথ্যে জানার দরকার নেই, এই সুযোগে গ্রেফতার করতে পারবে ওরা বেয়াড়া কুস্তিগীরকে, আর একবার পাকড়াও করতে পারলে ধরে নিয়ে গিয়ে···

'ডাকাত! ডাকাত! ধরো, ওকে ধরো!' হাঁক ছাড়লো ওরা, একটানে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে ছুটলো ওর দিকে।

চিৎকারটা কানে যেতেই এদিকে ফিরলো লিটল জন, এক মুহূর্তে বুঝে নিল বিপদটা—ধরা পড়লে রক্ষা নেই! লাফ দিয়ে উঠে পড়লো সে ঘোড়ার পিঠে, পায়ের গোড়ালি দিয়ে চাপ দিতেই তীরবেগে ছুটলো ওটা। রবিন হুড ও তার দলবলের জনপ্রিয়তার কথা চারণ কবিদের গানে শুনেছে লিটল জন, কিন্তু হাতে-নাতে প্রমাণ পেল আজ। সাধারণ মানুষ তাদের কতটা ভালবাসে বুঝতে পারলো সে, যখন দেখলো ওকে এগোতে দেখেই দু'পাশে সরে পথ করে দিচ্ছে লোকজন, ও এগিয়ে গেলেই আবার ভিড় করে বন্ধ করে দিচ্ছে পথটা। হাঁক ডাক করে ভিড় সরিয়ে জঙ্গল-রক্ষীরা দশ গজ এগোবার আগেই ঘোড়ার পিঠে চেপে সেতু পেরিয়ে গেল লিটল জন, কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের আড়ালে।

'যাক, বাঁচা গেল,' লিটল জনকে নিরাপদে চলে যেতে দেখে হাঁফ ছাড়লেন স্যার

রিচার্ড। দেহরক্ষীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তিনিও। ধীরেসুস্থে এগোচ্ছেন তিনি লিটল জন যে-পথে গিয়েছে সেই পথে। www.pathagar.net

একছুটে শেরউডে এসে হাজির হলো লিটল জনের ঘোড়া। পথে কোথাও বিশ্রামের দরকার পড়েনি ওটার। সোজা রবিন হুডের সামনে এসে থামলো ঘোড়া। জনা দশেক অনুচর নিয়ে গ্রীনউডের নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন আলাপ করছিল রবিন তখন।

'কি হে, লিটল জন,' হাঁক ছাড়লো রবিন, 'এত তাড়াহুড়ো কিসের? কার মাথায় বাড়ি দিয়ে নিয়ে এলে এত সুন্দর ঘোড়াটা?'

'কারো মাথায় বাড়ি দিইনি,' হাসতে হাসতে বললো লিটল জন। 'এটা আমার। জিতে নিয়েছি লড়ে।' এই বলে আনন্দমেলার ঘটনাটা খুলে বললো সে রবিনকে। এক জন ভাল নাইটের সহযেগিতা না পেলে যে জঙ্গল-রক্ষীদের হাতে নাস্তানাবুদ হতো, সেটাও জানালো। স্যার রিচার্ডকে সে চিনতেই পারেনি, এতই পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর চালচলনে।

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করলো রবিন, 'আমাদের সেই দুখী স্যার রিচার্ডকে পথে দেখেছো কোথাও? সেই যাকে এক বছর আগে ধার দিয়েছিলাম আমরা চারশো পাউণ্ড?'

'না তো,' বললো লিটল জন। 'তাঁকে আশা করছো নাকি আজ?'

'হ্যাঁ। আজই সূর্যাস্তের আগে টাকাটা তাঁর ফেরত দেয়ার কথা।'

'তাহলে ঠিকই আসবে,' বললো লিটল জন। 'দেরি আছে এখনও সূর্যাস্তের। যতদূর মনে আছে, ভদ্রলোকের চোখ-মুখে একটা সততার ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। দেখো, এসে পড়বে সময় মতই।'

'দেখা যাক,' বললো রবিন। 'এবার কাজের কথা। আজকে আমি ঠিক করেছি অতিথি ছাড়া কিছুতেই খেতে বসবো না। ওয়াটলিং স্ট্রিটে টহল দাও গিয়ে তুমি উইল স্কারলেট আর মাচকে নিয়ে। যাকে পাবে তাকেই ধরে আনবে দাওয়াত খেতে। যদি ধনী হয়, পকেট কিছুটা হালকা করবো আমরা তার, আর যদি গরীব হয়, কিছুটা ভারি করে দেব তার পকেট।'

তীর-ধনুক নিয়ে রওনা হয়ে গেল তিনজন। টহল দিচ্ছে রাস্তায়। পুব পশ্চিম কোন দিকেই কাউকে দেখতে পেল না। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর বার্নসডেলের দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেখানে এসে দাঁড়ালো। ডানদিকে চেয়েই চমকে উঠলো তিনজন একসাথে। বিরাট একটা দল আসছে এইদিকেই।

'সেরেছে!' বললো লিটল জন। 'এত মেহমান নিয়ে হাজির হলে খাওয়া-দাওয়ার টান পড়ে যাবে আমাদের। কারা এরা?'

দু'জন কালো আলখেল্লা পরা সন্ন্যাসী রয়েছে সবার আগে দুটো দামী ঘোড়ার ওপর, তাদের ঠিক পেছনেই সাতটা মালবাহী ঘোড়া, তার পেছনে বাহান্ন জন বর্শাধারী রক্ষী।

'সাধু দু'টোর জাঁকঝমক দেখছি বিশপদেরও হার মানায়,' বললো মাচ। 'প্রহরার বহর দেখে মনে হচ্ছে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে ওই সাতটা ঘোড়ার পিঠে। খুবই খুশি হবে আজ রবিন।'

'তা তো বুঝলাম,' বললো চিন্তান্বিত লিটল জন, 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা মাত্র তিনজন, এতগুলো লোককে সামলাই কি করে? সময়ও নেই হাতে যে আরো লোক ডাকবো। ভাবছি...'

চুপ করে থাকলো উইল স্কারলেট আর মাচ, বুঝলো, দ্রুত চিন্তা চলছে এখন লিটল জনের উর্বর মস্তিষ্কে, এখন কথা বলে উঠে তার ভাবনায় বাধা দেয়া ঠিক নয়। 'অথচ যেমন করেই হোক, দাওয়াত কবুল করাতে হবে ওদের দিয়ে,' নিচু গলায় বলে চলেছে লিটল জন, হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, 'আমরা যে মাত্র তিনজন সে-কথা ব্যাটারা জানছে কিভাবে? আরো ছয়-কুড়ি লোক যে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই সে নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই, চলো, ওই মোড়টা ঘুরেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তিনজন।'

রাজি হয়ে গেল সঙ্গীরা। এক দৌড়ে রাস্তার বাঁক ঘুরেই পিছন ফিরে দাঁড়ালো ওরা একেবারে মাঝ-রাস্তায়। বাঁক ঘুরেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল সামনের সাধু দু'জনের— ছিলায় তীর পরিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনজন ভয়ঙ্কর দস্যু!

দলের প্রথম অংশটা বাঁক নিতেই এক টানে কানের পাশে নিয়ে এলো ওরা ধনুকের ছিলা। হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলো লিটল জন, 'খবরদার! যে যেখানে আছো দাঁড়িয়ে পড়ো! নইলে খুন হয়ে যাবে!' সামনের দুজন সন্ন্যাসী রাশ টেনে ধরলো ঘোড়ার। থতমত খেয়ে গিয়েছে গোটা দলটা, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। ভয়ঙ্কর এক হাসি ফুটে উঠলো লিটল জনের মুখে। বললো, 'সাধু বাবারা, সাংঘাতিক রাগিয়ে দিয়েছো তোমরা আমাদের নেতাকে। তোমাদের জন্যে সেই কখন থেকে উপোষ করে রয়েছে বেচারা। এত দেরি হলো কেন এইটুকু পথ আসতে?'

ভয়ে ও বিস্ময়ে পাথর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সাধুরা লিটল জনের মুখের দিকে, তারপর ওদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কে তোমাদের নেতা?'

'রবিন হুড!' বজ্রকণ্ঠে জবাব দিল লিটল জন।

তিক্ততায় ভরে গেল সন্ন্যাসীর মুখ। বললো, 'কে? সেই চোরটা? নিরীহ, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে যে দস্যুটা?'

'মিথ্যেবাদী!' এবার সত্যিই রেগে গেল লিটল জন, 'নিরীহ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছো তোমরা! রবিন হুড পণ করেছে, তোমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে সে। যাই হোক, দাওয়াত খেতে ডেকেছে সে, যেতে হবে তোমাদের।'

যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত ছিল উইল স্কারলেট ও মাচ, তীর ছোঁড়ার জন্যে তৈরি; কিন্তু তার কোন দরকারই পড়লো না। যাদু আছে রবিন হুডের নামে। বর্শাধারী প্রহরীদের মধ্যে প্রথমে কিছুটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল, তারপর আশ্চর্য কায়দায় সটকে পড়লো ওরা দু'পাশের জঙ্গলে, কেউ কেউ প্রাণপণে ছুটলো যে-পথে এসেছে সেই পথ ধরে। ওরা মনে করেছে মালের কাছে থাকলে প্রচণ্ড হামলা আসবে এখুনি ওদের ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চেয়েই কলজে শুকিয়ে গেল দুই সাধুর— যেন যাদুমন্ত্রের বলে হাওয়া হয়ে গেছে সব রক্ষী, মালবাহী ঘোড়ার পাশে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু দু'জন অল্পবয়েসী ভৃত্য।

'এগোও!' হুকুম করলো লিটল জন। ভীত-সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগোলো সাধু দু'জন, তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরে ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো উইল স্কারলেট আর মাচ; ভৃত্য দু'জনের সাহায্যে মালবাহী সাতটা ঘোড়া টেনে আনার ভার নিল লিটল জন।

গ্রীনউডের নিচে বসে অপেক্ষা করছিল রবিন, ওদের আসতে দেখে উঠে এসে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে মাথার হুড খুলে স্বাগত জানালো সে সাধুদের। প্রত্যাভিবাদনের ধার ধারলো না সাধুরা; বিরক্ত, বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো রবিনের দিকে। দেখে রেগে গেল লিটল জন।

'দাঁড়াও, ছোটলোক কোথাকার!' এগোচ্ছে সে সাধুদের দিকে। 'ভদ্রতা শিখিয়ে ছেড়ে দেব আজ শালাদের!'

'এই একটা ব্যাপারে কারো ওপর জোর খাটাতে নেই, লিটল জন,' বললো রবিন। 'যেতে দাও, সৌজন্য ছাড়াও চলবে আমাদের। কতজন ছিল এদের সাথে?'

'ছিল তো অনেক, সব মিলে দুই কুড়ি ষোল জন; কিন্তু তোমার নাম উচ্চারণ করবার পর সাথে নিয়ে আসার জন্যে এই চারজন ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। সব ভেগেছে।'

'তোমার শিঙাটায় একটু ফুঁ দাও, জন,' বললো রবিন। 'সবাই জানুক, মেহমান এসেছে আজ।'

লিটল জনের শিঙার আওয়াজ পেয়েই হুড়মুড় করে এসে হাজির হলো রবিনের সাত-কুড়ি সশস্ত্র অনুচর। পরস্পরের মুখের দিকে চাইলো সন্ন্যাসী দু'জন, তারপর উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইলো একবার মালবাহী ঘোড়াগুলোর দিকে। বুঝতে কারোই অসুবিধে হলো না, প্রচুর ধনরত্ন রয়েছে ঘোড়ার পিঠে।

খাবার তৈরি হয়ে যেতেই দস্তরখান বিছিয়ে বসে গেল সবাই। খুবই খাতির-যত্ন করে সন্ন্যাসীদের বসানো হলো, নানান রকম সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হলো তাদের পাতে, এটা খান ওটা খান বলে আদর আপ্যায়ন করা হলো। ভরপেট খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললো সাধুরা।

'আপনাদের মঠটা কোথায়?' খাওয়া-দাওয়ার শেষে জানতে চাইলো রবিন।

'আমরা এমেট মঠের সন্ন্যাসী,' বললো ভারিক্কি চেহারার সাধু।

কথাটা শুনেই হেসে উঠলো রবিন, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'ওখানে কোন্ পদে আছেন আপনি?'

'কোষাধ্যক্ষ,' গুরু-গম্ভীর ভঙ্গিতে বললো সাধু। শুনে আবার হেসে উঠলো রবিন। রবিনকে হাসতে দেখে ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো সাধু, 'এতে হাসির কি আছে?'

'কিছু মনে করবেন না,' বললো রবিন। 'হাসি এসে যাচ্ছে। অবাক লাগছে ভাবতে, এত দিন থাকতে আজকের দিনটাতেই এসে হাজির হলেন এমেট মঠের কোষাধ্যক্ষ।'

'আজকের দিনের বিশেষত্বটা কি?' জানতে চাইলো সাধু।

'বিশেষত্ব এই যে, ঠিক এক বছর আগে চারশো পাউণ্ড ধার দিয়েছিলাম আমি একজনকে, টাকাটা এমেটের মোহান্তকে ফেরত দিয়ে তাঁর জমিদারী উদ্ধারের জন্যে। আমার সেই ধার শোধের তারিখ আজ। ভাবছি, সেই ধার শোধ করতেই পাঠানো হলো কিনা আপনাকে।'

'আমাকে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো কোষাধ্যক্ষ। 'না তো! কোন টাকা-পয়সা আনিনি আমি। এত টাকা কাকে ধার দিয়েছিলে তুমি?'

'একজন দুখী নাইটকে।'

'তাহলে তাকেই ধার শোধ করতে বলোগে যাও।'

'আমি ভেবেছিলাম,' হাসিমুখে বললো রবিন, 'এমেটের মোহান্ত বুঝি ফেরত পাঠালেন টাকাটা।' মালবাহী ঘোড়াগুলোর দিকে মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিত করলো সে, 'মনে হচ্ছে বহুত ধনরত্ন রয়েছে ওদের পিঠে?'

'না, না!' ব্যস্ত হয়ে উঠলো কোষাধ্যক্ষ। 'টাকা পয়সা কিচ্ছু নেই। কিছু পুরনো জামা-কাপড়, আর নিতান্তই সাধারণ কিছু জিনিস-পত্র।'

'টাকা পয়সা নেই!' ভুরুজোড়া কপালে তুলে ফেললো রবিন, 'এত লোক-লস্কর নিয়ে চলেছেন আপনি একেবারে খালি হাতে? রাহা-খরচাও নেই আপনার সাথে?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য আছে,' ভুলটা সংশোধন করে নিল কোষাধ্যক্ষ। 'সামান্য কিছু টাকা আছে আমার সাথে, এই ধরো, বিশ মার্কের মত হবে। এমন কিছুই নয়—মালপত্র খুলে দেখার কষ্টও পোষাবে না তোমার।'

'বেশ তো,' হাসলো রবিন। 'কিছু না থাকলে না-ই থাকবে। কিন্তু খুলে দেখাটা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। বলা তো যায় না, হয়তো আপনার অজান্তেই খোদার তরফ থেকে কিছু পাঠানো হয়েছে। এমনও হতে পারে, সেই দুখী নাইটের ধারের টাকাটা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার মাধ্যমে। হয়তো দেখা যাবে আপনার বিশ মার্কই অলৌকিক ভাবে বেড়ে বহুগুণ বেশি হয়ে গেছে।' লিটল জনের দিকে ফিরলো রবিন। 'জন, খোলো দেখি বাক্সগুলো।'

প্রথমে ঘাসের উপর একটা কাপড় বিছালো লিটল জন, তারপরই ক্যাশ-বাক্সের মত দেখতে দুটো বাক্স নিয়ে এলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। ওগুলো খুলতে গায়ের জোর খাটাবার প্রয়োজন পড়লো। প্রথমটা খুলে উপুড় করতেই ঝর ঝর করে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা ঝরে পড়লো কাপড়ের ওপর।

'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন হুড। 'দেখেছেন, কী অলৌকিক কাণ্ড! ঈশ্বরের ইচ্ছায় কী না হয়! বলিনি, বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে আপনার বিশ মার্ক?'

দ্বিতীয় বাক্সটা খুললো লিটল জন। আবার চকচকে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ঝরে পড়লো আগেরগুলোর ওপর ঝন ঝন শব্দ তুলে।

'আশ্চর্য! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!' চেঁচিয়ে উঠলো সবাই। হাসি চেপে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে ওদের পক্ষে। কিন্তু আঁধার হয়ে গেছে কোষাধ্যক্ষের মুখটা, ভুরু জোড়া কুঁচকে সেঁটে গেছে একটার সাথে আরেকটা।

'চট করে গুণে ফেলো দেখি, লিটল জন,' বললো রবিন।

গুণে দেখলো লিটল জন। বললো, 'আটশো পাউণ্ডেরও বেশি রয়েছে, ওস্তাদ!'

'বেশ, বেশ। সাধু বাবাজীকে ওঁর বিশ মার্ক দিয়ে দাও।' বিশ মার্ক গুণে আলাদা করার কাজে লেগে গেল লিটল জন। কোষাধ্যক্ষের দিকে ফিরলো আবার রবিন। 'সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ আপনারা, নির্লোভ, সত্যবাদী মহাপুরুষ; তাই আপনাদের একটা পয়সাও ছুঁলাম না । আপনার নিজের মুখেই শুনেছি আমরা, বিশ মার্কের বেশি একটা আধলাও নেই আপনার কাছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অলৌকিক ক্ষমতার বলে আরও আটশো পাউণ্ড ভরে দিয়েছেন ঈশ্বর ওর মধ্যে—খুব সম্ভব যা ধার দিয়েছিলাম তার দ্বিগুণ ফেরত দিতে চেয়েছেন তিনি আমাকে। তাঁর দান আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করছি।'

'চোর, গুণ্ডা, বদমাশ কোথাকার!' স্থান-কাল-পাত্র ভুলে রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠলো কোষাধ্যক্ষ। 'মোহান্তের সম্পদ ওসব, ভাল চাও তো এক্ষুণি ফেরত দাও বলে দিচ্ছি; তা নইলে ভয়ঙ্কর অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের ওপর। ঘন্টা, পবিত্র বাইবেল আর মোমবাতি নিয়ে এমন অভিশাপ দেবেন তিনি যে ইহকাল পরকাল কোথাও ঠাঁই হবে না তোমাদের।'

'কচু হবে!' বুড়ো আঙুল দেখালো রবিন। 'থোড়াই কেয়ার করি আমরা তোমাদের অভিশাপের। মোহান্তের মত এতবড় একটা অর্থ-পিশাচ, এত বড় নিষ্ঠুর নীচ লোক গোটা ইংল্যাণ্ডে আর দ্বিতীয়টি নেই। গরীবকে পিষে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা রোজগার যে ধর্মের নাম করে ছিনিয়ে নেয়, অসহায় বিধবার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও যার বিন্দুমাত্র বিবেকে বাধে না, তার অভিশাপ গায়ে লাগবে না আমাদের। গিয়ে তাকে বলবেন, আমি বলেছি, শকুনের অভিশাপে গরু মরে না। লিটল জন, এঁদের ঘোড়া দুটো দিয়ে দাও, মাল-পত্রসহ বাকি ঘোড়াগুলো রেখে দেব আমরা।'

শারীরিক নির্যাতনের ভয় পেয়েছিল কোষাধ্যক্ষ, অক্ষত অবস্থায় চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আর দেরি করলো না, রওনা হয়ে গেল অপর সাধু এবং দুই ভৃত্যকে সাথে নিয়ে।

এমেটের সাধু বাঁক নিয়ে চোখের আড়াল হতে না হতেই অন্যদিক থেকে এসে হাজির হলেন লী-র স্যার রিচার্ড তাঁর দলবলসহ। এত দেরি হওয়ার কারণ, ধীরে-সুস্থে এসেছেন তিনি—লিটল জনের মত অতটা তাড়া তাঁর ছিল না; তাছাড়া দেহরক্ষীদের অনেকেই পায়ে হেঁটে এসেছে তাঁর পিছু পিছু।

'তোমাদের ওপর স্বর্গের শান্তি বর্ষিত হোক,' কাছাকাছি এসে সবার উদ্দেশ্যে বললেন তিনি। 'কেমন আছো, রবিন?'

'ভালো,' বললো রবিন। 'আসুন, স্যার নাইট, গ্রীনউডে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে।

এমেটের মোহান্তের ব্যাপারটা ভাল ভাবেই চুকেছিল তো?'

'হ্যাঁ। টাকা নিয়ে হাজির হতেই কালো হয়ে গিয়েছিল মোহান্তের মুখটা। বড় আশা করেছিল বেচারী দখল করে নেবে আমার জমিদারীটা। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, তোমার সাহায্যে রক্ষা করতে পেরেছি সবকিছু। একটা বছর কঠোর পরিশ্রম করে আগের চেয়েও অবস্থা ভাল করে ফেলেছি, আয় বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। কথামত হাজির হয়েছি আমি আজ।'

'সন্ধে হয়ে আসছে দেখে ভেবেছিলাম আজ বুঝি আপনি আর এলেন না,' বললো রবিন।

'পথে দেরি হয়ে গেল,' বললেন স্যার রিচার্ড। 'কুস্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছিল এক

আনন্দমেলায়। ওখানে দেখলাম, সেরা কুস্তিগীরকে অন্যায় ভাবে রিঙ থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করছে কিছু কুচক্রী বদলোক। সেই লোকটা দেখলাম একা। মনে হলো লোকটাকে তোমার এখানে দেখেছি, তাই রয়ে গেলাম। ওকে সাহায্য করতে গিয়েই দেরি করে ফেলেছি।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার নাইট,' এগিয়ে এলো লিটল জন। 'আমিই সেই লোক। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার সময়োচিত সাহায্য না পেলে খুব সম্ভব জঙ্গল-রক্ষীদের হাতে খুন হয়ে যেতাম আমি আজ। কিন্তু আপনার এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে যে চিনতেই পারিনি আমি আপনাকে।'

'আমারও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, স্যার নাইট,' বললো রবিন। 'আমার লোককে সাহায্য করা আর আমাকে সাহায্য করা একই কথা। লিটল জন আমার ডান হাত, ওকে হারালে সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেতাম আমি।'

'তোমাদের কোন কাজে আসতে পেরেছি জেনে আমি খুশি। কিন্তু এ তো অতি সামান্য ব্যাপার, তোমাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের তুলনায় কিছুই নয়। তোমাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমরা বুড়ো-বুড়ি যতদিন বেঁচে আছি, স্যার রিচার্ডের দুর্গ-তোরণ তোমাদের জন্যে সব সময় খোলা থাকবে।' একটা মোহর ভর্তি থলে বের করলেন তিনি। 'এই নাও তোমার চারশো পাউণ্ড। ঘোড়ার পিঠে আরও কিছু উপহার রয়েছে তোমাদের জন্যে আমার ও আমার স্ত্রীর তরফ থেকে।'

'উপহার নিতে পারি,' বললো রবিন, 'কিন্তু টাকাটার আর দরকার নেই, স্যার নাইট। সেই ধারটা শোধ করে দেয়া হয়েছে।'

'শোধ করে দেয়া হয়েছে!' আকাশ থেকে পড়লেন স্যার রিচার্ড। 'কী বলছো তুমি, রবিন? আমার এমন কোন বন্ধু নেই দুনিয়ায় যে আমার জন্যে এত টাকা খরচ করবে।'

'কিন্তু সত্যিই শোধ করে দেয়া হয়েছে সব টাকা,' হাসতে হাসতে বললো রবিন। 'শুনলে আশ্চর্য হবেন, টাকাটা এসেছে এমেটেরই মোহান্তের কাছ থেকে। যত ধার দিয়েছিলাম তার ডবল।'

'অসম্ভব! এমেটের মোটা, লোভী, হাড় কেপ্পণ বুড়ো মোহান্ত আমার ধারের দ্বিগুণ টাকা শোধ করে দিয়েছে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না। স্বেচ্ছায়... উঁহুঁ।'

'না, ঠিক স্বেচ্ছায় নয়...' হাসলো রবিন, তারপর ভেঙে বললো কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। কোষাধ্যক্ষের বিশ মার্ক আশ্চর্য অলৌকিক উপায়ে আটশো পাউণ্ডেরও বেশি হয়ে যাওয়ার কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন স্যার রিচার্ড।

'ভাল কায়দা করেছিলে, হে!' হাসতে হাসতে বললেন স্যার রিচার্ড। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু তাই বলে আমাকে ঋণমুক্ত হতে বাধা দেয়া তোমার উচিত হবে না, রবিন। ধরো, পুরো চারশো পাউণ্ড আছে এতে।'

রবিন হুড বুঝতে পারলো, জোর করে কাউকে কিছু দান করতে গেলে তিক্ততারই সৃষ্টি হয়, মঙ্গল হয় না কোন পক্ষেরই; তাই এ নিয়ে আর চাপাচাপি করলো না। বললো, 'বেশ তো, ধার নিয়েছিলেন, শোধও না হয় করবেন। কিন্তু এসবের আগে আপনাদের খাওয়া-দাওয়া দরকার, এতটা পথ চলে নিশ্চয়ই খিদে লেগে গেছে আপনার লোকজনদের। আগে খাওয়া দাওয়া হোক, তারপর লেন-দেন হবে টাকা পয়সার।'

রবিনের নির্দেশে আবার ভোজের ব্যবস্থা করা হলো। পানাহার শেষে মালবাহী ঘোড়ার পিঠ থেকে সবকিছু নিয়ে আসার হুকুম দিলেন মিষ্টভাষী নাইট। চারশো পাউণ্ডের থলেটা রবিনের হাতে দিলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন তিনি। 'বন্ধুগণ, তোমরা আমার চরম বিপদে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছো, তোমাদের সাহায্যে আমার জীবনের এক মস্ত সংকট ও ভয়ঙ্কর বিপদ কাটিয়ে

উঠে আজ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি আমি। সেদিন সেই সাহায্য না পেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতাম আমি, দুর্দশার সীমা থাকতো না আমার। আমি ও আমার স্ত্রী যে তোমাদের কাছে কতটা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। টাকা ফেরত দিয়ে দিলেই এ ঋণ শোধ হয় না। তোমাদের প্রতি আমাদের দু'জনের ভালবাসার নমুনা হিসেবে সামান্য কিছু উপহার সাথে করে এনেছি আমি, তোমরা যদি খুশি মনে সেটা গ্রহণ করো, আমরা ধন্য মনে করবো নিজেদের।' এই বলে প্যাকেট খোলার নির্দেশ দিলেন তিনি নিজের লোকদের।

জিনিসগুলো দেখেই প্রচণ্ড এক হর্ষধ্বনি বেরিয়ে এলো সবার মুখ থেকে। স্প্যানিশ ইউ দিয়ে তৈরি দুইশো ধনুক নিয়ে এসেছেন স্যার রিচার্ড। ঝকঝক করছে বার্ণিশ করা ধনুকের কাঠ, এক পিঠে রূপোর পাত দিয়ে এমন ভাবে চমৎকার নক্সা করা হয়েছে, যেন দেখতে সুন্দর লাগে, অথচ ধনুকের শক্তি কোনভাবে হ্রাস না পায়। এরপর বেরোলো-সোনার কারুকাজ করা দুশো চামড়ার তূণ। প্রতিটা তূণে বিশটা করে তীর–ফলাগুলো ঝকঝক করছে রূপোর মত, ময়ূরের পালক বাঁধা হয়েছে প্রতিটা তীরে, তীরের পেছনে রূপোর রিঙ।

প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধনুক আর একটা তীর ভর্তি তূণ তুলে দিলেন স্যার রিচার্ড। রবিনকে দিলেন সোনা দিয়ে কারুকাজ করা অপূর্ব সুন্দর এক বিশাল ধনুক, আর তেমনি সুন্দর কারুকাজ করা তীর-ভর্তি তূণ।

এত সুন্দর অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে সবাই যার-পর-নাই খুশি হলো, মাথার ওপর ধনুক-ধরা হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করলো ওরা, স্যার রিচার্ড ও তাঁর স্ত্রীর যে-কোন বিপদে ওরা থাকবে তাঁদের পাশে, প্রয়োজন হলে মৃত্যু বরণ করতেও দ্বিধা করবে না।

বিদায় নেয়ার সময় হলো। মশাল হাতে স্যার রিচার্ড ও তাঁর লোকজনদের জঙ্গলের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রবিন হুড ও তার দলবল। ঘোড়ার পিঠে বসেই নিচু হয়ে রবিনের দুই গালে চুমো খেলেন স্যার রিচার্ড, তারপর হাসি মুখে রওনা হয়ে গেলেন নিজ দুর্গের পথে।

'এই রকম একজন মহৎ মানুষকে সাহায্য করেও সুখ আছে, কি বলো, জন?'

মাথা ঝাঁকালো লিটল জন।

ফিরে চললো ওরা নিজেদের আস্তানায়।

পনেরো

রানীর সম্মানে

নিঝুম দুপুর। গ্রীষ্মের রোদে দীর্ঘ রাজপথের ধুলো সাদাটে হয়ে তেতে রয়েছে। পথের দু'পাশে অনড় দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। দূরের বিস্তীর্ণ ময়দানে আলস্য ভরে বইছে গরম হাওয়া, আরো দূরে চাইলে মনে হয় কাঁপছে। ঝর্ণার মাছগুলো ঝাঁক বেঁধে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা হলুদ পাথরের ছায়ায়। দু'পাশে পাখা মেলে থির হয়ে বসে আছে ফড়িংগুলো ঝর্ণার ধারের কোনো চোখা কাঠির ওপর, রোদ লেগে চিকচিক করছে রঙচঙে পাখা।

এই গরমের মধ্যে দুধ-সাদা এক ঘোড়ায় চড়ে রাজপথ ধরে এগিয়ে আসছে চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ পরা এক তরুণ। চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে তার দিকে পথচারীরা। এত সুন্দর আর এত চমৎকার পোশাক পরা তরুণ এর আগে নটিংহামশায়ারে দেখেনি কেউ। পনের-ষোল বছর মত বয়স, ধবধবে সাদা

গায়ের রঙ—তরুণীদেরও হার মানায়। লম্বা হলুদ চুল উড়ছে বাতাসে, সিল্ক আর মখমলের পোশাকে আঁটা দামী পাথর ঝলসে উঠছে রোদ লেগে, জিনের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে কোমরে ঝোলানো ছোরার খাপ। বিখ্যাত লণ্ডন শহর থেকে আসছে এই ছেলে—রানীর ব্যক্তিগত পরিচারক, রিচার্ড পার্টিংটন, রানীর আদেশে শেরউডের জঙ্গলে বসবাসকারী এক রবিন হুডের কাছে চলেছে সে।

লেস্টার শহর থেকে একটানা বিশ মাইল পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তরুণ পার্টিংটন, তাই বিশাল ওকের ছায়ায় শান্ত সুশীতল এক সুন্দর সরাইখানা দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে ঘোড়া থামালো। নীল শূকরের ছবি আঁকা রয়েছে সরাইখানার দরজায়। এক পাত্র রেনিশ ওয়াইন দিতে বলে কপালের ঘাম মুছলো তরুণ। তারপর দেখলো সরাইখানার বাইরে গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পেতে বসে এল আর বিয়ার খাচ্ছে কয়েকজন লোক। ওদের মধ্যে তাগড়া চেহারার দু'জন লোকের পরনে রয়েছে লিংকন গ্রীনের পোশাক, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে ওরা মস্ত দুটো ওকের লাঠি। গল্প থামিয়ে সবাই চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

ট্রে-তে সাজিয়ে এক বোতল ওয়াইন আর একটা লম্বা সরু গ্লাস এনে দিল সরাইখানার মালিক। ঘোড়ার ওপর বসেই হলুদ মদ ঢাললো পার্টিংটন গ্লাসে, তারপর গ্লাসটা ওপরে তুলে বললো, 'আমার মনিব মহামান্য রানী এলেনরের সুখ ও স্বাস্থ্য পান করছি, সেই সাথে কামনা করছি শীঘ্রিই যেন যাত্রা শেষ হয় আমার, যেন পেয়ে যাই দুঃসাহসী রবিন হুডকে।'

কথা শুনে ওর দিকে আরো কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো সবাই, তারপর সবুজ পোশাক পরা লোক দু'জন নিচু স্বরে কি যেন আলাপ করলো নিজেদের মধ্যে। আলাপ শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো ওদের একজন। এত লম্বা আর এত বিশাল চেহারার লোক জীবনে কোনদিন দেখেনি পার্টিংটন। 'রবিন হুডের কাছে আপনার কি দরকার, পরিচারক মশায়?' জানতে চাইলো লোকটা। 'কি চান রানী এলেনর তার কাছে? প্রশ্নটা নিছক কৌতূহলবশে করছি না, সদুত্তর পেলে আমি হয়তো রবিন হুডকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি আপনাকে।'

'তাই নাকি, চেনো তুমি তাকে?' খুশি হয়ে উঠলো তরুণ। 'আমাকে তার কাছে পৌছে দিলে উপকার করবে তুমি তার, খুশি হবেন রানী।'

সবুজ পোশাক পরা চমৎকার রোদ-পোড়া চেহারার কোঁকড়া বাদামী চুলো অপর লোকটি কথা বলে উঠলো এবার। 'আমরা শুনেছি আমাদের মহামান্যা রানী খুবই দয়ালু মানুষ, আপনাকেও সৎ লোক বলেই মনে হচ্ছে। আমরা দু'জন আপনাকে রবিন হুডের কাছে নিয়ে যেতে পারি; কিন্তু পরিচারক মশায়, আগে থেকে জানিয়ে রাখছি, ওর কোন ক্ষতি হলে ভাল হবে না।'

'সে ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,' বললো রিচার্ড পার্টিংটন, 'কোন অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনিনি আমি। রানীর কাছ থেকে একটা বাণী নিয়ে এসেছি আমি রবিন হুডের কাছে। তোমরা যদি পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চলো তাহলে বড় ভাল হয়।'

'বেশ, চলুন তাহলে,' বললো ঢ্যাঙা লোকটা। সঙ্গীর দিকে ফিরলো সে। 'সত্যিই কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই তো, উইল?' সঙ্গী মাথা নাড়তেই নিজের লাঠিটা হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে গেল সে। উঠে পড়লো উইল স্টিউটলিও, লাঠি হাতে ঢ্যাঙা দৈত্যের পাশে এসে দাঁড়াল। মদের দাম চুকিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

গ্রীনউড গাছের শীতল ছায়ায় বসে অ্যালান-এ-ডেলের মধুর কণ্ঠের গান শুনছিল রবিন আর তার দলের কয়েকজন। মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ হয়ে গেছে সবাই, মৃদু মৃদু দুলছে

গানের ছন্দে: এমনি সময়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে গেল ওদের। পরমুহূর্তে জংলা

পথ ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো লিটল জন আর উইল স্টিউটলি, তাদের পিছনে দুধ-সাদা ঘোড়ায় চেপে আসছে ফুটফুটে সুন্দর এক তরুণ।

এগিয়ে গেল রবিন। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো রিচার্ড পার্টিংটন, মাথা থেকে লাল মখমলের টুপি খুলে সৌজন্য প্রকাশ করলো। মৃদু হেসে রবিন বললো, 'স্বাগতম। আপনার মত একজন সুদর্শন, সুসজ্জিত তরুণের গরীবদের এই শেরউড জঙ্গলে পদার্পণের কারণ জানতে পারি?'

'আপনিই বোধহয় রবিন হুড, আর এরা সবাই আপনার অনুচর?' জিজ্ঞেস করলো পার্টিংটন। রবিনকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বললো, 'আপনার জন্যে মহামান্যা রানী এলেনরের শুভেচ্ছা বয়ে এনেছি আমি। তিনি আপনার কথা অনেক শুনেছেন, আপনার বীরত্ব ও মহত্ত্বের খবর জেনেছেন, তাই একবার তিনি আপনাকে স্বচক্ষে দেখতে চান। রানী বলে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমার সাথে লণ্ডন শহরে একবার আসেন, আপনার নিরাপত্তার জন্যে তাঁর সাধ্যমত সবই করবেন তিনি, যাতে নিরাপদে এই জঙ্গলে ফিরে আসতে পারেন তার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। আগামী চারদিন পর লণ্ডনের ফিন্স্‌বারি ময়দানে আমাদের মহামান্য রাজা দ্বিতীয় হেনরী বিরাট এক শূটিং ম্যাচের আয়োজন করেছেন। সারা দেশের সেরা তীরন্দাজ সবাই তীর ছুঁড়বে সেখানে। মহামান্যা রানীর

ইচ্ছে, আপনিও যোগদান করুন এই প্রতিযোগিতায়। তাঁর বিশ্বাস, আপনি অংশ গ্রহণ করলে কারো সাধ্য নেই আপনার কাছ থেকে জয়ের মালা ছিনিয়ে নেয়। শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে তিনি নিজের বুড়ো আঙুল থেকে খুলে এই সোনার আংটিটা পাঠিয়েছেন আপনার জন্যে।'

আংটিটা দেখেই কুর্নিশ করলো রবিন হুড, সসম্মানে চুম্বন করে ওটা পরে নিল নিজের কনিষ্ঠ আঙুলে।

'আসছি আমি,' বললো সে, 'রানীর আদেশ শিরোধার্য, অমান্য করবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে আপনার জন্যে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা...'

'কোন দরকার নেই,' বললো রিচার্ড পার্টিংটন। 'হাতে সময় নেই আমাদের। এক্ষুণি তৈরি হয়ে রওনা হওয়া দরকার। মহামান্যা রানী বলে দিয়েছেন, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, দলের কয়েকজনকে সাথে নিতে পারেন, তাদেরকেও একই ভাবে অভ্যর্থনা করবেন তিনি।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললো রবিন, 'হাতে বিশেষ সময় নেই। এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি। আর হ্যাঁ, তিনজনকে নেব আমি সাথে। লিটল জন, উইল স্কারলেট আর অ্যালান-এ-ডেল—জলদি তৈরি হয়ে নাও তোমরা তিনজন। উইল স্টিউটলি—আমার অনুপস্থিতিতে দলনেতা হিসেবে কাজ চালাবে তুমি।'

নাচতে নাচতে ছুটলো গুহার দিকে লিটল জন, উইল স্কারলেট আর অ্যালান-এ-ডেল। নিজেও যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিল রবিন হুড। অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে ফিরে এলো চারজন। রবিন পরেছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নীল পোশাক, লিটল জন আর উইল স্কারলেট পরেছে ওদের প্রিয় লিংকন গ্রীন, আর অ্যালান-এ-ডেল পরেছে আগাগোড়া লাল পোশাক। চমৎকার লাগছে ওদের সবাইকে দেখতে। প্রত্যেকেই টুপির নিচে পরে নিয়েছে একটা করে সোনার কারুকাজ করা ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, জামার নিচে পরেছে চিকন লোহার জাল দিয়ে তৈরি বর্ম—এ বর্ম ভেদ করা কোন তীরের কর্ম নয়।

দুধ-সাদা ঘোড়ায় চড়ে বসলো তরুণ পার্টিংটন, দলের সবার সাথে হাত মিলিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন লণ্ডন শহরের উদ্দেশে।

লেস্টারশায়ারের মেলটন মব্রেতে এক সরাইখানায় সেই রাতটা কাটালো ওরা, পরের রাত কাটালো নথ্যাম্পটনশায়ারের কেটারিং-এ, তার পরের রাত বেডফোর্ড শহরে, এবং শেষ রাত হার্টফোর্ডশায়ারের সেন্ট অ্যালবান্স-এ। এখানে অবশ্য পুরো রাতটা থাকলো না ওরা, হাতে সময় কম, তাই মাঝরাতের দিকেই নেমে পড়লো পথে। দ্রুতপায়ে হাঁটছে ওরা আর দু'চোখ ভরে দেখছে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। উজ্জ্বল তারাগুলো নিস্প্রভ হয়ে এলো ক্রমে, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে গ্রীষ্মের আশ্চর্য সুন্দর কোমল প্রভাত। লাল সূর্য উঠলো পুবাকাশে, ঘাসের বুকে চিকচিক করছে শিশির বিন্দু, দূরের উপত্যকায় ঝুলছে আবছা কুয়াশা, মিষ্টি সুরে ডাকতে শুরু করেছে পাখি, ঝোপের গায়ে মাকড়সার জালগুলো যেন পরিদের রূপালী কাপড়—ঝিলমিল করছে রোদ লেগে। অবশেষে একটা বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়লো বিখ্যাত লণ্ডন শহরের সুউচ্চ বুরুজ, দেয়াল আর দালান-কোঠা। পৌঁছে গেল ওরা লণ্ডনে।

রানী এলেনর বসে আছেন তাঁর রাজকীয় নিকুঞ্জে। জানালা গলে সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঘরে। আশেপাশেই ঘুরঘুর করছে সহচরী কয়েকজন পরিচারিকা। হাওয়ায় ভেসে আসছে লাল গোলাপের হালকা মিষ্টি সুবাস। এমন সময় একজন এসে খবর দিল, নিচের কাচারীঘরে অপেক্ষা করছে চারজন স্বাস্থ্যবান যুবক সহ তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারক রিচার্ড পার্টিংটন। খুশি হয়ে উঠলেন রানী, আদেশ করলেন যেন এক্ষুণি ওদের নিয়ে আসা হয় তাঁর সামনে।

রবিন হুড, লিটল জন, উইল স্কারলেট আর অ্যালান-এ-ডেলকে নিয়ে আসা হলো

রানীর নিকুঞ্জে। বুকে হাত বেঁধে হাঁটু মুড়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলো রবিন রানীকে। সহজ সরল ভাষায় বললো, 'আপনি ডেকেছিলেন; আমি, রবিন হুড, এসেছি। আদেশ করুন। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সে আদেশ পালন করবো আমি।'

মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠলো রানী এলেনরের সুন্দর মুখ। উঠে দাঁড়াতে বললেন তিনি রবিনকে, তারপর আদর করে বসালেন সবাইকে। খাবার নিয়ে আসার আদেশ দিলেন পরিচারিকাদের। খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের পর ওদের জীবনের নানান কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন রানী। একে একে সব প্রশ্নের জবাব দিল রবিন। হেরিফোর্ডের বিশপ, স্যার রিচার্ড অফ লী এবং এমেটের কোষাধ্যক্ষের ঘটনা শুনে কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখ, কখনও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল হৃদয়, তারপর অলৌকিক উপায়ে বিশ মার্ক যখন আটশো পাউণ্ডেরও বেশি হয়ে গেল তখন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি। গল্প শেষ হতেই গান শোনানোর অনুরোধ করলেন তিনি অ্যালান-এ-ডেলকে। বিন্দুমাত্র ভণিতা না করে হার্পে সুর বেঁধে নিল অ্যালান-এ-ডেল, তারপর ধরলো গান। মুহূর্তে সম্মোহিত হয়ে পড়লো কামরার সবাই, সব ক'জোড়া চোখ স্থির হয়ে রয়েছে অ্যালানের মুখের ওপর, টুঁ শব্দ নেই কারো মুখে, নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছে। আশ্চর্য এক স্বর্গীয় সুধা নিঃসৃত হচ্ছে ওর কণ্ঠ থেকে। গান থেমে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ কথা সরলো না কারো মুখে।

প্রতিযোগিতার সময় ঘনিয়ে এলো। এলাহী কারবার চলছে ফিন্‌সবারি ময়দানে। দশটা দলে ভাগ করা হয়েছে রাজার তীরন্দাজ বাহিনীকে। প্রত্যেক দলে রয়েছে আশিজন করে তীরন্দাজ, তাদের নেতৃত্বে একজন করে ক্যাপটেন। ময়দানের শেষ প্রান্তে টাঙানো হয়েছে দশটা ডোরাকাটা তাঁবু, প্রত্যেকটি তাঁবুর মাথায় আলাদা রঙের একটা করে পতাকা উড়ছে মৃদু বাতাসে। মাঝখানের হলুদ পতাকা টাঙানো তাঁবুর ক্যাপটেন রাজার ধনুক-বাহক বিখ্যাত টেপাস, তার একপাশে নীল পতাকাধারী তাঁবুর ক্যাপটেন গিলবার্ট অফ দ্য হোয়াইট হ্যাণ্ড, অন্যপাশে রক্ত-লাল রঙা পতাকা টাঙানো তাঁবুর ক্যাপটেন বাকিংহামশায়ারের তরুণ ক্লিফটন। অন্য সাতটি তাঁবুর ক্যাপটেনও খুবই নামজাদা ধনুর্বিদ, যেমনঃ কেন্টের এগবার্ট কিংবা সাউথ্যাম্পটনের উইলিয়াম—এরা প্রত্যেকেই দক্ষ তীরন্দাজ, কিন্তু প্রথম তিনজনের মত অতটা বিখ্যাত নয়। তাঁবুগুলো থেকে কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে, পিঁপড়ের মত পিলপিল করে প্রতিটা তাঁবুতে ঢুকছে-বেরোচ্ছে পরিচর্যায় নিযুক্ত ভৃত্যের দল—কারও হাতে এল বা বিয়ারের পাত্র, কেউ নিয়ে চলেছে কয়েক গাছি ধনুকের ছিলা, কেউ বা তীর ভরা তূণ।

ময়দানের দুইপাশে দর্শকদের জন্য ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে যাওয়া বেঞ্চের সারি। উত্তর পাশের সারিগুলোর মাঝামাঝি জায়গায় উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে রাজা আর রানীর বসার জন্যে। বিচিত্র রঙের ক্যানভাসের ছাত, রঙিন ঝালর আর ফিতে দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে মঞ্চটা। রাজা-রানী এসে পৌঁছোননি এখনও, কিন্তু বেঞ্চিগুলো ভর্তি হয়ে গেছে, গিজগিজ করছে হরেক রঙের জামা পরা অসংখ্য মানুষ, ধাপের পর ধাপ অনেক উঁচু পর্যন্ত কেবল মাথা আর মাথা—তাকালে ধাঁধা লেগে যায় চোখে। যেখানে দাঁড়িয়ে তীর ছোঁড়া হবে সেই দাগ থেকে একশো যাট গজ দূরে টাঙানো হয়েছে দশটা টার্গেট, প্রতিটা টার্গেটের পাশে যে-দল সেটা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়বে সেই দলের বিশেষ রঙের ছোট একটা করে পতাকা ঝুলছে। সব কিছু তৈরি, এখন শুধু রাজা-রানী এসে পৌঁছবার অপেক্ষা।

খানিক পর শোনা গেল ট্রাম্পেটের গগন-বিদারী নিনাদ। উপস্থিত সবার দৃষ্টি চলে গেল আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে সেইদিকে। দেখা গেল, ছয়জন বিচিত্র ঝলমলে পোশাক পরা ট্রাম্পেট-বাদক ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে এদিকে, মুখে ধরা রয়েছে

রূপোর ট্রাম্পেট। তাদের পিছনে ছাই-রঙা একটা সুন্দর ঘোড়ায় চেপে আসছেন রাজা দ্বিতীয় হেনরী, পাশে সাদা একটা ঘোড়ায় বসে রয়েছেন রানী এলেনর। রাজা-রানীর দু'পাশে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে রক্ষীদল, রোদ লেগে ঝকঝক করছে ওদের কুঠার ও বর্শার তীক্ষ্ণ ফলাগুলো। এদের পেছনেই রয়েছেন রাজার পারিষদবর্গ। উজ্জ্বল, রঙচঙা পোশাক-পরিচ্ছদ আর দামী অলংকার ঝিকমিকিয়ে উঠলো রোদ লেগে। গোটা মাঠটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে নানা বর্ণের রেশম আর মখমলের নড়াচড়ায়।

উঠে দাঁড়ালো দর্শকবৃন্দ। তাদের বিপুল হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠলো আকাশ বাতাস। রুমাল বা স্কার্ফ ধরা হাত নাড়ছে সবাই রাজা-রানীর উদ্দেশে। মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ঘোড়া। ঘোড়া থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন রাজা ও রানী মঞ্চের ওপর, সেখানে পাশাপাশি সাজানো দুটো আসনে বসলেন তাঁরা।

হৈ-চৈ থেমে যেতেই বেজে উঠলো একটা বিউগল। সাথে সাথেই লাইন করে সব ক'টি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো তীরন্দাজরা। আটশো নিপুণ তীরন্দাজ ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো রাজা-রানীর মঞ্চের সামনে। গর্বের সাথে তাদের ওপর চোখ বুলালেন রাজা হেনরী, খুশিতে বুকটা ভরে গেল তাঁর। ব্যক্তিগত ঘোষক মন্ত্রের স্যার হিউকে প্রতিযোগিতার নিয়ম ঘোষণার আদেশ দিলেন তিনি। মঞ্চের সামনের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন স্যার হিউ, পরিষ্কার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন ও পুরস্কারের কথা, উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী সবাই স্পষ্ট শুনতে পেল প্রত্যেকটি শব্দ।

'প্রত্যেকে নিজ নিজ দলের টার্গেট লক্ষ্য করে সাতটা তীর ছুঁড়বে, প্রত্যেক দলের আশিজনের ভেতর থেকে বেছে বের করা হবে সেরা তিনজন তীরন্দাজকে। এই তিনজন আবার তিনটে করে তীর ছুঁড়বে, এদের মধ্যে যে সেরা হবে তাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে বাকি নয়টা দলের সেরা তীরন্দাজের সাথে। দশটি দলের দশজন সেরা তীরন্দাজ প্রত্যেকে তিনটি করে তীর ছুঁড়বে। প্রথম পুরস্কার বিজয়ীকে দেয়া হবে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা, একটা সোনার কারুকাজ করা রূপোর তৈরি শিঙা, এবং একটি চামড়ার তূণে সাদা রাজহাঁসের পালক বাঁধা, শেষ মাথায় সোনার রিঙ পরানো দশটি তীর। দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী পাবে ড্যালেন লী-তে চরে বেড়ানো একশোটা হরিণ, যখন খুশি মেরে নেবে সে সেখান থেকে। তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীকে দেয়া হবে বিশাল দুটো পিপে ভর্তি চমৎকার রেনিশ মদ। বাকি সাতজনের প্রত্যেককে দেয়া হবে আশিটা করে রূপোর পেনি।'

স্যার হিউর ঘোষণা শেষ হতেই মাথার ওপর ধনুক তুলে জয়ধ্বনি করলো তীরন্দাজেরা, তারপর তালে তালে পা ফেলে ফিরে গেল নিজেদের তাঁবুতে।

শুরু হলো প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী তীর ছুঁড়লো প্রত্যেক দলের ক্যাপটেন, তারপর একে একে দাগের ওপর এসে দাঁড়ালো দলের আর সবাই। প্রথম কিস্তিতে দশটি টার্গেট লক্ষ্য করে বর্ষিত হলো পাঁচ হাজার ছয়শো তীর। গেরস্ত বাড়ির কৌতূহলী কুকুরে শুঁকলে শজারুর পিঠের যা অবস্থা হয়, দশটা টার্গেটকে এখন দেখতে লাগছে অনেকটা সেই রকম। বিচারকমণ্ডলী অনেক বাছ-বিচার করে প্রত্যেকটি দল থেকে সেরা তিনজনের নাম ঘোষণা করলেন উচ্চকণ্ঠে। আগেরগুলো সরিয়ে নিয়ে দশটা নতুন টার্গেট টাঙানো হলো সেই জায়গায়। সাথে সাথেই স্তব্ধ হয়েগেল দর্শক-গ্যালারীর বাকবিতণ্ডা ও হট্টগোল। দাগের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে দশটি দলের সেরা তিনজন করে মোট ত্রিশজন তীরন্দাজ।

এবার আর প্রথম দফার মত অত সময় লাগলো না, প্রত্যেক দল থেকে ছোঁড়া হলো মাত্র নয়টি করে তীর। টার্গেটের বাইরে গেল না একটি তীরও, কিন্তু গিলবার্টের দলের নয়টার মধ্যে পাঁচটাই লাগলো গিয়ে কেন্দ্রের গোলসাদা অংশে—অবশ্য এর মধ্যে তিনটে

তীর গিলবার্টের নিজের ছোঁড়া। আবার এগিয়ে গেলেন বিচারক-মণ্ডলী, প্রত্যেকটি দলের সেরা তীরন্দাজের নাম ঘোষণা করলেন উঁচু গলায়। জানা গেল, গিলবার্টের এ পর্যন্ত ছোঁড়া মোট দশটা তীরের ছয়টাই গিয়ে বিঁধেছে ঠিক মধ্যচক্রে, টেপাস এবং ক্লিফটনও তার থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই—প্রায় একই সমান ভাল করেছে তারাও, বাকি সাতজনও ছুঁই ছুঁই করছে এদের; প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় কে হবে, আগে থেকে বলার উপায় নেই। দারুণ জমে উঠেছে খেলা। চাপা উত্তেজনায় গরম হয়ে উঠেছে দর্শকবৃন্দ।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে যার যার তাঁবুতে ফিরে গেল সেরা দশজন, খানিক বিশ্রাম নিয়ে, প্রয়োজন মনে করলে ধনুকের ছিলা পাল্টে নিয়ে, আবার আসবে তারা একটু পর। মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসবে, কারণ নিজের যোগ্যতা প্রমাণের এ-ই শেষ সুযোগ।

গ্যালারীর মৃদু গুঞ্জন এখন জোর হাওয়া লাগা ঘন জঙ্গলে পাতার মর্মর ধ্বনির মতো শোনাচ্ছে। হাসিমুখে রানী এলেনর ফিরলেন রাজার দিকে। 'তোমার কি মনে হয় এই দশজনই গোটা ইংল্যাণ্ডের সেরা তীরন্দাজ?'

'ঠিক,' হাসিমুখে বললেন রাজা হেনরী। 'শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, আমার ধারণা, সারা দুনিয়ায় এরাই শ্রেষ্ঠ, কোন তুলনা নেই এদের।'

'তোমার সেরা তিনজন তীরন্দাজের চেয়েও ভাল তিনজন তীরন্দাজ যদি আমি হাজির করে দিতে পারি?'

হেসে উঠলেন রাজা হেনরী। বললেন, 'তাহলে বলবো আমি যা পারিনি, তুমি সেই অসাধ্য সাধন করেছো। অযথা গর্ব করছি না, সত্যিই বলছি, টেপাস, গিলবার্ট আর বাকিংহামশায়ারের ক্লিফটনের সমকক্ষ তীরন্দাজ গোটা দুনিয়ায় খুঁজে পাবে না তুমি।'

'গোটা দুনিয়ায় খোঁজার দরকার কি?' মৃদু হাসলেন রানী, 'ওদের চেয়ে অনেক ভাল তীরন্দাজ রয়েছে। তোমার রাজত্বেই। সত্যিকার গুণী লোকদের খুঁজে পাওনি তুমি, কিন্তু আমি পেয়েছি; তুমি যদি বলো, আমি এক্ষুণি হাজির করতে পারি ওদের। অনায়াসে হারিয়ে দেবে ওরা তোমার আটশো তীরন্দাজ থেকে বেছে বের করা সেরা তিনজন তীরন্দাজকে।'

'তাই নাকি?' কৌতুকে চকচক করছে রাজার দু'চোখ। 'তা নিয়ে এসো না!'

'আনতে পারি, যদি তুমি ওদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করো।'

'সত্যিই!' হা হা করে হেসে উঠলেন রাজা। 'আশ্চর্য! রানীকে মানায় না, এমন সব অদ্ভুত ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছো তুমি আজকাল। ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যি সে-রকম লোক হাজির করতে পারো, কথা দিচ্ছি, যে অপরাধই করে থাকুক তারা, আগামী চল্লিশ দিন তাদের মাথার একটা চুলও স্পর্শ করবো না আমি। আরও কথা দিচ্ছি, যদি সত্যিই তারা আমার সেরা তিনজন তীরন্দাজকে হারিয়ে দিতে পারে, তাদেরকেই ঘোষণা করা হবে পুরস্কার-বিজেতা হিসেবে। যাই হোক, তুমি যখন তীর-ধনুকের ব্যাপারে হঠাৎ এত আগ্রহী হয়ে উঠেছো, তোমার-আমার মধ্যে ছোট্ট একটা বাজিও হয়ে যাক, কি বলো?'

'বেশ তো,' বললেন রানী। 'আমি অবশ্য এসব বাজি টাজি ভাল বুঝি না, কিন্তু তুমি যদি খুশি হও, ঠিক আছে, ধরবো বাজি। কি বাজি ধরবে তুমি তোমার লোকদের পক্ষে?'

মজা হবে ভেবে খুশি হয়ে উঠলেন রাজা হেনরী। 'হেরে গেলে আমি দেব তিন টান (২৫২ গ্যালনের বড় পিপে) রেনিশ ওয়াইন, দশ টান এল, স্প্যানিশ ইউ-এর চমৎকার দু'শো ধনুক আর দু'শো তীর-ভর্তি তূণ। এবার শোনা যাক, তুমি কি দেবে।'

আশেপাশে দাঁড়ানো সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। এই মজার ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি কিভাবে হয় তা দেখার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সবাই। রানীকে গম্ভীর

ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করতে দেখে একটু অবাক হলো তারা। রানী বললেন, 'বেশ তো, আমি রাজি।' চারপাশে তাকালেন। 'আপনাদের মধ্যে কে থাকবেন আমার পাশে? আমার লোকেদের পক্ষে বাজি ধরতে আর কে রাজি?'

কেউ কোন জবাব দিল না, টেপাস, গিলবার্ট আর ক্লিফটনের বিরুদ্ধ-পক্ষে বাজি ধরার ইচ্ছে বা সাহস কারো নেই।

'কই?' আবার জিজ্ঞেস করলেন রানী। 'কেউ নেই আমার সমর্থনে? আপনি? হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ, আপনি ধরবেন বাজি?'

'না, না!' সভয়ে বললেন লর্ড বিশপ, 'এই পোশাক পরা মানুষের বাজি ধরা অধর্ম। তাছাড়া, আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার কারও পক্ষেই এদেরকে হারানো সম্ভব নয়, অযথা গচ্চা যাবে আমার টাকা।'

'বুঝতে পারছি, ওই পোশাক পরেও সুবিধে মনে করলে বাজি ধরতে রাজি ছিলেন আপনি, আসল বাধাটা ধর্মীয় নয়, টাকা খোয়া যাবার ভয়!' হাসি মুখে বললেন রানী। শুনে খুক খুক করে হেসে উঠলো আশপাশের কয়েকজন, হাসি হাসি হয়ে উঠলো রাজার মুখটাও। লর্ড বিশপের অর্থলিপ্সার কথা জানা আছে সবারই। ঘাড় ফিরিয়ে স্যার রবার্ট লী বলে এক নাইটের দিকে চাইলেন রানী। 'ধন সম্পদের তো অভাব নেই আপনার, আপনিও কি এগিয়ে আসবেন না একজন মহিলার সমর্থনে?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললেন স্যার রবার্ট লী। 'রানীর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে এবং তাঁর সম্মান রক্ষার্থে কিছু টাকা পানিতে ফেলতে আমার আপত্তি নেই। অন্য কেউ হলে একটা ফুটো পয়সাও বাজি ধরতাম না আমি। কারণ, টেপাস, গিলবার্ট আর ক্লিফটনের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন তীরন্দাজ সত্যিই নেই।'

রাজার দিকে ফিরলেন রানী। 'কারো সমর্থনের দরকার নেই আমার। তোমার রেনিশ ওয়াইন, এল আর তীর-ধনুকের চেয়েও অনেক দামী একটা জিনিস ধরছি আমি বাজি। আমার কোমরের এই মণি-মুক্তো খচিত কটিবন্ধ খুলে দেব আমি, যদি হেরে যাই বাজিতে।'

'বেশ,' বললেন রাজা হেনরী, 'ডেকে পাঠাও তোমার ধনুর্বিদদের। এই দেখো, দাগের ওপর এসে দাঁড়াচ্ছে আমার দশজন। এদের প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাক, তারপর তোমার তিনজনকে মোকাবিলা করবে আমার সেরা তিনজন।'

'ঠিক আছে,' বলে ইশারায় রিচার্ড পার্টিংটনকে ডাকলেন রানী, কানে কানে কিছু বললেন; মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে চলে গেল ছেলেটা, কোনাকুনি ভাবে ময়দানটা পেরিয়ে মিশে গেল লোকের ভিড়ে। তাই দেখে মঞ্চে উপস্থিত সুধিমণ্ডলীর মধ্যে কানাকানি ফিসফাস আলোচনা শুরু হয়ে গেল—কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কাদের ডাকতে পাঠালেন রানী, এত বড় তীরন্দাজদের বিরুদ্ধে কারা যুঝবে রানীর স্বপক্ষে।

প্রতিযোগিতার শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এখন, দাগের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে দশ দলের থেকে বাছাই করা সেরা দশজন। থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে গোটা ময়দানে। হঠাৎ কোন বাচ্চার খোলা গলার ক্যাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠার শব্দ ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ। যেন দম আটকে রেখেছে সবাই। ধীর স্থির ভঙ্গিতে অতি সাবধানে তিনটে করে তীর ছুঁড়লো প্রত্যেকে, গ্যালারিতে এতই অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে যে প্রতিটা তীর টার্গেটে গিয়ে বেঁধার শব্দ কানে এলো সবার। শেষ তীরটা ছোঁড়া হয়ে যেতেই প্রচণ্ড এক হর্ষধ্বনি উঠলো সারামাঠের সবার কণ্ঠ থেকে। দেখা গেল, এবারও কেন্দ্র-চক্রের সাদা অংশে গিয়ে বিঁধেছে গিলবার্টের তিনটে তীর, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে টেপাস দুটো তীর কেন্দ্রচক্রে এবং একটা তীর তার পাশের কালো চক্রে লাগিয়ে, কিন্তু ক্লিফটনকে হারিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এলো সাফোকের হিউবার্ট—দু'জনই দুটো তীর

লাগিয়েছে সাদা কেন্দ্র-চক্রে, তবে ক্লিফটনের তৃতীয় তীর বিঁধেছে গিয়ে চতুর্থ চক্রে, আর হিউবার্টেরটা লেগেছে তৃতীয় চক্রে।

গিলবার্টের দলে খুশির হুল্লোড় পড়ে গেছে, লাফাচ্ছে সবাই, চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে, টুপি খুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে, করমর্দন করছে একে অন্যের সাথে।

এই গোলমাল আর চিৎকারের মধ্য দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে রাজা-রানীর মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে পাঁচজন লোক। এখানকার বেশির ভাগ লোকই চেনে রিচার্ড পার্টিংটনকে, কিন্তু বাকি চারজন সম্পূর্ণ অচেনা। নীল পোশাক পরা লোকটা হাঁটছে তরুণ পার্টিংটনের পাশাপাশি, তাদের পেছনে আসছে দু'জন সবুজ পোশাক পরা তাগড়া চেহারার জোয়ান এবং একজন লাল পোশাক পরা তরুণ। তরুণের হাতে তিনটে বিশাল ধনুক, দুটো ধনুকের গায়ে রূপো দিয়ে নক্সা আঁকা, তৃতীয়টা সোনা দিয়ে।

সবাই লক্ষ্য করছিল এই পাঁচজনকে, এমন সময় দেখতে পেল রাজার মঞ্চ থেকে একজন সংবাদ-বাহক দৌড়ে গিয়ে কিছু বলছে গিলবার্ট, টেপাস আর হিউবার্টকে। চুপ হয়ে গেল সবাই। তিনজন বিজয়ীকে রাজার মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে দর্শকরা বুঝে নিল অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতে চলেছে, গলা সামনে বাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ওরা ব্যাপারটা কি।

পার্টিংটনের সাথে এসে রাজা-রানীর মঞ্চের সামনে দাঁড়ালো চারজন, হাঁটু ভাঁজ করে মাথার টুপি খুললো রানীর সম্মানে। সামনে ঝুঁকে এলেন রাজা হেনরী, এদের কাউকেই চিনতে পারলেন না তিনি। কিন্তু এদের চেহারা দেখেই চমকে উঠলেন হেরিফোর্ডের বিশপ, যেন এইমাত্র বোলতার হুল ফুটেছে তাঁর গায়ে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেই দেখতে পেলেন তিনি হাসিমুখে চেয়ে রয়েছেন রানী তাঁর দিকে। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে চুপ রইলেন তিনি, ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে তাঁর মুখ।

'লক্সলি,' খানিকটা সামনে ঝুঁকে পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন রানী। 'রাজার সাথে বাজি ধরেছি আমি, বলেছি তুমি আর তোমার দু'জন লোক রাজার সেরা তিন তীরন্দাজকে হারিয়ে দিতে পারবে। আমার খাতিরে চেষ্টা করে দেখবে একবার?'

'নিশ্চয়ই,' উত্তর দিলো রবিন হুড। 'আমার সাধ্য মত চেষ্টা করবো আমি। আপনার মান যদি রাখতে না পারি, জীবনে ধনুক স্পর্শ করবো না আর।'

রানীর নিকুঞ্জে গিয়ে মার্জিত পরিবেশে রীতিমত অস্বস্তি আর আড়ষ্টতায় ভুগেছে লিটল জন, মুখ তুলে কথা বলতে পারেনি রানীর সাথে, কিন্তু তাজা সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো সে। বললো, 'আপনার সুন্দর মুখের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আপনার সম্মান ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ যদি কেউ করে, বেশি কিছু বলতে চাই না, পিটিয়ে লাশ করে ফেলব—মাথা ফাটিয়ে ছেড়ে দেব আমি তাকে। হ্যাঁ!'

'অ্যাই, লিটল জন! এসব কথা বলতে হয় না!' চাপা গলায় ধমক দিল রবিন। কিন্তু বোঝা গেল, ওর এই আন্তরিক অভিব্যক্তিতে অসন্তুষ্ট হয়নি কেউ; মৃদু হাসলেন রানী, পারিষদদের অনেকেই হেসে উঠলো।

হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ কিন্তু হাসলেন না। রাজার মুখেও হাসির লেশমাত্র নেই। রানীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কারা এরা? কাদের ডেকে এনেছো তুমি আমাদের সামনে?'

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়োর ম্যাজিস্টি, ওই যে নীল পোশাক পরা লোকটা দেখা যাচ্ছে, ওর নাম রবিন হুড, মিডকান্ট্রির এক কুখ্যাত দস্যু, রবিন হুড! ওই যে ঢ্যাঙা দৈত্যের মত লোকটা দেখছেন, ওর নাম লিটল জন, দস্যু রবিন হুডের দোসর। তার পাশের জনের নাম উইল স্কারলেট। আর লাল পোশাক পরা ছোকরা একজন চারণ, ওর নাম অ্যালান-

এ-ডেল।'

এই কথা শুনে কালো হয়ে পরস্পরের সাথে সেঁটে গেল রাজার দুই ভুরু। রানীর দিকে ফিরলেন তিনি, কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'এসব কথা সত্য?'

'হ্যাঁ,' হাসি মুখেই জবাব দিলেন রানী। 'সত্যি কথাই বলেছেন বিশপ। তিনি চিনতে পেরেছেন এদের, কারণ কিছুদিন আগে রবিন হুডের সাথে তিনটে দিন কাটিয়েছেন তিনি শেরউড জঙ্গলে, মনের আনন্দে হরিণ শিকার করেছেন, সেই মাংস দিয়ে রান্না করা ভুরিভোজ খেয়েছেন তৃপ্তির সাথে। তিনি যে তাঁর বন্ধুর সাথে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবেন, একথা ভাবতেও পারিনি। যাই হোক, মনে রেখো, আগামী চল্লিশ দিনের জন্যে ক্ষমা করে দিয়েছো তুমি ওদেরকে।'

'আমার শপথ আমি রক্ষা করবো,' বললেন রাজা, কিন্তু কণ্ঠস্বরের কাঁপুনি শুনে বোঝা গেল ভয়ঙ্কর রেগে গেছেন তিনি, 'কিন্তু চল্লিশ দিন পার হয়ে গেলে দেখবো আমি কি করে রক্ষা পায় ও আমার হাত থেকে। ওদের অনেক দুষ্কৃতির কথা কানে এসেছে আমার। ভালোমত শায়েস্তা করে ছাড়ব আমি ওদের।' এই বলে নিজের তীরন্দাজদের দিকে ফিরলেন তিনি। ইতিমধ্যেই শেরউডের দস্যুদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে কথা শুনছে ওরা। 'শোনো গিলবার্ট, টেপাস আর হিউবার্ট!' হাঁক ছাড়লেন রাজা। 'আমি একজনকে কথা দিয়েছি, এই তিনজনের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে তোমরা তিনজন। যদি তোমরা এই বদমাশদের হারিয়ে দিতে পারো, তোমাদের প্রত্যেকের টুপি আমি ভরে দেব রূপোর পেনি দিয়ে, কিন্তু যদি হেরে যাও, তোমাদের জেতা পুরস্কার চলে যাবে ওদের হাতে। তোমরা রাজি আছো এই প্রতিযোগিতায়?'

'হুজুর যখন কথা দিয়েছেন, আমরা রাজি,' বললো গিলবার্ট। 'কোন আপত্তি নেই আমাদের কারো।'

'খুশি হলাম,' বললেন রাজা। 'যার যা জানা আছে, সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করো গিয়ে। যদি জিততে পারো, তোমাদের সারা জীবনের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে দেব আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে যার যার তাঁবুতে ফিরে গেল তিন বিজয়ী, রবিন আর তার সঙ্গীরা গিয়ে দাঁড়ালো দাগের ওপর। ধনুকে ছিলা পরিয়ে যার যার তূণ থেকে বেছে ভাল তীর বের করার কাজে লেগে গেল ওরা।

এদিকে রাজার তীরন্দাজরা তাঁবুতে ফিরতেই ওদের ছেঁকে ধরলো আর সবাই মঞ্চের কাছে কি ঘটলো জানার জন্যে। মিডকান্ট্রির সেই বিখ্যাত রবিন হুড আজকের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে শুনে হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ। কেবল রবিন হুডই নয়, লিটল জন, উইল স্কারলেট, অ্যালান-এ-ডেল—সবার নামই জানা আছে তাদের। খবরটা প্রচার হয়ে গেল অন্যান্য তাঁবুতেও, তারপর উঠলো দর্শকদের কানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই গ্যালারির যত লোক, কারোই আর বাকি থাকলো না খবরটা জানতে। উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই, ঘাড় বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করছে বিখ্যাত দস্যুদের।

ছয়টা নতুন টার্গেট টাঙানো হলো ছ'জনের জন্যে। নিজ নিজ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দাগের ওপর দাঁড়ালো গিলবার্ট, টেপাস আর হিউবার্ট। রবিন ও গিলবার্ট একটা মুদ্রা টস্ করে স্থির করলো আগে তীর ছোঁড়ার সুযোগ পাবে কার দল। জিতলো গিলবার্ট। হিউবার্টকে প্রথম তীর ছোঁড়ার আদেশ দিল সে।

তীর ছোঁড়ার ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ালো হিউবার্ট, বাম পা সামনে, ডান পা পিছনে; ছিলায় পরালো একটা বাছাই করা গোল, সোজা তীর, তারপর অত্যন্ত সাবধানে ধীরস্থির ভঙ্গিতে ছুঁড়লো সেটা। সোজা মাঝের সাদা কেন্দ্র-চক্রে গিয়ে বিঁধলো তীর। দ্বিতীয় তীরটাও বিঁধলো সেখানে। কিন্তু তৃতীয় তীরটা লাগলো গিয়ে তার পাশের কালো ঘরে, সাদা অংশের থেকে মাত্র এক আঙুল বাইরে। বিপুল হর্ষধ্বনি উঠলো দর্শকদের মধ্যে

থেকে, কারণ আজকের প্রতিযোগিতায় হিউবার্ট যতবার তীর ছুঁড়েছে তার মধ্যে এবারের নিশানা হয়েছে সবচেয়ে ভাল।

হাসলো রবিন হুড। বললো, 'এর চেয়ে ভাল করা তোমার জন্যে কঠিনই হয়ে যাবে, উইল। নাও, এবার তোমার পালা, পেশীগুলো টান টান করে নিয়ে মারো দেখি তীর-শেরউডের নাম ডুবিয়ো না।'

সিধে হয়ে দাঁড়ালো উইল স্কারলেট, হাসিমুখে তীর যোজনা করলো ছিলায়, কিন্তু অতি-সাবধানতার জন্যে নষ্ট করে ফেললো প্রথম নিক্ষেপ। কালো ঘরের পাশেরটায় গিয়ে লাগলো তীর, অর্থাৎ কেন্দ্র-চক্রের পাশের পাশেরটায়। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো রবিন। তারপর বললো, 'সহজ ভঙ্গিতে মারো, বাছা। তোমাকে বার বার বলিনি, অতক্ষণ টেনে ধরে রেখো না ছিলাটা?' এই কথায় হুঁশিয়ার হয়ে গেল উইল স্কারলেট, পর পর দুটো তীর সেঁধিয়ে দিল কেন্দ্র-চক্রে। কিন্তু ভুল যা হবার হয়ে গেছে, হিউবার্টকে পরাজিত করতে পারেনি সে। প্রচণ্ড হাততালিতে ফেটে পড়লো দর্শকবৃন্দ, সবাই খুশি হিউবার্টকে বিজয়ী দেখে।

বাঁকা দৃষ্টিতে চাইলেন রাজা রানীর মুখের দিকে। 'এই যদি নমুনা হয়, বাজিতে হার হয়ে যাবে তোমার, গিন্নী।' টিটকারিতে ভ্রূক্ষেপ করলেন না রানী, মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালেন, তিনি আশা করছেন রবিন হুড ও লিটল জন মান বাঁচাবে তাঁর।

এবার টেপাসের পালা। উইল স্কারলেটের মত একই ভুল করে বসলো টেপাস, জেতার আগ্রহে অতি-সতর্কতা অবলম্বন করতে গেল। প্রথম তীরটা বিঁধলো মাঝের সাদা ঘরে, কিন্তু দ্বিতীয়টা গিয়ে বিঁধলো পাশের কালো ঘরে, শেষের তীরটা অবশ্য কপাল গুণে বিঁধলো গিয়ে একেবারে কেন্দ্র-বিন্দুতে, এক্কেবারে ছোট্ট কালো বিন্দুটার ওপর। 'বাহ্, বাহ্, চমৎকার!' প্রশংসা করলো রবিন। 'দারুণ দেখিয়েছো, টেপাস! নিঃসন্দেহে এটা আজকের সেরা শট। কিন্তু, ভায়া, গোলমাল করে ফেলেছো দ্বিতীয়টায়। নাও, লিটল জন, এবার তোমার পালা।'

দাগের ওপর দাঁড়িয়ে কোন রকম ভণিতা না করে টপাটপ তিনটে তীর মেরে দিল লিটল জন, বাম হাতে ধরা ধনুকটা একবার নামাবারও প্রয়োজন বোধ করলো না, একটা করে তীর জুড়লো ছিলায়, কানের কাছে টেনে এনেই ছেড়ে দিল—সোজা উড়ে গিয়ে সাদা মধ্য-চক্রে বিঁধলো একের পর এক তিনটে তীরই। হর্ষ বোধ করলো না কেউ এতে। যদিও সারাদিনের সেরা নিক্ষেপ প্রত্যক্ষ করলো সবাই এইমাত্র, হর্ষধ্বনি বেরোলো না কারো মুখ থেকেই। লণ্ডনবাসীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না গ্রাম থেকে এসে টেপাসের মত এতবড় একজন তীরন্দাজকে হারিয়ে দিয়ে যাবে কেউ—তা সে যত বিখ্যাত লিটল জনই হোক না কেন।

এবার দাগের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো গিলবার্ট অফ দা হোয়াইট হ্যাণ্ড। অতি সাবধানে তিনটে তীর ছুঁড়লো সে, তিনটেই সোজা গিয়ে বিঁধলো সাদা চক্রে।

'চমৎকার, গিলবার্ট!' প্রশংসার চাপড় দিল রবিন গিলবার্টের কাঁধে। 'অপূর্ব! তোমার তুলনা হয় না! এতবড় তীরন্দাজ সত্যিই দেখিনি আমি আগে। স্বাধীন জীবন বেছে নেয়া উচিত ছিল তোমার। কল্পনাও করতে পারবে না তুমি এই ইঁট পাথরের দেয়াল ঘেরা লণ্ডন শহরের বাইরে কি আশ্চর্য মুক্ত, আনন্দময় জীবন পড়ে রয়েছে।' কথা বলতে বলতেই তূণ থেকে একটা তীর বের করে ছিলায় পরালো রবিন।

দাড়িকে শুনিয়ে বিড়বিড় করলেন রাজা, 'আটকুড়ি মোমবাতি দেব সেইন্ট হিউবার্ট, তিন আঙুল চওড়া। শুধু বদমাশটার কনুইটা একটু নাড়িয়ে দাও! অন্তত একটা তীর যেন পাশের কালো ঘরে গিয়ে বেঁধে!' কিন্তু কানে বোধহয় তুলো দিয়ে রেখেছেন আজ সেইন্ট হিউবার্ট, রাজার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।

'সত্যিই,' এখনো কথা বলে চলেছে রবিন। 'একবার এসে আমাদের শেরউড থেকে

ঘুরে যাও না?' বলতে বলতে কানের পাশে নিয়ে এলো সে তীর পরানো ছিলাটা। 'লণ্ডনে তোমরা-' এই পর্যন্ত বলেই ছেড়ে দিল সে তীর, '-পাতিকাক বা দাঁড়কাক ছাড়া তীর মারার কিছু খুঁজে পাও না, আর ওখানে আমরা মারি চমৎকার সব হরিণের কলজে লক্ষ্য করে।' কথার মাঝে হেলা ভরে ছোঁড়া তীরটা যখন সোজা গিয়ে কেন্দ্র-বিন্দুর আধ ইঞ্চি ডাইনে বিঁধলো, হাঁ হয়ে গেল গিলবার্টের মুখ।

'মাই গড!' চেঁচিয়ে উঠলো গিলবার্ট। 'নীল পোশাক পরা খোদ শয়তান নাকি হে তুমি! এই ভাবে হেলা-ফেলা করে...'

'না, হে, না,' হাসতে হাসতে বললো রবিন, আরেকটা তীর জুড়ে ফেলেছে সে ধনুকে, 'অতটা খারাপ লোক—' টঙ্কার শোনা গেল ছিলার, '—নই আমরা।' এবার তীরটা গিয়ে বিঁধলো কেন্দ্র-বিন্দুর ঠিক আধ ইঞ্চি বামে। ছানাবড়া হয়ে গেছে গিলবার্টের চোখ।

হাসতে হাসতেই তৃতীয় তীর ছুঁড়লো রবিন। সোজা গিয়ে ঢুকলো সেটা দুই তীরের মাঝখানে, ঠিক কেন্দ্র-বিন্দুতে। তিনটে তীরের পালকগুলো মিলেমিশে মনে হচ্ছে একটাই মোটা তীর বিঁধে রয়েছে টার্গেটের ঠিক মাঝখানে।

দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। এরকম অবিশ্বাস্য শুটিং তারা জীবনে দেখেনি, রবিন হুডের পরে আর কোনদিন দেখবে বলেও আশা করে না। সবাই দেখতে পেল, হেরে গেছে রাজার প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী। দেখা যাচ্ছে, হেরে গিয়েও মলিন হয়নি গিলবার্টের মুখ, সোৎসাহে রবিনের হাত ধরে প্রবলবেগে ঝাঁকাচ্ছে সে।

কিন্তু চটে গেলেন রাজা। যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তিনি ওই লোকগুলোর সাথে পারবে না তাঁর নিজের লোক, তবু চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'হয়নি! খেলা শেষ হয়নি এখনও! পরাজিত হয়নি গিলবার্ট। ওর তীর তিনটেও তো মাঝখানের চক্রে লেগেছে। মেনে নিচ্ছি, বাজিতে হেরে গেছি আমি, কিন্তু ওর পুরস্কার ও হারায়নি এখনও। আবার তীর ছুঁড়তে বলো ওদের। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অপরকে হারাতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে প্রতিযোগিতা।' রাজাকে রাগে কাঁপতে দেখে কথা বাড়াবার সাহস পেলেন না স্যার হিউ, মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেলেন রবিন হুড আর গিলবার্টের কাছে, রাজার আদেশ শোনালেন তাদের।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'কোন আপত্তি নেই আমার। মহামান্য রাজার সন্তুষ্টির জন্যে এখন থেকে আগামী কাল দুপুর পর্যন্ত একটার পর একটা তীর ছুঁড়তে রাজি আছি আমি। নাও, গিলবার্ট, ছোঁড়ো তীর, প্রতিযোগিতা শুরু হোক আবার।'

পরদিন দুপুর পর্যন্ত তীর ছোঁড়ার দরকার পড়লো না। হঠাৎ সামান্য একটু বাতাস ওঠায় গিলবার্টের প্রথম তীরটাই একটু সরে গিয়ে কালো ঘরে বিঁধলো, শর্ষে পরিমাণ বামে পড়লেই বিঁধতো মাঝের সাদা ঘরে।

'কপালটা মন্দ তোমার, গিলবার্ট,' বললো রবিন। হাসতে হাসতে ছুঁড়লো তীর। সোজা গিয়ে ঠিক কেন্দ্র-বিন্দুতে বিঁধলো ওটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজা হেনরী। রাগতঃ দৃষ্টিতে চাইলেন নিজের চারপাশের লোকজনের মুখের দিকে। কারও মুখে হাসি বা খুশির আভাস দেখলে তার কপালে কি যে খারাবী ঘটতো কেউ বলতে পারে না। পাথরের মূর্তির মত বসে রইলো সবাই গম্ভীর হয়ে। কারও সাথে কোন কথা না বলে রানীকে পাশে নিয়ে পারিষদবর্গকে ওঠার ইঙ্গিত দিয়েই নেমে গেলেন তিনি মঞ্চ থেকে, ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন মাঠ থেকে। রাগে টগবগ করে ফুটছে তাঁর গায়ের রক্ত।

রাজা চলে যেতেই তীরন্দাজ বাহিনীর সবাই ঘিরে ধরলো রবিন, লিটল জন, উইল আর অ্যালানকে। সবাই কাছ থেকে এক নজর দেখতে চায় মিডকান্ট্রির জনপ্রিয়

দস্যুদের। একই উদ্দেশ্যে জনতার একটা বিরাট অংশ জুটে গেল ওদের চারপাশে। উইল স্কারলেটের কানে কানে বললো লিটল জন, 'মনে হচ্ছে জীবনে কোনদিন এমন চিড়িয়া দেখেনি এরা কোনদিন! সবাই কেমন হাঁ করে গিলছে আমাদের দেখো, আমরা যেন কাম্বারল্যাণ্ডের দৈত্য, কিংবা ওয়েলশের বামন!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন বিচারক এগিয়ে এলেন পুরস্কার বিতরণ করতে। রবিনের উদ্দেশ্যে বললেন প্রধান বিচারক, 'শর্ত অনুযায়ী তুমিই প্রথম পুরস্কার বিজয়ী; কাজেই এই ধরো তোমার রূপোর বিউগল, এই নাও দশটা তীর-ভরা তূণ, আর এই যে এই থলির ভেতর রয়েছে দুই-কুড়ি দশটা স্বর্ণমুদ্রা।' এবার ফিরলেন তিনি লিটল জনের দিকে, 'দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী তুমি; ড্যালেন লী থেকে একশোটা হরিণ মেরে নিতে পারবে তুমি যখন খুশি।' হিউবার্টের দিকে ফিরলেন তিনি এবার, 'তৃতীয় পুরস্কারটা নিজের আয়ত্তে রাখতে পেরেছো তুমি, যখনই তুমি চাইবে, তোমার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া হবে দুই টান রেনিশ ওয়াইন।' এরপর একে একে নাম ধরে ডাকলেন তিনি অপর সাতটি দলের সেরা তীরন্দাজদের, প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন চার-কুড়ি রূপোর পেনি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হতেই উঁচু গলায় ঘোষণা করলো রবিন হুড, 'এই শূটিং ম্যাচের সম্মানে রূপোর বিউগলটা নেব আমি স্মারক-চিহ্ন হিসেবে। কিন্তু তুমি, গিলবার্ট, নিঃসন্দেহে রাজার তীরন্দাজ বাহিনীর সেরা ধনুর্বিদ—খুশি মনে সোনার মুদ্রা ভরা থলেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি তোমাকে। নাও, ধরো। খাঁটি, সাচ্চা লোক তুমি, এই থলে তোমার প্রাপ্য। এছাড়াও দশটি দলের সেরা দশজন তীরন্দাজকে আমি একটা করে সোনার তীর দিতে চাই। নিজেদের কাছে রাখবে এটা, বুড়ো হয়ে নাতী-নাতনীদের গল্প শোনাবেঃ এক কালে সারা দুনিয়ার সেরা দশজন তীরন্দাজের একজন ছিলে তোমরা।' রবিনের উদার মনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে হৈ-হৈ করে উঠলো সবাই।

এবার হেঁড়ে গলায় হাঁক ছাড়লো লিটল জন, 'বন্ধু টেপাস, এইমাত্র তোমাদের বিচারক ড্যালেন লীর যে-সব হরিণের কথা বললেন, ওগুলো আমার কোন দরকার নেই। আসলে আমাদের ওখানে শুধু যথেষ্ট নয়, যথেষ্টরও বেশি হরিণ রয়েছে। কাজেই তোমার চমৎকার শূটিং দেখে খুশি হয়ে একশো হরিণের পঞ্চাশটা আমি তোমাকে দিয়ে দিতে চাই, বাকি পঞ্চাশটা পাবে পাঁচটা করে প্রত্যেক দলের ক্যাপটেন। যখন খুশি মেরে নিয়ো তোমরা।'

খুশি হয়ে শোরগোল তুললো সবাই লিটল জনের কথাতেও, শূন্যে ছুঁড়ে দিল মাথার টুপি। রবিন হুড ও তার সহকারীর বিরাট মনের পরিচয় পেয়ে এদের সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল তীরন্দাজ বাহিনীর।

এই হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো লম্বা এক রক্ষী, রবিনের জামার আস্তীন ধরে টানলো একপাশে। 'আপনার কানে কানে একটা কথা বলবো,' বললো সে। 'কথাটার মাথামুণ্ডু অবশ্য কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। রিচার্ড পার্টিংটন বলে এক ছোকরা অনেকক্ষণ ধরেই খুঁজছে আপনাকে, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগোতে পারছে না সামনে। আপনাকে একটা কথা জানানোর জন্যে অনেক করে অনুরোধ করলো ছোকরা—অর্থহীন কথা—কিন্তু ওর অনুরোধ ঠেলতে না পেরে রাজি হয়ে গেলাম। কোন্ এক ভদ্রমহিলা নাকি আপনাকে জানাতে চান...কি যেন কথাটা? ও, হ্যাঁ—গজরাচ্ছে সিংহ। সাবধান!'

'তাই নাকি?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো রবিনের। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে ভদ্রমহিলাটি আর কেউ নন,স্বয়ং রানী এলেনর। তিনি জানাচ্ছেন, এখুনি সাবধান না হলে রাজার খড়গ নেমে আসবে ওদের মাথার ওপর। কিন্তু রক্ষীকে বললো, 'ভারি মজার কথা তো! যাই হোক, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি জানো না কতটা উপকার

করলে তুমি আজ আমার।'

নিজের তিন সঙ্গীকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে জানালো রবিন, এক্ষুণি লণ্ডন ছেড়ে না পালালে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে হবে ওদের। একবিন্দু সময় নষ্ট না করে সিদ্ধান্ত নিল ওরা তখুনি। ভিড় ঠেলে এগোতে শুরু করলো মন্থর গতিতে। ভিড়ের চাপ কমতেই লম্বা পা ফেলে রওনা হয়ে গেল লণ্ডন শহর ছেড়ে উত্তর দিকে।

ষোল

পালাচ্ছে রবিন

ভাগ্যিশ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল, ফিনসবারি ময়দান ছেড়ে ওরা যখন মাইল চারেক গেছে, ঠিক তখনই ভিড় ঠেলে এসে হাজির হলো রাজার ছয়জন দেহরক্ষী রবিন ও তার বন্ধুদের বন্দী করতে। হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের প্ররোচনায় শপথ ভঙ্গ করে দস্যু রবিনকে গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছেন রাজা হেনরী, কাজটা উচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না, ভালমত না বুঝেই।

প্রতিযোগিতা শেষ হতেই ময়দান ছেড়ে নিজের ক্যাবিনেটে ফিরে এসেছেন রাজা। তাঁর সাথে সাথে এসেছেন হেরিফোর্ডের বিশপ আর স্যার রবার্ট লী। কিন্তু কারও সাথে একটি কথাও না বলে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছেন রাজা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অন্তরটা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে তাঁর আজকের এই ঘটনায়। কিছুতেই হজম করতে পারছেন না তিনি বাজিতে হেরে যাওয়ার অপমান।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নরম গলায় কথা শুরু করলেন বিশপ, 'সত্যিই, বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইয়োর ম্যাজেস্টি, হাতের মুঠোয় পেয়েও ধরা যাচ্ছে না বদমাশটাকে! একবার নিরাপদে শেরউড জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে পারলে কিন্তু বগল বাজাবে লোকটা, গলা উঁচু করে বলবে সবাইকে, কলা দেখিয়ে এসেছি মহামান্য রাজা হেনরীকে।'

চোখ গরম করে বিশপের দিকে চাইলেন রাজা। 'তাই বলবে বুঝি?'

'তা তো বলবেই,' বললেন বিশপ। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে। আর একবার শেরউডে পৌঁছে গেলে ফের ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না।'

'তাই মনে হচ্ছে আপনার,' বললেন রাজা। 'কিন্তু এ ভুলটা ভেঙে যাবে আপনার শীঘ্রিই। চল্লিশটা দিন পার হতে দিন, তারপর দেখাবো আমি কাকে বলে তেলেসমাতি। দরকার হলে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব গোটা শেরউড জঙ্গল। রাজার ক্ষমতা কতখানি সেটা কল্পনাও করতে পারছে না ও। কতদিন পারবে সে টিকতে?—বাহিনীর পর বাহিনী পাঠাবো, যেমন করে হোক ধরে আনবো ওকে জীবিত বা মৃত।'

নরম মসৃণ কণ্ঠে বললেন বিশপ, 'ক্ষমা করবেন, ইয়োর ম্যাজেস্টি, আপনার সাথে আমি ঠিক একমত হতে পারছি না। দয়া করে একে ঔদ্ধত্য মনে করবেন না। আসলে ইংল্যাণ্ড ও তার রাজার মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই বলছি কথাটা—গোটা শেরউড মাটিতে মিশিয়ে দিলেই কি ধরা পড়ে যাবে বদমাশটা? আর জঙ্গল নেই? শেরউডের কাছেই রয়েছে ক্যানক চেজ, সেখানে গিয়ে ডেরা বাঁধতে অসুবিধে কোথায় তার? জঙ্গলের তো কোন অভাব নেই; নটিংহাম, ডার্বি, লিংকন, ইয়র্ক....আর কত নাম করবো, সব অঞ্চলেই রয়েছে বিশাল সব জঙ্গল—লুকানোর জায়গার অভাব পড়বে না তার; খড়ের গাদায় হারিয়ে যাওয়া সূচের মত গায়েব হয়ে যাবে ও। না, ইয়োর ম্যাজেস্টি, একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে চিরকালের মত হারাতে হবে আপনার তাকে।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর দু'আঙুলের মাথা দিয়ে টপাটপ তবলা বাজালেন

রাজা। 'তাহলে কি করতে বলেন আপনি আমাকে, বিশপ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলেন তিনি। 'রানীকে কি কথা দিয়েছি শোনেননি আপনি? পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া কয়লায় অযথা ফুঁ দিয়ে লাভ আছে কিছু?'

'না, মাই গ্রেশাস লর্ড,' চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন এবার বিশপ, 'আপনার মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজাকে কোন পরামর্শ দেয়ার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে জিজ্ঞেস করছেন বলেই বলছি, আমি যদি ইংল্যাণ্ডের রাজা হতাম, ব্যাপারটাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতাম। আমি চিন্তা করতাম, লোকগুলোর পরিচয় প্রকাশ না করে রানী আমার কাছ থেকে ঝটপট্ করে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ না দিয়েই একটা শপথ আদায় করে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যখনই জানতে পারলাম লোকগুলো রাষ্ট্রদ্রোহী ভয়ঙ্কর দস্যু, তাদের হাতের মুঠোয় পেয়েও কি ছেড়ে দেয়া উচিত হবে আমার? গোটা দেশের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এর সাথে। ধরুন, রানীকে কোন দুর্বল মুহূর্তে বললাম—তুমি যা বলবে তাই করবো, রানী যদি বলেন—আত্মহত্যা করো, ব্যাস, ঘ্যাঁচ করে বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়া কি উচিত হবে আমার? হাজার হোক, মহামান্যা রানী একজন স্ত্রীলোক বই তো নয়, রাষ্ট্রীয় কঠিন সব ব্যাপার বোঝা তাঁর কর্ম নয়, এই বিশেষ দস্যুর কিছু কিছু কীর্তিকলাপ শুনে হয়তো মুগ্ধ হয়েছেন তিনি সাময়িকভাবে, কোন সন্দেহ নেই দু'দিন বাদেই এর ব্যাপারে সমস্ত আগ্রহ হারাবেন তিনি। আমার কি উচিত হবে এই মুহূর্তে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়ে চল্লিশ দিন পর তাকে বনে-বাদাড়ে তাড়া করে বিফল হয়ে সবার কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া?' এইভাবে একের পর এক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সুচতুর ভাবে বাক্য সাজিয়ে চললেন বিশপ। শুনতে শুনতে মত পরিবর্তন করে ফেললেন রাজা। হঠাৎ আদেশ দিলেন স্যার রবার্ট লী-কে, যেন এক্ষুণি রক্ষী পাঠিয়ে ধরে নিয়ে আসেন রবিন হুড আর তার তিন সঙ্গীকে।

অত্যন্ত ভদ্র এবং মহৎ হৃদয়ের অধিকারী বলে খ্যাত স্যার রবার্ট লীর খুবই খারাপ লাগলো রাজার কথার এরকম বরখেলাপ হতে দেখে, কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বললেন না। সাথে সাথেই রক্ষী-দল না পাঠিয়ে প্রথমে সোজা গিয়ে দেখা করলেন তিনি রানীর সাথে। রবিন হুডের প্রতি কোন রকম দুর্বলতার জন্যে নয়, রাজার সম্মান রক্ষার জন্যেই তিনি আগে-ভাগে খবরটা জানিয়ে রবিন হুডকে সতর্ক করে দেয়ার পরামর্শ দিলেন রানীকে, গ্রেফতারের জন্যে যখন লোক পাঠালেন, তখন বেশ কয়েক মাইল দূরে সরে গেছে রবিন ও তার সঙ্গীরা। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাজাকে গিয়ে খবর দিলেন, ফিনসবারি ময়দানে পাওয়া গেল না ওদের।

রবিন হুড, লিটল জন, উইল ও অ্যালান যখন রওনা হয় তখনই দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। হলুদ তেরছা রোদের মধ্যে দিয়ে খুশি মনে লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছে ওরা। লালচে হয়ে এলো রোদটা, পশ্চিম দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে এখন সূর্য, ছায়াগুলো দীর্ঘ হতে হতে দৈত্য হয়ে উঠেছে। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল সব ছায়া ম্লান গোধূলির সাথে। কালচে হয়ে গেল ধূলি-মলিন সাদা রাস্তার দু'পাশে ঝোপঝাড়গুলো। হাঁটছে ওরা, যেন চারটে ছায়া। ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠলো পুবের আকাশে। মনে হচ্ছে, দম আটকে রেখে ঝুলছে গোল চাঁদটা। দূরে টিপ টিপ করছে বার্নেট শহরের বাতিগুলো। লণ্ডন থেকে বারো মাইল সরে এসেছে ওরা।

বার্নেট শহরের পাথুরে রাস্তা ধরে চলতে চলতে ছোট্ট একটা সরাইখানা দেখে থেমে দাঁড়ালো রবিন। 'এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই, কি বলো তোমরা? অনেক দূর তো সরে এসেছি লণ্ডন থেকে।'

'ঠিক,' বললো লিটল জন। 'তোমার কথা আর আমার কাজ—এক্কেবারে খাপে খাপে মিলে যায়, ওস্তাদ। এখানেই ঢুকে পড়া যাক।'

'কিন্তু, মামা,' আপত্তি জানালো উইল স্কারলেট। 'আরো খানিক দূর এগিয়ে গেলে

বোধহয় ভাল হতো। যথেষ্ট দূরে সরে এসেছি বলে মনে হচ্ছে না আমার। যাই হোক, তুমি যখন বলছো…'

ঢুকে পড়লো ওরা সরাইখানায়। সেরা খাবার আর মদের অর্ডার দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল সবাই। সুন্দরী এক তরুণী খাবার সাজিয়ে দিল টেবিলে। তার প্রতি লিটল জনের একটু অতি-আগ্রহ দেখে তাই নিয়ে রসিকতা করলো রবিন। হাসি-গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেয়ে নিয়ে হাতে তুললো মদের গ্লাস। পরস্পরের গ্লাসের সাথে ঠোকাঠুকি করে নিয়ে একটা চুমুক দিতেই সরাইখানার মালিক এসে হাজির হলো, খবর দিল, রিচার্ড পার্টিংটন নামে মহামান্যা রানীর একজন সুদর্শন পরিচারক দেখা করতে চায় নীল পোশাক পরা যুবকের সাথে। গ্লাস নামিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো রবিন, সরাইখানার মালিককে সাথে আসতে বারণ করে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে বাকি সবাই।

চাঁদের আলোয় দুধ-সাদা ঘোড়ায় চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে রিচার্ড পার্টিংটন, হাসিমুখে রবিন বললো, 'কি খবর, পরিচারক মশায়? আবার কোন খারাপ সংবাদ নেই তো?'

'আছে,' জবাব দিল পার্টিংটন। 'খুবই খারাপ সংবাদ বয়ে এনেছি আমি। হেরিফোর্ডের বিশপের প্ররোচনায় ভয়ঙ্কর খেপে গেছেন রাজা। আপনাদের গ্রেফতার করার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছিল ফিনসবারি ময়দানে। সেখানে না পেয়ে সেনাবাহিনী তলব করেছেন তিনি। এক হাজারেরও বেশি সৈন্য পাঠানো হচ্ছে এই রাস্তা ধরে শেরউডের দিকে, পথে পেলে পথেই গ্রেফতার করবে আপনাকে, না পেলে সোজা এগিয়ে গিয়ে আপনার শেরউডে ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেবে। বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হেরিফোর্ডের বিশপকে। ওই লোকটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন কিছু জানাবার দরকার নেই—হাতে পেলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে সে আপনাকে। ইতিমধ্যেই ঘোড়সওয়ারের দুটো দল রওনা হয়ে গেছে, এখানে পৌছতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। আমাকে রানী এলেনর পাঠিয়েছেন আপনাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে। আর এক মুহূর্ত এখানে দেরি করা উচিত হবে না আপনার।'

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক কণ্ঠে বললো রবিন। 'বুঝতে পারছি, আমার জীবনের এক চরম মুহূর্ত এসে হাজির হয়েছে। এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে অস্ত্র বা গায়ের জোরে চলবে না, কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা হবে আমার হাতিয়ার। ঠিক আছে, আমার সমস্ত ক্ষমতার পরিপূর্ণ প্রয়োগ প্রয়োজন পড়বে এবার, তাই করবো। রানীকে গিয়ে বলবেন, তিনি আমার জন্যে যেটুকু করেছেন তাতেই আমি ধন্য হয়ে গিয়েছি, আমি জানি অবস্থার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই—যদি ধরা পড়ে মারা যাই, তাঁকে কোন রকমে দায়ী মনে করবো না। বিদায়।'

'বিদায়। প্রার্থনা করি, যেন নিরাপদে পৌছতে পারেন শেরউডে।'

করমর্দন করে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লণ্ডনের দিকে রওনা হয়ে গেল রিচার্ড পার্টিংটন, সরাইখানায় গিয়ে ঢুকলো রবিন হুড।

উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছে ওর সঙ্গীরা। সরাইখানার মালিকও অপেক্ষা করছে ওদের সঙ্গে, ব্যাপার কি জানার জন্যে; রিচার্ড পার্টিংটনের এই আকস্মিক আগমনে দারুণ কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে তার মনে। 'উঠে পড়ো সবাই,' বললো রবিন, 'পিছু ধাওয়া করেছে ওরা আমাদের, ধরা পড়ে গেলে রক্ষে নেই। আবার রওনা দিতে হবে আমাদের এক্ষুণি, সারা রাত হেঁটে একেবারে সেই সেন্ট অ্যালবান্সে পৌছে তারপর বিশ্রাম।' সরাইখানার বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা ব্যস্ত পদক্ষেপে।

রাজপথ ধরে এগিয়ে শহরের বাইরে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো রবিন, সমস্ত ঘটনা খুলে বললো আর সবাইকে। তারপর বললো, এখান থেকেই দুটো দলে ভাগ হয়ে যাবে ওরা; লিটল জন, উইল স্কারলেট আর অ্যালান-এ-ডেল ধরবে পুবের পথ, ও একা চলে

যাবে পশ্চিম দিকে; রাজপথ পরিহার করে ঘুরপথে নানান অলিগলি ধরে পৌঁছবার চেষ্টা করবে শেরউডে। 'প্রথম দু'দিন উত্তরের রাস্তায় যাবে না, বহুদূর পুবে সরে গিয়ে তারপর উত্তরের পথ ধরতে পারো, কিন্তু রাজপথ যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। তোমাদের তিনজনের নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি উইল স্কারলেটের ওপর। উইল, বুদ্ধি খাটিয়ে দায়িত্ব পালন করবে, সবাইকে জীবিত অবস্থায় দেখতে চাই আমি শেরউডে।'

অবাক হয়ে লিটল জন জিজ্ঞেস করলো, 'তবে যে বললে সেন্ট অ্যালবান্সের পথে সারা রাত ধরে...'

'সরাইখানার মালিকের মুখে এই কথা শুনে সেনা বাহিনী ভুল পথে আমাদের পিছু ধাওয়া করুক, তাই চেয়েছিলাম। রওনা হয়ে যাও তাহলে তোমরা। বিদায়!' সবার গালে চুমো খেলো রবিন, ওরাও চুমো খেল রবিনের গালে। দুই ভাগ হয়ে দুই পথে রওনা হয়ে গেল ওরা।

এই ঘটনার পর বেশিক্ষণ যায়নি, সেনা বাহিনীর বিশ-পঁচিশজন ঘোড়সওয়ার এসে ঘিরে ফেললো বার্নেট শহরের সেই সরাইখানাটা। জনা চারেক লোক সাথে নিয়ে দলনেতা ঢুকলো ভেতরে, কিন্তু গিয়ে দেখলো খাঁচা শূন্য, উড়ে গেছে পাখি।

'ওরা লোক যে ভাল নয়, এ আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম,' কাকে খোঁজা হচ্ছে জানতে পেরে বললো সরাইখানার মালিক। 'রওনা হবার আগে নীল পোশাক পরা লোকটাকে বলতে শুনেছি, সোজা সেন্ট অ্যালবান্সের পথে হাঁটবে আজ সারারাত। এখুনি ছুটলে পথেই পেয়ে যাবে ওদের।' মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে সাথে সাথেই বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ায় চাপলো ওরা, কাল বিলম্ব না করে ছুটলো রাজপথ ধরে।

এদিকে অবিশ্রাম হেঁটে চলেছে উইল স্কারলেট, লিটল জন আর অ্যালান-এ-ডেল পুবের পথ ধরে; পরদিনও কোথাও থামলো না, যতক্ষণ পর্যন্ত পারা যায়, সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, হাঁটতেই থাকবে। হাঁটতে হাঁটতে এসেক্সের চেম্‌স্‌ফোর্ডে এসে পৌঁছলো। ওখান থেকে বিশ্রাম নিয়ে আবার উত্তর মুখো পথ ধরে কেমব্রিজ আর লিংকনশায়ারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পৌঁছলো গেইনস্‌বারো শহরে। সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কোনাকুনি এগিয়ে পৌঁছে গেল শেরউড জঙ্গলের উত্তর সীমান্তে। পুরো আটদিন ধরে হেঁটেছে, কিন্তু পথে একটি সৈনিকের সাথেও দেখা হয়নি ওদের। নিরাপদে শেরউডে পৌঁছতে পেরে স্বস্তির বিরাট এক হাঁফ ছাড়লো ওরা, কিন্তু আস্তানায় পৌঁছেই মনটা কালো হয়ে গেল ওদের—এখনও ফিরে আসেনি রবিন।

বার্নেট শহরের কাছে রাজপথ ছেড়ে পশ্চিম মুখো পথ ধরেছে রবিন, এইল্‌স্‌বারি ছাড়িয়ে অক্সফোর্ডশায়ারের উডস্টকে পৌঁছে আবার হাঁটতে শুরু করলো উত্তর দিকে। ওয়ারউইক শহর পেরিয়ে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ডাডলি শহরে পৌঁছতেই লেগে গেল ওর পুরো সাতদিন। যথেষ্ট উত্তরে আসা হয়েছে, আন্দাজ করে এবার পুবের পথ ধরলো সে। রাজপথের ধারে-কাছে ঘেঁষলো না, কখনো সরু রাস্তা, কখনো মেঠো পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে লিচফিল্ড আর অ্যাশবি ডি লা যুখের মধ্যে দিয়ে এগোলো শেরউডের দিকে। স্ট্যানটনে পৌঁছে খুশিতে নাচতে শুরু করলো ওর হৃদয়টা, হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে; ভাবছে, সব বিপদ কেটে গেছে, এই আর কিছুদূর এগোলেই জঙ্গলের গন্ধ আসবে নাকে। বেচারা জানেও না সামনে কতবড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে।

রাজার সেনা বাহিনীর প্রথম দলটা সেন্ট অ্যালবান্সে পৌঁছে বোকা বনে গেল। পথে পাওয়া যায়নি রবিন হুড বা তার সঙ্গীদের, শহরেও তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেল না ওদের। দফায় দফায় আসছে অশ্বারোহী সৈন্যের দল, ক্রমে গোটা শহরের চন্দ্রালোকিত রাস্তা বোঝাই হয়ে গেল; থতমত খেয়ে গেছে ওরা, কি করতে হবে বুঝতে পারছে না। ভোর-রাতের দিকে আরেক দল সৈন্য এলো, তাদের সঙ্গে এলেন হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ।

সব ঘটনা শুনে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেন না বিশপ, কাল বিলম্ব না করে সবাইকে নিয়ে ছুটলেন সোজা উত্তরে, একজনকে রেখে গেলেন সেন্ট অ্যালবান্সে—আরও যে-সব সৈন্যদল আসছে তাদের তাঁকে অনুসরণ করতে বলার জন্যে। চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় পৌছলেন তিনি নটিংহাম শহরে, পৌছেই সেনা-বাহিনীকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে চারপাশ থেকে শেরউড জঙ্গলে ঢোকার সমস্ত রাস্তা, গলি, উপগলি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। নটিংহামের শেরিফ দেখলেন, এই সুযোগ, রবিন হুডকে ধ্বংস করার এমন মওকা আর পাওয়া যাবে না; কাজেই জঙ্গল-রক্ষী আর কনস্টেবলদের নিয়ে এক বিরাট বাহিনী তৈরি করে পাঠালেন রাজার সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যে। এই কঠোর পাহারা অতিক্রম করে একটা কাকপক্ষিরও শেরউডে ঢোকার উপায় থাকলো না। প্রথমে বন্ধ করা হলো দক্ষিণের সমস্ত পথ, তারপর পুব ও পশ্চিমের সবগুলো রাস্তা, সবশেষে প্রহরার ব্যবস্থা হলো উত্তরে। উইল স্কারলেট, লিটল জন আর অ্যালান-এ-ডেল যেদিন উত্তর দিক থেকে জঙ্গলে ঢুকলো, তার পরদিনই বন্ধ হয়ে গেল সেদিকের সমস্ত পথঘাট; যদি একটা দিন দেরি করতো কোথাও, কোন সন্দেহ নেই, ধরা পড়তো ওরা হয় রাজা নয় শেরিফের লোকের হাতে।

এসব ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানে না রবিন, স্ট্যানটন ছাড়িয়ে মনের সুখে শিস দিতে দিতে চলেছে সে শেরউডের দিকে। পথের ধারে ছোট্ট একটা চঞ্চল ঝর্ণা দেখে তেষ্টা পেল ওর, নেমে গিয়ে দাঁড়ালো ঝর্ণার ধারে, আঁজলা ভরে পানি তুলে খাচ্ছে। পথের দু'পাশেই ছোট ছোট গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া জঙ্গল, কিচির মিচির করছে পাখিগুলো, ওর মনে পড়ে যাচ্ছে শেরউডের কথা, পরিষ্কার বুঝতে পারছে কতটা ভালবাসে ও শেরউড জঙ্গলকে, মনে হচ্ছে কত যুগ ধরে যেন শ্বাস নিতে পারেনি, জঙ্গলের বিচিত্র গন্ধ ভরা বাতাস বুক ভরে নিতে পারলে আসবে তৃপ্তি।

সামনে ঝুঁকে পানি খাচ্ছে রবিন, এমনি সময়ে সাঁ করে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল কি যেন, ছপাৎ করে পড়লো পানিতে। তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রবিন, চোখের পলকে এক লাফে পেরিয়ে গেল ঝর্ণাটা, দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো ওপাশের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে। একবারও পিছনে ফিরে চাইলো না সে, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেই মৃত্যু ঘটবে এখন, কারণ কানের পাশ ঘেঁষে কি জিনিস গেছে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি তার—কোন সন্দেহ নেই, তীর মেরেছে কেউ। ঝোপের আড়ালে পৌছবার আগেই আরও ছয়টা তীর এসে বিঁধলো ওর আশেপাশে, একটা লাগলো ওর পাঁজরে—লোহার জাল দিয়ে তৈরি বর্ম পরা না থাকলে ওই এক তীরেই মারা পড়তো রবিন। ছুটে এসে রাস্তার ওপর থামলো কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য, ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই ধাওয়া করলো রবিনের পিছনে।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রবিনকে ধরা মুশকিল। কখনও কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে হাঁটছে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, কখনও বা দৌড়ে পেরিয়ে যাচ্ছে ছোট ফাঁকা জায়গা—এইভাবে সৈন্যদেরকে বেশ অনেকটা পেছনে ফেলে পাঁচশো গজ দূরের আর একটা রাস্তায় উঠে পড়লো সে। কান পেতে শুনলো দূর থেকে ভেসে আসা সৈন্যদের হাঁকডাকের আওয়াজ, তারপর কোমরের বাঁধন এঁটে নিয়ে তীরবেগে ছুটলো নাক বরাবর পুব দিকে, শেরউডের উদ্দেশে।

আধ মাইলের মত দৌড়ে হঠাৎ একটা পাহাড়ের মাথায় থমকে দাঁড়ালো রবিন। নিচে দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় বসে রয়েছে আর একদল সৈন্য। যদিও ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবু এখন যে পথে এসেছে সেই পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। ভাগ্যিশ দেখতে পায়নি ওকে নিচের লোকগুলো! ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করলো রবিন। কপাল ভাল, ঝোপ-ঝাড় আর ছোট ছোট গাছের সেই জঙ্গলটা ছাড়িয়ে সিকি মাইল চলে যাওয়ার পর ওর পিছু

ধাওয়া রত দলটা উঠে এলো রাস্তায়। ছুটন্ত অবস্থায় ওকে দেখতে পেয়ে যথেষ্ট শোরগোল তুললো, কিছুদূর পর্যন্ত তাড়াও করলো—কিন্তু পাখির মত ডানা গজিয়ে গেছে যেন রবিনের, প্রাণভয়ে উড়ে চলেছে সে রাস্তার ওপর দিয়ে, নাগাল পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে থেমে গেল দলটা। মাইলের পর মাইল দৌড়ে ডার্বি শহর সংলগ্ন ম্যাকওয়ার্থের কাছাকাছি এসে গতি কিছুটা কমালো রবিন। যখন মনে করলো এই মুহূর্তে বিপদের আর কোন সম্ভাবনা নেই, তখন দম নেবার জন্যে বসলো এক ঝোপের ঠাণ্ডা ছায়ায়।

'সেরেছিল!' মনে মনে বললো রবিন, 'আর একটু হলেই গেছিলাম আজ! ওই তীরের পালকগুলো, বাপ রে, কান ছুঁয়ে গেছে একেবারে! কিন্তু…খিদে আর তেষ্টার কি ব্যবস্থা করা যায়? এতটা দৌড়ে একেবারে খালি হয়ে গেছে পেটটা। সেইন্ট ডানস্ট্যান, জলদি কিছু মাংস আর বিয়ার পাঠাও, নইলে গেলাম!'

কাছাকাছি হয়তো ছিলেন, রবিনের কথাটা শুনে ফেললেন সেইন্ট, এবং সাথে সাথে মঞ্জুর করে দিলেন প্রার্থনা। ডার্বির এক মুচিকে দেখা গেল আসছে এদিকেই। কার্ক ল্যাংলির দিকে এক গেরস্তের জন্যে একজোড়া জুতো বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মুচি কুইন্স, ফিরে আসছে এখন। গেরস্ত ওকে তিন শিলিং ছয় পেনস আধ পেনি দিয়েছে চমৎকার জুতো জোড়ার জন্যে, তার ওপর খুশি হয়ে একটা সেদ্ধ খাসি-মোরগ দিয়েছে ওকে খাবার জন্যে, সেই সাথে দিয়েছে এক বোতল বিয়ার। অত্যন্ত সৎ লোক এই কুইন্স, কিন্তু বুদ্ধিটা বেজায় মোটা। ওর মাথার মধ্যে বার বার একটা কথাই ঘুরছে কাটা রেকর্ডের মত, 'তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ পেনি দিলাম, হে কুইন্স, সুন্দর জুতো জোড়া, তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ পেনি দিলাম।' এই পুনরাবৃত্তির ফাঁক গলে আর কোন চিন্তা পথ খুঁজে পাচ্ছে না ওর মাথায় ঢোকার।

'এই যে, ভাই,' ছায়ায় বসে হাঁক ছাড়লো রবিন, 'কোথায় চলেছো এত খুশি মনে?'

ডাক শুনে থামলো কুইন্স। চমৎকার নীল পোশাক পরা এক সুন্দর যুবক তাকে ভাই বলে ডেকেছে বলে দারুণ খুশি হলো সে। বললো, 'কার্ক ল্যাংলির দিক থেকে আসছি আমি, যাব ডার্বি শহরে। বুঝলেন, একজোড়া জুতো যা বানিয়েছিলাম না, সাংঘাতিক! পুরো তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ পেনি দিয়েছে আমাকে গেরস্ত…খোদার কসম! সৎ ভাবে পরিশ্রম করেছি বলেই না পয়সাটা দিয়েছে, কি বলেন? সেইজন্যেই খুশি দেখতে পাচ্ছেন আমাকে, স্যার। কিন্তু…কিছু যদি মনে না করেন… আপনি, মানে, এত সুন্দর পোশাক পরে ঝোপের নিচে বসে কি করছেন?'

'আমি এখানে বসে বসে সোনার পাখির লেজের ওপর লবণ দিচ্ছি,' বললো রবিন।

'তাই নাকি!' ছানা বড়া হয়ে গেল মুচির চোখ জোড়া। 'সত্যিই? সোনার পাখি কোনদিন দেখিনি আমি। এই ঝোপের নিচে আসে বুঝি? ঠিক আছে, আমিও তাহলে একদিন আসবো। আমিও ধরবো সোনার পাখি। সত্যিই ওদের লেজের ওপর লবণ দিলে ধরা যায়?'

'তা যায়, কিন্তু যা-তা লবণে আবার চলবে না,' বললো রবিন। 'এক গামলা চাঁদের আলো কাঠের পাত্রে নিয়ে জ্বাল দিতে হবে, তাও পাবে মাত্র এক চিমটি। যাই হোক, তোমার ঝোলার ভেতর কি আছে বললে না?'

সোনার পাখির কথায় কাঁধে যে একটা ঝোলা আছে, তা-ই ভুলে গিয়েছিল কুইন্স। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো ওটার দিকে, অনেক কষ্টে মনে করতে পারলো কি আছে ওর ভেতর। অনিশ্চয়তার হাসি হেসে বললো, 'বলিনি বুঝি? আসলে ভুলে গিয়েছিলাম বলতে। মোটা-তাজা একটা খাসি-মোরগ সেদ্ধ রয়েছে এর মধ্যে, আর আছে এক বোতল বিয়ার। ওফ্, যা মজা করে খাবো না!'

'বেচবে ওগুলো আমার কাছে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'শুনেই জিভে পানি এসে

গেছে আমার। বিনিময়ে এই দামী নীল পোশাক তো দেবই, আরও দশ শিলিং দেব আমি তোমার জামা কাপড়, চামড়ার অ্যাপ্রন, বিয়ার আর মোরগের জন্যে। কি বলো, বেচবে?'

'আপনি ঠাট্টা করছেন, স্যার,' বললো মুচি। 'আমার এই নোংরা মোটা কাপড়ের বদলে আপনার ওই দামী…'

'জীবনে কখনো ঠাট্টা করিনি আমি কারো সাথে,' কুইন্সকে বেশি ভাবনা চিন্তার সুযোগ না দিয়ে বললো রবিন। 'এসো, এক্ষুণি বদল হয়ে যাক। তোমার পোশাক ভাল না বলছো, কিন্তু আমার কাছে তো চমৎকার লাগছে। কাপড় বদলে এসো, দু'জনে মিলে খেয়ে নিই একসাথে বসে।' কথা বলতে বলতে নিজের পোশাক ছাড়তে শুরু করলো রবিন। তাই দেখে নিজের কাপড় খুলতে শুরু করলো কুইন্সও। পোশাক বিনিময় হয়ে যেতেই চকচকে দশটা শিলিং গুঁজে দিল রবিন মুচির হাতে। দু'জনে এবার বসে পড়লো

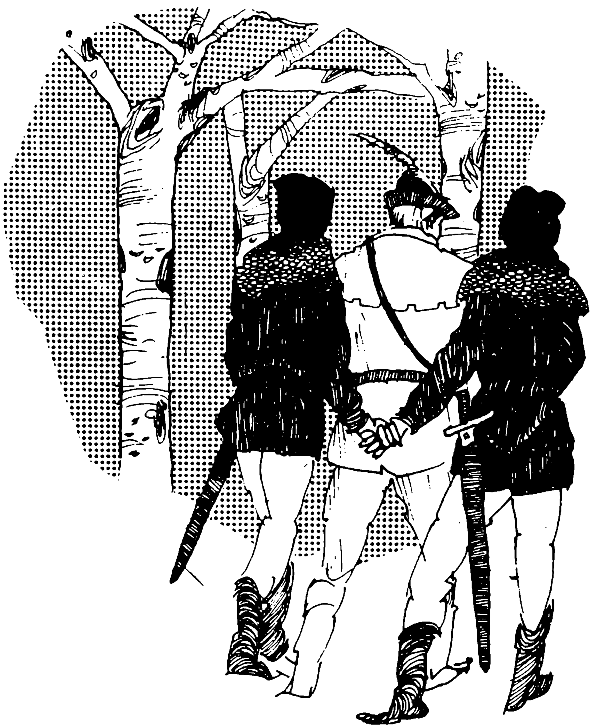

মোরগ আর বিয়ার নিয়ে। খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলে লম্বা করে পা ছড়িয়ে দিল রবিন। মনে মনে ধন্যবাদ দিল সেইন্ট ডানস্ট্যানকে।

এমনি সময়ে হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে হাজির হলো ছয়জন অশ্বারোহী সৈন্য, তড়াক করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়লো নীল পোশাক পরা কুইন্সের ওপর, দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। হকচকিয়ে গেল কুইন্স।

'ধরা পড়তেই হলো শেষ পর্যন্ত, কি বলো?' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো সৈন্য দলের

নেতা। 'সেইন্ট হিউবার্টকে ধন্যবাদ, চার-কুড়ি পাউণ্ড উপরি রোজগার হয়ে গেল। বদমাশটাকে ধরে দিতে পারলে দলনেতাকে নিজের পকেট থেকে এই পুরস্কার দেবেন বলেছেন হেরিফোর্ডের বিশপ। খুব ভোগান ভুগিয়েছো, বাছা! আহা-হা! বদমাশের ধাড়িকে দেখো, চেহারাটা এমন করেছে, যেন কিছুই জানে না, নিতান্ত নির্দোষ গোবেচারা! ওসব চালাকি দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বাবা! চলো, অভিনয় করে লাভ নেই, ভাল করেই চিনি আমরা তোমাকে।'

জবান বন্ধ হয়ে গেছে কুইন্সের। বড় বড় নীল চোখ মেলে বোকার মত চারপাশে তাকাচ্ছে, আর ঢোক গিলছে। দেখে মনে হচ্ছে হারিয়ে ফেলেছে বোধশক্তিও।

হতবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো রবিন ওদের দিকে, বার কয়েক মুখ খুললো এবং বন্ধ করলো, তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বললো, 'কি বলছেন আপনারা? কি ঘটছে এসব? জেগে আছি, না স্বপ্নে? এমন মিষ্টভাষী, সৎ লোককে বদমাশের ধাড়ি বলছেন···নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে আপনাদের, ভুল করে অন্য লোক ভেবে···'

'চোপ রাও!' ধমক দিল দলপতি। 'চেনো একে?' বোকার মত রবিনকে মাথা নাড়তে দেখে বললো, 'এ হচ্ছে ভয়ঙ্কর এক দস্যু, রবিন হুড!'

কথা শুনে ছানাবড়া হয়ে উঠলো কুইন্সের সরল দুই চোখ। মাথার মধ্যে সবকিছু জট পাকিয়ে গেছে বেচারার। একবার রবিন হুডের দিকে চাইলো, তারপর চাইলো নিজের পোশাকের দিকে। মনের মধ্যে সন্দেহের উদয় হলো, সত্যিই কি সে কুইন্স নামের এক মুচি, নাকি এরা যা বলছে—সেই বিখ্যাত দস্যু রবিন হুড? নিচু গলায় বিড়বিড় করতে শুরু করলো ও, 'আমিই কি সেই লোকটা?···কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে···না, মুচি তো ওই লোকটা, আমি কুইন্স হই কি করে! উঁহুঁ, মনে হচ্ছে তাহলে সত্যিই আমি রবিন হুড।···কিন্তু···'

'হায়, হায়!' দুঃখিত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো রবিন। 'দেখুন বেচারার অবস্থাটা! আপনার দাবড়ি খেয়ে এমনই ঘাবড়ে গেছে যে মাথার মধ্যে গোল পাকিয়ে ফেলেছে সব। কুইন্স তো আমি, ডার্বি শহরের মুচি।'

'তাই নাকি?' এতক্ষণে পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা কুইন্সের কাছে, 'তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই, সত্যিই আমি রবিন হুড। শোনো, ধরা পড়ে গেছি বটে, কিন্তু খেয়াল রেখো, আমি হচ্ছি শেরউড জঙ্গলের রাজা, আমার সমান দস্যু আর কোথাও পাবে না তোমরা খুঁজে।'

'পাগলামির ভান হচ্ছে, অ্যাঁ?' খেপে উঠলো দলপতি, 'দাঁড়াও, তোমার পাগলামি বের করছি! বাঁধো দেখি পিছমোড়া করে হারামীর হাত দু'টো, বিশপের সামনে নিয়ে ঝেড়ে খানিক প্যাঁদানি দিলেই ছুটে যাবে পাগলামি। চল্ ব্যাটা, বেশি তেরিবেরি করলে খুন হয়ে যাবি আমার হাতে!'

হাত বেঁধে কুইন্সকে নিয়ে চলে গেল ওরা। দলটা চোখের আড়াল হতেই হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল রবিনের। মুচি বেচারার কোন ক্ষতি হবে না, ও জানে। কিন্তু বিশপের সামনে ওকে নিয়ে হাজির করলে বিশপের চেহারা কি রূপ ধারণ করবে, সেটা ভেবেই হাসি আর সামলাতে পারছে না সে। প্রাণ ভরে হেসে নিয়ে আবার পুব দিক লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করলো রবিন, শেরউডের দিকে, সম্ভব হলে আজই মুচির ছদ্মবেশে রাজার সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়বে জঙ্গলে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পা-জোড়া বেঁকে বসলো রবিনের। এই ক'দিনে একশো চল্লিশ মাইলেরও বেশি হেঁটেছে সে। শেরউডের পথে মাইল দশেক এগিয়েই হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে গেল সব শক্তি, পায়ের ওপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকলো না, মনে হচ্ছে আর এক পা এগোলে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাবে হুমড়ি খেয়ে। রাস্তার ধারে বসে

খানিক বিশ্রাম নিল বটে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারলো এই পা নিয়ে আজ আর শেরউডে পৌছানো সম্ভব হবে না তার পক্ষে। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখলো সে। এবার মাইল দুয়েক গিয়ে কাঁপতে শুরু করলো পা দু'টো। হাল ছেড়ে দিয়ে কাছেই একটা সরাইখানায় গিয়ে হাজির হলো রবিন, মালিককে ডেকে ভাড়া নিল একটা কামরা। মাত্র তিনটে ঘর রয়েছে সরাইখানায়, তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে খারাপ সেটাই মুচির জন্যে উপযুক্ত হবে বলে মনে করলো মালিক। কামরাটা খুবই অপছন্দ হলো রবিনের, কিন্তু কিছুই বললো না–এখন কোনরকম একটা বিছানা পেলেই হয়, ভাঙা ইঁট-পাথরের ওপর ঘুমাতেও আপত্তি নেই। জামা-কাপড় ছেড়ে উঠে পড়লো সে বিছানায়, বালিশে মাথা ছোঁয়াবার প্রায় সাথে সাথেই ঢলে পড়লো গভীর নিদ্রায়।

এদিকে রবিন ঘুমিয়ে পড়ার পর-পরই কালো মেঘ জমলো আকাশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড় ডিঙিয়ে গোটা আকাশ ঢেকে দিতে দিতে এগিয়ে এলো মেঘটা, ঝিক ঝিক বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে–মনে হচ্ছে কে যেন হলুদ কালি দিয়ে দ্রুত হাতে সই করছে মেঘের গায়ে। একটু পরেই এলো বাতাসের ঝাপটা, সেই সাথে কড়-কড়াৎ বজ্রের নির্ঘোষ। এমনি সময়ে নটিংহাম শহরের জনা চারেক ধনী লোক এসে হাজির হলো ঘোড়ায় চেপে। ড্রনফিল্ড থেকে নটিংহামে ফিরছিল ওরা, ঝড়-বৃষ্টি এড়াবার জন্যে রাতটা এই সরাইখানায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘোড়াগুলো আস্তাবলে তুলে দিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিল ওরা, তারপর ঢুকলো গিয়ে শোবার ঘরে। ঘর দু'টো সুন্দর করে সাজানো বটে, কিন্তু এক বিছানায় দু'জন করে ঘুমাতে হবে দেখে গজ গজ করলো ওরা খানিকক্ষণ, তারপর জামা-কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো। পরিশ্রান্ত ছিল, ঘুম আসতে দেরি হলো না বিশেষ।

হাওয়ার জোর বেড়েছে আরো, দড়াম দড়াম দরজা-জানালা আছড়াচ্ছে, ধুলোয় ধোঁয়াটে হয়ে গেছে চারদিক। খানিক পর এলো বৃষ্টির ভেজা গন্ধ। ঠিক সেই সময়ে তাড়াহুড়ো করে দরজা ঠেলে সরাইখানায় ঢুকলেন এমেট মঠের অত্যন্ত দামী কাপড়ের আলখেল্লা পরা এক উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসী। তাঁর হাঁক-ডাকে তটস্থ হয়ে উঠলো সরাইখানার মালিক, সসম্মানে ভাল ভাল খাবার এনে হাজির করলো সামনে। খাবার দেখে খুশি হলেন সন্ন্যাসী, খেলেনও পেট পুরে, কিন্তু যখন শুনলেন ঘর খালি নেই, একটা মুচির সাথে একই বিছানায় ঘুমাতে হবে তাঁকে, মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল তাঁর। উপায়ও নেই আর কোন। তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে বাইরে, বাজ পড়ছে মুহুর্মুহু: এর মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোন সরাইখানার খোঁজ করবেন সেটা সম্ভব নয়–কাজেই অগত্যা মোমবাতি হাতে ঢুকে পড়লেন তিনি সেই ঘরেই। মোমের আলোয় ঘুমন্ত রবিনকে আপাদমস্তক দেখে ঘৃণার ভাবটা অনেকখানি দূর হয়ে গেল তাঁর, তিনি আশা করেছিলেন কদাকার নোংরা এক মুচি বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে বুঝি শুয়ে থাকবে বিছানায়, তার বদলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রবিনকে দেখে হাঁপ ছাড়লেন স্বস্তির। পোশাক ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি বিছানায়, যদি জানতেন কার পাশে ঘুমাচ্ছেন, তাহলে ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেত ওঁর, জানেন না বলেই ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্তে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙলো রবিনের। চোখ মেলেই চমকে উঠলো সে পাশেই এক মাথা-কামানো সন্ন্যাসীকে শুয়ে থাকতে দেখে। এই লোক কখন এসে পাশে শুয়েছে টেরও পায়নি সে। আস্তে করে নামলো সে বিছানা থেকে। অঘোরে ঘুমাচ্ছেন সাধু বাবা। ঘরের কোণে সন্ন্যাসীর খুলে রাখা পোশাকের দিকে চাইলো একবার রবিন, তারপর চাইলো সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। ধীরে ধীরে চোখ টিপলো সে ঘুমন্ত সাধুকে উদ্দেশ করে। মনে মনে বললো, 'কিছু মনে করো না, হোলি ফাদার, তুমি যেমন আমাকে না বলে আমার বিছানাটা ব্যবহার করছো, আমিও তেমনি তোমাকে না বলে ধার নিচ্ছি

তোমার পোশাকগুলো।' এই বলে সন্ন্যাসীর জোব্বা গায়ে চাপিয়ে নিল রবিন, মুচির পোশাক ওখানেই ফেলে রেখে খুশি মনে বেরিয়ে গেল সরাইখানা থেকে।

ঘুম থেকে উঠে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন এমেট মঠের সন্ন্যাসী। পাশের লোকটা নেই, তাঁর দামী পোশাক উধাও, ঘরের কোণে পড়ে আছে শুধু মুচির জীর্ণ পোশাক। প্রচুর হাঁক-ডাক করলেন তিনি, গালিগালাচ করলেন অজস্র,কিন্তু কোন লাভ হলো না তাতে; কেউ জানে না কখন কোন্দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে মুচিটা। অত্যন্ত জরুরী এক কাজে এক্ষুণি তাঁর রওনা হয়ে যাওয়া দরকার এমেট মঠের উদ্দেশে, দেরি করার কোন উপায় নেই। এখন হয় মুচির পোশাক পরে নিতে হয়, নয়তো উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটতে হয় রাস্তা দিয়ে। ডার্বিশায়ারের সমস্ত মুচির চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে করতে মুচির পোশাক গায়ে চড়ালেন তিনি, তারপর বেরিয়ে পড়লেন সরাইখানা থেকে। কিন্তু বেচারার কপালটাই আজ খারাপ, কিছুদূর যেতে না যেতেই ধরা পড়লেন রাজার একদল সৈন্যের হাতে। কোন কথাই শুনলো না তারা, ঠেসে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো হেরিফোর্ডের বিশপের কাছে। হেসে খুন হয়ে গেল মুচির ছদ্মবেশ পরা রবিন হুডের মাথা কামিয়ে সন্ন্যাসী সাজার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। বললো, 'বার বার আর ফাঁকি দিতে পারবে না, রবিন হুড! নীল পোশাক পরা মুচিটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে যথেষ্ট ধমক খেয়েছি বিশপের কাছে, খুব ভুগিয়েছো যাহোক!'

ওদিকে খুশি মনে হাঁটছে রবিন। দু'দুটো প্রহরারত সৈন্যদল ডিঙিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে সে শেরউডের দিকে। শেষ পর্যন্ত শেরউডে ফিরতে পারবে বুঝতে পেরে আনন্দে নাচছে হৃদয়টা। আর মাত্র কয়েকটা মাইল। এমেট মঠের সন্ন্যাসীর কপালে কি ঘটেছে জানতে পারলে এতটা নিশ্চিন্ত বোধ করতো না সে।

মুচির পোশাক পরা সাধুকে হেরিফোর্ডের বিশপের সামনে নিয়ে হাজির করতেই হায় হায় করে উঠলেন লর্ড বিশপ। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, আবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে রবিন হুড; নিশ্চয়ই সাধুর পোশাক পরে নিরাপদে শেরউডের পথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে বদমাশটা এতোক্ষণে। স্বল্প-বুদ্ধি সৈন্যদের ওপর আর ভরসা করা যায় না বুঝতে পেরে নিজেই ঘোড়ায় চেপে তীরবেগে ছুটলেন তিনি। পিছনে একদল সশস্ত্র সৈন্য। একবার জঙ্গলে ঢুকে গেলে কিছুতেই আর হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে না রবিন হুডকে, ধরতে হবে ওকে পথেই।

পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না রবিন, সন্ন্যাসী মানুষকে কিছুই বলবে না রাজার সৈন্যদল। কিন্তু কি মনে করে এবার পিছন ফিরে চাইতেই আঁৎকে উঠলো ওর কলজেটা। তুমুল বেগে ছুটে আসছে বারো-চোদ্দটা ঘোড়া, সবার আগে ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ। সাধুর পোশাক পরা রবিনকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ধরো! ধরো! ওই যে রবিন হুড!'

খিঁচে দৌড় দিল রবিন কাছাকাছি একটা জঙ্গল লক্ষ্য করে। ধরে ফেলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে।

'ঘিরে ফেলো!' চেঁচিয়ে উঠলেন বিশপ, 'বেশি বড় না জঙ্গলটা! ঘিরে ফেলো! তারপর চারদিক থেকে এগিয়ে গেলেই ধরা পড়বে বদমাশ!'

জঙ্গলটা ঘিরে ফেলতে ওদের কয়েক মিনিটের বেশি লাগলো না। মাঝখানে আটকা পড়েছে রবিন। ধীরে ধীরে সাবধানে এগোল ওরা সামনের দিকে, কারণ কে জানে এই জঙ্গলে রবিনের আরও লোকজন আছে কিনা, যদি হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ করে বসে!

শেরউডের আধ মাইলের মধ্যে এসে এমন বিপদে পড়বে কল্পনাও করতে পারেনি রবিন। কিন্তু সাহস বা বুদ্ধি হারালো না সে, একদৌড়ে পৌছে গেল জঙ্গলের ঠিক মাঝখানটায়। ও জানে, ছোট্ট দু'কামরার একটা কুটির রয়েছে ওখানে, বিধবা এক বুড়ি

থাকে, কায়-কষ্টে দিন কাটায়। প্রায়ই নানাভাবে সাহায্য করে রবিন ওকে। বুদ্ধিমতী ওই বুড়িকে এখন বাসায় পেলে হয়।

পাওয়া গেল। চরকা কাটছিল বুড়ি, অবাক হয়ে চাইল হাঁপাতে হাঁপাতে এক সাধুকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে।

'আমি রবিন, বুড়ি মা!' বললো রবিন হুড, 'রাজার সৈন্য আর হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ তাড়া করেছে আমাকে, ধরতে পারলে ফাঁসীতে ঝোলাবে!'

'কোনও চিন্তা নেই, বাবা,' বললো বুড়ি। 'আমি বেঁচে থাকতে সেটা হতে দেব না। তোমাকে ধরে ফাঁসী দেবে···উঁহুঁ, তাহলে আমার দুঃখের সময় সাহায্য করবে কে, ওই বিশপ? যাও, বাপ, পাশের ঘরে গিয়ে আমার ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরে নাও, টুপিটাও পরতে ভুলো না। নিজের কাপড়গুলো ওখানেই খুলে রেখে দিয়ো।'

মুহূর্তে বুড়ির প্ল্যানটা বুঝতে পেরে হাসি ফুটে উঠলো রবিনের মুখে, বুড়ির দুই গালে চুমো খেয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। দুই মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলো রবিন কুটির থেকে, লাঠিতে ভর দিয়ে পিঠ বাঁকিয়ে হাঁটছে, পরনে শতচ্ছিন্ন জীর্ণ পোশাক, মাথায় কানা ভাঙা তোবড়ানো মস্ত এক টুপি, হাতে চরকা আর কিছু সুতো–যেন বিশ্রামের জন্যে কোথাও বসতে হলেও হাতের কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়।

কিছুদূর এগিয়েই লোকজনের গলার আওয়াজ পেল রবিন, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আরো কুঁজো হয়ে থরথর করে লাঠি কাঁপিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলো রবিন। হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে।

'কে যায়?' হাঁক ছাড়লেন বিশপ, 'ও, বুড়ি একটা! ধরে নিয়ে এসো ওকে আমার সামনে।'

বিশপের সামনে নিয়ে আসা হলো বুড়িকে। কাঁপুনি বেড়ে গেছে বুড়ির।

'কোথা থেকে আসছো তুমি, বুড়ি?' জিজ্ঞেস করলেন বিশপ।

'আমার কুঁ-উঁ-ড়ে ঘ-অ-র থেকে-এ, হুজু-উ-র,' কাঁপা গলায় জবাব দিল বুড়ি, 'জ-অ-ঙ্গলে-এ-র মদ্যিখা-আ-নে···'

আর শোনার ধৈর্য রইলো না বিশপের। মাথা নিচু করে রেখেছে বুড়ি, তাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলো না তাঁর মনে, ভাবলেন তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না বুড়িটা। জিজ্ঞেস করলেন, 'এদিকে কোন লোককে দেখেছো?'

কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল বুড়ি, 'না, হুজুর, একজন সন্ন্যাসী ছাড়া আর কাউকে দেখিনি।'

'কোথায়? কোনদিকে গেছে লোকটা?'

'আমার ঘরে। বিশ্রাম নেবার জন্যে হোলি ফাদার···'

'কচু ফাদার!' কর্কশ কণ্ঠে বললেন বিশপ। 'হয়েছে, আর বক বক করার দরকার নেই তোমার। চলো হে, পেয়েছি ব্যাটাকে হাতের মুঠোয়! ছোটো সবাই, টেনে বের করে নিয়ে এসো ওকে বুড়ির কুঁড়েঘর থেকে।'

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটলো ওরা কুটিরের দিকে। কুঁজো হয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোলো বুড়ি নিজের পথে। কিন্তু ঝোপের আড়ালে গিয়েই আশ্চর্য পরিবর্তন এসে গেল বুড়ির চালচলনে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুট লাগালো বুড়ি, যেন চঞ্চলা হরিণী! জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছোটে, ফাঁকা জায়গায় এসেই আবার কুঁজো হয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোয়–এই ভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই শেরউডে প্রবেশ করলো রবিন হুড। একছুটে চলে এলো নিজের আস্তানার কাছে।

কাছাকাছি আসতেই ওকে দেখে ফেললো লিটল জন। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল ওর। 'আরে! ব্যাপার কি! একেবারে উড়ে আসছে যেন বুড়িটা! নিশ্চয়ই ডাইনী!' এই বলে চট্ করে একটা তীর জুড়ে ফেললো সে ধনুকে।

'আরে, থামো, থামো!' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন হুড। 'আমি রবিন! রবিন হুড!'

'তাই তো!' রবিনের গলা চিনতে পেরে তাজ্জব হয়ে গেল লিটল জন। 'আরে, ওস্তাদ,এ কি হাল তোমার! বুড়ির পোশাক কেন তোমার গায়ে?'

'বলবো, সব বলবো পরে,' বললো রবিন। 'জলদি শিঙাটায় ফুঁ দাও আগে। সব লোক দরকার আমার এই মুহূর্তে।'

শিঙায় তিনটে ফুঁ দিতেই চারপাশ থেকে হুড়মুড় করে এসে হাজির হলো অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সাত কুড়ি দুর্ধর্ষ যুবক। রবিনের পিছন পিছন ছুটলো সবাই বুড়ির সেই জঙ্গলের দিকে।

এদিকে কুটিরের সামনে পৌঁছে কয়েকজনকে বাইরে পাহারায় থাকতে বলে চারজন সৈন্যকে ভেতরে পাঠালেন বিশপ রবিন হুডকে ধরে আনার জন্যে। টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এলো ওরা সন্ন্যাসীর পোশাক পরা বুড়িকে। মুখটা টুপিতে ঢাকা রয়েছে বলে চিনতে পারলেন না ওকে বিশপ, চেনার চেষ্টাও করলেন না, হুকুম দিলেন, 'পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ওই সাদা ঘোড়াটায় তুলে দাও ওকে। এক্ষুণি রওনা হয়ে যাব আমরা নটিংহামের পথে। বদমাশটাকে জেলের খাঁচায় পুরতে না পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আগামীকালই লটকে দেব ফাঁসীতে।'

একটি কথাও উচ্চারণ করেনি বুড়ি, সবাই ভাবলো ধরা পড়ে বোকা বনে গেছে রবিন হুড। ওকে পরীক্ষা করে দেখার কথা মাথায় এলো না কারো, সবাই এখন ভালোয় ভালোয় জঙ্গল থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে, কে জানে, যদি টের পেয়ে আক্রমণ করে বসে ওর লোকজন। রওনা হয়ে গেল ওরা তড়িঘড়ি।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন বিশপ, কিভাবে রবিন হুডকে পাকড়াও করলেন সেটা কেমন ভাবে সাজিয়ে গল্প করবেন সবার কাছে, তাই গোচ্ছাচ্ছেন মনে মনে। গর্বে ময়ূরের মত পেখম মেলে দিয়ে রঙ চড়াচ্ছেন নিজের বাহাদুরির ওপর। আর হাসছেন। হাসি এসে যাচ্ছে, থামাতে পারছেন না চেষ্টা করেও।

কিন্তু সামনের একটা বাঁক ঘুরেই মুহূর্তে মিলিয়ে গেল বিশপের মুখের হাসি। সাতকুড়ি সশস্ত্র লোক ধনুকে তীর গুঁজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর। তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বুড়িটা।

'আরে! কারা এরা?' বলেই চিনে ফেললেন তিনি এদের। সবুজ পোশাক পরা তীরন্দাজ-দল যে কারা, ভাল করেই জানা আছে তাঁর। ঢ্যাঙা লিটল জনকেও দেখা যাচ্ছে ওদের মধ্যে। 'আর ওই সামনে দাঁড়ানো বুড়িটা···কে ও?'

পাশের ঘোড়ার ওপর থেকে বন্দী বললো, 'আমার মনে হয় ওরই নাম রবিন হুড।'

'রবিন হুড!' কপালে উঠলো বিশপের চোখ। 'তাহলে···তাহলে তুমি কে?'

'হি, হি, হি! হো, হো, হো!' হাসতে শুরু করলো বুড়ি, তারপর সরিয়ে দিল নিজের মাথার হুড। দেখা গেল লোলচর্ম এক বৃদ্ধা দন্তহীন মাড়ি বের করে হাসছে খিল খিল করে। 'কেন, আমাকে চিনতে পারছো না? বন্দী করে তো নিয়ে চলেছিলে, এখন চিনতে পারছো না যে আমি দস্যু রবিন হুড? কেমন জব্দ?' হেসে উঠলো বুড়ি প্রাণখোলা হাসি।

'সেরেছে!' পরিষ্কার বুঝতে পারছেন বিশপ, ধরা পড়ে গেছেন তিনি রবিন হুডের হাতে। শায়েস্তা করতে এসে নিজেরই শায়েস্তা হয়ে যেতে হবে আজ। একঝাঁক তীর ছুটে এসে পড়লো পিছনে দাঁড়ানো অশ্বারোহী সেনাদলের ওপর। জান বাঁচানো ফরজ বুঝে বিশপকে ফেলে তীর বেগে পালালো সবাই। বিশপও চেষ্টা করলেন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওদের অনুসরণ করতে, কিন্তু মাচ আর উইল স্কেদলক দৌড়ে গিয়ে টেনে ধরলো তাঁর ঘোড়ার রাশ। এগিয়ে এলো রবিন। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সাথে বাঁধার নির্দেশ দিয়ে নামতে বললো বিশপকে। কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলেন লর্ড বিশপ।

'কি খবর, লর্ড বিশপ?' বললো রবিন, 'অনেক কিছুই তো করলেন আমার বিরুদ্ধে, এবার আমি শুধু একটা কিছু করি?'

দুই হাঁটু বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে, একটি কথাও বেরোলো না বিশপের মুখ থেকে, প্রাণভয়ে শুকিয়ে গেছে জিভ। হাসলো রবিন। বললো, 'আপনার মত নীচ একজন লোকের গায়ে হাত তুলতেও ঘৃণা বোধ করছি আমি, তাই বেঁচে গেলেন এ-যাত্রা। কিন্তু মনে রাখবেন, আগামীতে যদি আবার আপনাকে এই ভূমিকায় দেখি, গলায় পা দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলবো জিভ। লিটল জন, দেখো এর থলিতে কি আছে।'

টাকা কড়ি যা ছিল সব বের করে নিল লিটল জন। রবিনের নির্দেশে অর্ধেক দিয়ে দিল বুড়িকে। রবিন বললো, 'এবার যেতে দাও ওঁকে। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবো না আমরা। অন্ততঃ আজকে নয়।'

ছেড়ে দিল ঠিকই, তবে উল্টো করে ছেড়ে দিল লিটল জন লর্ড বিশপকে। লেজের দিকে মুখ করে উল্টো করে বসিয়ে হাত-পা বেঁধে দেয়া হলো বিশপের, তারপর কষে এক ঘা লাগিয়ে দেয়া হলো ঘোড়ার পিছন দিকে। টগবগিয়ে ছুটলো ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে উল্টো হয়ে চড়ে নটিংহাম শহরে ফিরে গেলেন হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ।

সতেরো

গাই অফ গিসবোর্ন

এত চেষ্টা করেও রবিন হুড বা তার কোন অনুচরকে ধরতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল রাজার সৈন্য। এই ধরতে না পারার পেছনে আসল কারণ অক্ষমতা নয়, নেতৃত্বের অভাব। রবিনের হাতে শায়েস্তা হয়ে হেরিফোর্ডের বিশপ ভয় পেয়ে সমস্ত দায়-দায়িত্ব ফেলে সেই যে পালিয়ে চলে গেলেন নিজের মঠে, আর এলেন না। সৈন্যদের সঠিক ভাবে পরিচালনা করবার আর কেউ রইলো না। ওদিকে কুমন্ত্রণা দেবার লোকটা সরে যেতেই রানী এলেনর স্যার রবার্ট লী-র সহযোগিতায় রাজাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে কাজটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে, শপথের অমর্যাদা করে এভাবে রবিন হুডকে তাড়া করা ঠিক হচ্ছে না। হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের রণে ভঙ্গ দেয়ার সংবাদও পৌঁছলো এসে রাজধানীতে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সমস্ত সৈন্য ফেরত নিয়ে আসার আদেশ দিলেন রাজা দ্বিতীয় হেনরী।

তবু আরও অনেকদিন পর্যন্ত খুবই সাবধানে চলাফেরা করলো রবিন ও তার দলবল, জঙ্গল ছেড়ে খুব একটা বেরোলো না। অবশ্য জঙ্গলের মধ্যেই আনন্দের কোন অভাব নেই তাদের; হাসি, গল্প, ভুরিভোজ, নানান ধরনের খেলাধুলো, গান ইত্যাদি নিয়ে সুন্দর কাটছে ওদের সময়। ধীরে ধীরে অবস্থাটা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই আবার মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অধিকার পেয়ে আনন্দের পরিমাণ বেড়ে গেল আরও।

অনেকদিন কেটে গেল এইভাবে। বাইরের জগতে পরিবর্তন ঘটে গেল অনেক। রাজা হেনরী মারা গেলেন, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন সিংহ-হৃদয় রাজা রিচার্ড। অনেক কান ঘুরে সব খবরই শেষ পর্যন্ত শেরউডে এসে পৌঁছায় বটে, কিন্তু বাইরের দুনিয়ার এইসব সংবাদে খুব একটা আলোড়িত হয় না জঙ্গলবাসীরা, যেমন চলছিল তেমনি ঢিমে তেতালায় চলে ওদের জীবন যাত্রা।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা সেরেই লিটল জনকে ডাকলো রবিন, 'চলো হে, বেরিয়ে পড়ি। শুয়ে-বসে ঘুণ ধরে গেছে হাড়ে। কিছু একটা ঘটাতে না পারলে

একঘেয়ে লাগছে জীবনটা।'

'তা তো বুঝলাম, ওস্তাদ,' বললো লিটল জন, 'কিন্তু তোমার সাথে কোথাও গেলেই তো কপালে হয় পিট্টি, নয়তো দাবড়ানি জোটে।'

'ঠিক আছে, যেয়ো না তাহলে,' উঠে পড়তে গেল রবিন হুড।

'আরে, আরে! রাগ করছো কেন!' লাফিয়ে এসে ওর হাত ধরলো লিটল জন। 'ঠাট্টা করছিলাম, ওস্তাদ। তোমার সাথে গিয়ে পিট্টি আর তাড়া খেয়েও তৃপ্তি আছে। চলো বেরিয়ে পড়ি।'

বেরিয়ে পড়লো দু'জন। কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছে তলোয়ার, পিঠে তীর-ধনুক। মনটা খুঁতখুঁত করছে রবিনেরঃ সত্যিই কি ওর সাথে গেলে বিপদ হয় লিটল জনের? মনে পড়লো মিজ দ্য মিলারের হাতে পাইকারী পিট্টি খাওয়ার কথা, রানীর সম্মানে লণ্ডনে গিয়ে বেমক্কা তাড়া খাওয়ার কথা। ভাবলো, দু'জন আলাদা গেলে কি হয় দেখা যেতে পারে। চলতে চলতে রাস্তা যেখানটায় দুই ভাগ হয়ে গেছে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। বললো, 'এক কাজ করা যাক, লিটল জন। আমার সাথে গেলে তোমার কপালে পিট্টি জোটে, নাকি তোমার সাথে গেলে আমার—এই ব্যাপারটার আজ নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া দরকার। এসো, দু'জন দুই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করি, আলাদা আলাদা। দেখা যাক আজ কার কপালে কি জোটে।'

'তুমি এখনও রেগে আছো, ওস্তাদ। আমি কিন্তু ওভাবে কথাটা বলিনি।'

'বেশ তো,ওভাবে বলোনি, ভাল কথা,' বললো রবিন। 'কিন্তু কথাটা শোনার পর থেকে মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করছে। দেখাই যাক না, দু'জন দু'পথে গেলে কি হয়।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো লিটল জন। 'তুমি ডানদিকের পথ ধরে চলে যাও, আমি যাচ্ছি বামদিকের রাস্তায়। দেখা যাক কি আছে কার কপালে।'

দু'জন রওনা হয়ে গেল দুই রাস্তায়। কিছুদূর এগিয়েই একে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল—দুই রাস্তার মাঝখানে দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল, দৃষ্টি চলে না।

হাঁটছে রবিন। বিভোর হয়ে হাঁটছে জঙ্গলের শোভা দেখতে দেখতে। ডালে বসে মনের সুখে ডাকছে পাখি, পাতার ফাঁক গলে পথের ওপর ঝিলমিল করছে সকালের রোদ। মনোরম পরিবেশ। হঠাৎ একটা বিশাল ওক গাছের নিচে অদ্ভুত পোশাক পরা এক লোক দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। লোকটা ওকে দেখতে পায়নি বুঝতে পেরে অনেকক্ষণ ধরে গভীর আগ্রহের সাথে দেখলো সে লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আশ্চর্য! এমন উদ্ভট পোশাক জীবনে দেখেনি সে। লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘোড়ার চামড়া দিয়ে ঢাকা। চামড়ার ওপর থেকে লোমগুলো সরানো হয়নি। মাথার কান-ঢাকা টুপিটাও ঘোড়ার লোমশ চামড়া দিয়ে তৈরি। এমন ভাবে টেনে দিয়েছে টুপিটা যে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কোমরে বাঁধা রয়েছে একটা বড়সড় তলোয়ার, পিঠে তীর-ভরা তূণ। ধনুকটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা।

'কে হে ভাই, তুমি?' এগিয়ে গেল রবিন, 'গায়ে কি পরেছো ওটা? কসম খোদার, এমন উদ্ভট পোশাক জীবনে দেখিনি আমি! প্রথমে তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম নরক থেকে বিশেষ দূত পাঠিয়েছেন যমরাজ নিকোলাস, ডাকতে এসেছো আমাকে!'

কথার কোন জবাব দিল না লোকটা, টুপিটা শুধু খানিকটা ঠেলে দিল পিছনে। দেখা গেল, ভুরু কুঁচকে কটমট করে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে শকুনের ঠোঁটের মত বাঁকা নাকওঅলা ভয়ঙ্কর চেহারার এক লোক। গালের কিছু ভাঁজ আর সরু, চাপা ঠোঁট দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলো রবিন, লোকটা অত্যন্ত নীচ, বদ ও নিষ্ঠুর। মুখের দিকে চাইলে শিরশির করে ওঠে গা।

'ইতর কোথাকার! তুমি কে?' কর্কশ কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লো লোকটা।

'আহা-হা, চটছো কেন, ভাই?' বললো রবিন, 'সেরকায় ভিজিয়ে বিছুটি পাতা খেয়েছো নাকি সকালের নাস্তা? এত ঝাল কেন কথায়?'

'আমার কথা পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?' বললো লোকটা, 'ভালো চাও তো কেটে পড়ো মানে মানে। কারণ, আমার কাজ দেখলে আরও অপছন্দ হবে তোমার।'

'কে বললো পছন্দ হচ্ছে না,' আরো দু'পা এগিয়ে বসে পড়লো রবিন লোকটার সামনে, 'এমন চাঁছাছোলা, কর্কশ, দুর্বিনীত, প্রায়-অভদ্র কথাবার্তা আমার খুবই ভাল লাগে। আরও বলো, শুনি।'

যেন এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা কামড়ে ধরবে, এমনি ভঙ্গিতে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা রবিনের চোখের দিকে। রবিনও সহজ, সরল, নিষ্পাপ, ড্যাবডেবে দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো লোকটার চোখের দিকে—হাসির লেশমাত্র চিহ্ন নেই ওর চোখে-মুখে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো দু'জন দু'জনের চোখের দিকে, তারপর নীরবতা ভঙ্গ করলো লোকটা। 'কি নাম তোমার?'

'বাহ্!' বললো রবিন, 'মুখ দিয়ে কথা বেরোলো তাহলে! আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম, আমাকে দেখে ভয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেছে বুঝি তোমার। যাই হোক, নাম জিজ্ঞেস করছো, বলবো, কিন্তু বাপু, তোমার নিজের পরিচয়টা আগে দাও; এই অঞ্চলে আমি নতুন লোক, কিন্তু তুমি আমার চেয়েও নতুন। সবচেয়ে আগে শোনা যাক, এত সুন্দর চেহারাটা অমন বিচ্ছিরি পোশাক পরে কদাকার করেছো কেন।'

কথা শুনে কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো লোকটা। বললো, 'তোমার দুঃসাহস দেখে না হেসে পারছি না। কেন যে এক চড়ে তোমার দাঁত ক'টা খসিয়ে দিচ্ছি না এখনও বুঝতে পারছি না ঠিক। জীবনে এত বড় কথা উচ্চারণ করে কেউ পার পায়নি আমার হাত থেকে। ঠিক দুইদিন আগে নটিংহাম শহরে এর অর্ধেক বলার জন্যে একজনকে শিক-কাবাব বানিয়ে রেখে এসেছি। যাই হোক, এই পোশাকে শরীরটা তো গরম থাকেই, বর্মেরও কাজ দেয় অনেকটা। নামটা জানতে চাইছো, ভয় পেয়ো না আবার, আমার নাম গাই অফ গিসবোর্ন। হেরিফোর্ডশায়ারের জঙ্গলে আমার বাস। আমি দস্যু। ভয়ঙ্কর এক দস্যু। কিছুদিন আগে হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, নটিংহামশায়ারের শেরিফের হয়ে যদি আমি সামান্য একটা কাজ করে দিই, আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এবং সেই সাথে পুরস্কার দেয়া হবে দুইশো পাউণ্ড। কাজেই সোজা চলে এলাম আমি নটিংহাম শহরে, দেখা করলাম মাননীয় শেরিফের সাথে। কি কাজ দিলেন তিনি আমাকে জানো? অতি সাধারণ একটা কাজঃ শেরউডে এসে রবিন হুড বলে একটা লোককে খুঁজে বের করে হয় তাকে মেরে রেখে, নয়তো ধরে নিয়ে যেতে হবে। এই লোকটাও নাকি একটা দস্যু। শেরিফ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইছেন আর কি। রাজি হয়ে গেলাম এক কথায়। কারণ, এর অর্ধেক টাকা পেলে নিজের ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাতেও আপত্তি নেই আমার। চলে এসেছি। এই জঙ্গলের দক্ষিণ সীমান্তে কিংস হেড বলে এক সরাইখানায় লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন শেরিফ আমার জন্যে।'

চুপচাপ শুনলো রবিন লোকটার কথা, রাগে ফুঁসছে ভিতরটা, কিন্তু হাবভাবে প্রকাশ পেল না কিছুই। ভাল করেই চেনে সে গাই অফ গিসবোর্নকে, এর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার অনেক খবরই এসে পৌঁছেছে ওর কানে; এর মত এত নীচ, জঘন্য চরিত্রের লোক গোটা ইংল্যাণ্ডে আর আছে কিনা সন্দেহ। গা-টা রি-রি করে উঠলো রবিনের, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললো, 'তোমার অনেক সু-কীর্তির কথা শুনেছি আমি। শুনেছি তলোয়ার খেলায় নাকি তোমার জুড়ি নেই। আমার মনে হয় রবিন হুডের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। তাহলে দেখা যেত কে কার চেয়ে বড়।'

'কে বড় সেটা দেখার কিছু নেই,' বললো লোকটা। 'ও আমার জানাই আছে।

আমার সাথে সাক্ষাতের দশ মিনিটের মধ্যে যে ওর মৃত্যু ঘটবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু যদি উল্টোটা হয়ে যায়?' অনিশ্চিত কণ্ঠে বললো রবিন। 'যদি দেখা যায় সে-ই পিটিয়ে লাশ করে ফেললো তোমাকে, তখন? শুনেছি তার মত শক্তিশালী লোক এই অঞ্চলে নেই।'

'সেটা হতে পারে,' বললো গাই অফ গিসবোর্ন। 'এই অঞ্চলের সেরা হতে পারে সে। কিন্তু জেনে রাখো, এই অঞ্চলের বাইরে গোটা একটা দুনিয়া পড়ে রয়েছে। তলোয়ারে তো পারবে না-ই, আমার বিশ্বাস অনায়াসে টেক্কা দিতে পারবো আমি ওকে তীর-ধনুকেও।'

'উঁহুঁ,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো রবিন। 'এটা আমি বিশ্বাস করি না। নটিংহামের আমরা এই একটা ব্যাপারে অন্তত গর্ব করতে পারি। তীর-ধনুকে আমাদের জুড়ি নেই। রবিন হচ্ছে আমাদের মধ্যে আবার সেরা। ওর কথা ছেড়েই দাও, আমি যে এক সাধারণ লোক, আমার সাথেই পারবে না তুমি।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো রবিনকে গাই অফ গিসবোর্ন, তারপর হা হা করে কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলো। 'তোমার দুঃসাহস দেখে হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছি না। বিশ্বাস করো, এই ধরনের কথা বলে আমার হাত থেকে পার পেয়েছে খুব কম লোকই। ঠিক আছে, একটা মালা বানিয়ে টাঙাও দেখি, প্রথমে তোমার সাথেই হয়ে যাক আমার এক হাত।'

'মালা-টালার যুগ পার হয়ে এসেছি আমরা বহু আগেই,' বললো রবিন। 'আজকাল বাচ্চা ছেলেরা ছাড়া এই অঞ্চলের কেউ ওই রকম টার্গেট ব্যবহার করে না। বড়দের টার্গেট কাকে বলে দেখাচ্ছি তোমাকে।' বলে উঠে গিয়ে কাছের একটা হেজেল-ঝাড় থেকে দু'আঙুল মোটা একটা ডাল কেটে নিয়ে ছাল ছাড়াতে শুরু করলো রবিন। তারপর একদিক চোখা করে আশি কদম দূরে একটা ওক গাছের সামনে কাঠিটা গেড়ে দিল মাটিতে। ফিরে এসে বললো, 'সত্যিকার তীরন্দাজ যদি হও, তিনবার সুযোগ পাবে তীর ছোঁড়ার, লাগাও ওই ডালে।'

'ওরেব্বাপ!' উঠে দাঁড়ালো গাই অফ গিসবোর্ন, 'সাক্ষাৎ শয়তানও তো লাগাতে পারবে না ওটায়!'

'হয়তো পারবে, কিংবা পারবে না,' বললো রবিন। 'যতোক্ষণ না তুমি তীর ছুঁড়ছো, ততক্ষণ বোঝার উপায় নেই।'

কথা শুনে ভুরু কুঁচকে রবিনের দিকে চাইলো গাই অফ গিসবোর্ন। ওর সরল হাবভাব দেখে মনে করলো, অর্থ না বুঝেই বলেছে ও কথাটা; তাই কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ ছিলা পরালো নিজের ধনুকে। পরপর তিনবার তীর মারলো সে ডালটা লক্ষ্য করে, কিন্তু একটাও লাগলো না। হেসে উঠলো রবিন। বললো, 'দেখা যাচ্ছে, সাক্ষাৎ শয়তানের পক্ষে সত্যিই এই লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব নয়। মিঞা, তলোয়ারেও যদি এই পদের ওস্তাদ হও, তাহলে নির্ঘাৎ মারা পড়বে তুমি রবিনের হাতে।'

ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করলো গাই অফ গিসবোর্ন, দাঁত কিড়মিড় করে বললো, 'কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সাবধান বলে দিচ্ছি, এখনও সাবধান হও, নইলে টেনে ছিঁড়ে নেব জিভ।'

রাগে আর ঘৃণায় কাঁপছে রবিনের বুকের ভিতরটা। ইচ্ছে করছে এক্ষুণি টান দিয়ে তলোয়ারটা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাষণ্ডটার ওপর, কিন্তু তার আগে, ভাবলো, ধনুকের জাদু দেখিয়ে দেয়া দরকার হারামজাদাকে। কোন কথা না বলে একটা তীর বেছে নিয়ে পরালো ছিলায়, তারপর যেন নিতান্তই অবহেলা ভরে মারলো ডালটা লক্ষ্য করে।

চড়াৎ করে দু'ফাঁক হয়ে গেল হেজেলের কাঠি। প্রতিপক্ষকে বিস্ময় প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রবিন মাটিতে। তারপর একটানে তলোয়ারটা বের করে জ্বলন্ত চোখে চাইলো গাই অফ গিসবোর্নের দিকে। 'আয় দেখি, বদমাশ! মরণ বাড় বেড়েছে তোর, আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন! আমিই রবিন হুড!'

কিছুক্ষণ থ হয়ে চেয়ে রইলো গাই অফ গিসবোর্ন রবিনের মুখের দিকে। কিন্তু বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে তার বেশি সময় লাগলো না, ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠলো তার চেহারায়। 'ও, তুমিই রবিন হুড! বেশ, মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে যাও। ইষ্টনাম জপ করে নাও এখুনি, পরে সময় পাবে না আর।' সড়াৎ করে খাপ থেকে টেনে তরবারী বের করে ফেললো সে।

শুরু হলো যুদ্ধ। এমন ভয়ঙ্কর অসি-যুদ্ধ আর শেরউডে হয়নি কোনদিন। প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করলো একে অপরকে। দু'জনেই জানে যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু ঘটছে ততক্ষণ থামবে না এই লড়াই। একবার সামনে এগিয়ে গিয়ে, একবার পিছনে হটে এসে, একবার ডাইনে সরে, একবার বামে ঘুরে লড়ছে দুজন, পায়ের চাপে সবুজ

ঘাসগুলো দুমড়ে সমান হয়ে গেল মাটির সাথে, তার ওপর টপ টপ ঝরছে তাজা রক্তের ফোঁটা। ইতিমধ্যে শরীরের কয়েক জায়গায় রবিনের তরবারীর খোঁচা খেয়েছে গাই অফ গিসবোর্ন, কিন্তু একটি বারের জন্যেও নিজেরটা ছোঁয়াতে পারেনি রবিনের গায়ে, অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতার সাথে এড়িয়ে গেছে সে প্রতিটা আঘাত। হঠাৎ গাই অফ গিসবোর্নের এক প্রচণ্ড আক্রমণ এড়াবার জন্যে হালকা পায়ে লাফিয়ে পিছনে সরে আসতে গিয়ে একটা শিকড়ে পা বেধে পড়ে গেল রবিন চিত হয়ে। অসি-যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী কেউ পড়ে গেলে তাকে আক্রমণ করা উচিত নয়, কিন্তু সুযোগ বুঝে লাফিয়ে এগিয়ে এলো গাই অফ গিসবোর্ন, রবিনের বুক লক্ষ্য করে চালালো তলোয়ার। উপায়ান্তর না দেখে খালি হাতেই ধরে ফেললো রবিন ক্ষুরধার তরবারীটা। যদিও হাতের তালু কেটে গেল বেশ খানিকটা, ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারলো সে তলোয়ারের আগাটা; ঘ্যাঁচ করে আধ হাতের মত ঢুকে গেল ওটা মাটির ভেতর। সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রবিন, তলোয়ারটা মাটি থেকে টেনে বের করবার আগেই প্রচণ্ড জোরে মারলো গাই অফ গিসবোর্নের ডান বাহুতে। হাত থেকে তলোয়ার খসে যেতেই ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল পাষণ্ডটার মুখ, টলতে টলতে দু'পা পিছিয়ে গেল সে, কিন্তু আর কোন সুযোগ দিল না ওকে রবিন, তলোয়ারের এক খোঁচায় এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল ওর হৃৎপিণ্ড। দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে ভয়ঙ্কর এক মরণ-চিৎকার দিল গাই অফ গিসবোর্ন, তারপর একপাক ঘুরে দড়াম করে পড়লো মাটিতে মুখ থুবড়ে।

তলোয়ারের রক্ত মুছে ওটা খাপে পুরে দু'হাতে বুক বেঁধে চেয়ে রইলো রবিন গাই অফ গিসবোর্নের মৃতদেহের দিকে। মনে মনে ভাবছে, 'আবার একটা মানুষ খুন করলাম। জীবনের প্রথম সেই যে রক্ষী প্রধানকে মেরেছিলাম, তারপর এতদিন পর আবার খুন করতে বাধ্য হলাম আরেকজনকে। সেদিন ভয়ানক খারাপ লেগেছিল, মনে মনে বড় দুঃখ হয়েছিল লোকটার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা চিন্তা করে—কিন্তু আজ? আজ মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর, নীচ এক পিশাচের হাত থেকে রক্ষা করলাম দেশের আর সব মানুষকে। ফসল বিনষ্টকারী বন্য শূয়োর মারতে পারলে যেমন হয়, তেমনি আনন্দ হচ্ছে। যাই হোক, এর কথা থেকে বোঝা গেল, যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি শেরিফের, এখনও আমাকে ধ্বংস করার ফিকিরে রয়েছে—এর একটা বিহিত করা দরকার। দেখা যাক, আজই খানিকটা ধার শোধ করে দেয়া যায় কিনা।'

ঘোড়ার চামড়ার রক্তমাখা পোশাক খুলে ফেললো রবিন গাই অফ গিসবোর্নের শরীর থেকে, নিজের কাপড়ের ওপর পরে নিল ওগুলো। ওর তলোয়ার আর ড্যাগারটা ঝুলিয়ে নিল নিজের কোমরে, তীর-ভরা তূণ বেঁধে নিল পিঠে, ধনুকটা ঝুলিয়ে নিল কাঁধে, তারপর ঘোড়ার চামড়ার মুখঢাকা টুপিটা সামনের দিকে টেনে দিয়ে নিজের অস্ত্রশস্ত্র আর শিঙাটা হাতে নিয়ে রওনা হলো কিংস হেড সরাইখানার উদ্দেশে। পথে গাই অফ গিসবোর্নের ছদ্মবেশে যে-ই দেখলো ওকে, ছুটে পালালো সামনে থেকে—এত দূরেও এসে পৌঁছেছে লোকটার কুখ্যাতি।

ওদিকে এসব ঘটনার কিছুই জানে না লিটল জন, হাঁটতে হাঁটতে শেরউডের বাইরে চলে এলো সে, রাজপথ ধরে আরো কিছুদূর এগিয়ে ছোট একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো। হেরিফোর্ডের বিশপের হাত থেকে রবিনকে যে বিধবা বুড়িটা বাঁচিয়েছিল, তার পর্ণ কুটিরটা চোখে পড়লো ওর। লম্বা পা ফেলে পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল লিটল জন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো—কে ফোঁপায়? কান খাড়া করে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতেই আবার শুনতে পেল সে শব্দটা, সত্যিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ। মনে হচ্ছে কুটির থেকেই আসছে আওয়াজটা।

পা টিপে কুটিরের দরজার কাছে চলে এলো লিটল জন। দরজাটা একটু ফাঁক

করে দেখলো, সেই বুড়িটাই, দুই হাতে চোখ ঢেকে রেখেছে, প্রবল বেগে কাঁপছে ওর পিঠটা।

বিশাল দৈত্যের মত চেহারা হলে কি হবে, কারও দুঃখ সহ্য করতে পারে না লিটল জন, কাউকে কাঁদতে দেখলে নিজের চোখেও পানি এসে যায় তার। ঘরের ভেতর ঢুকে এলো সে, বুড়ির পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, আর বলছে, 'কি হয়েছে, বুড়ি মা, কি হয়েছে বলো আমাকে। কিসের এত দুঃখ? আমি আছি না, শুধু একবার মুখ ফুটে বলো কি সাহায্য দরকার।'

প্রথম দিকে মাথা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলো বুড়ি, যে ওকে সাহায্য করার সাধ্য কারও নেই; কিন্তু লিটল জনের নরম কণ্ঠের আশ্বাস আর সান্ত্বনার বাণী শুনে কিছুটা শান্ত হলো সে,কান্না থামিয়ে শোনালো ওর মহাবিপদের কথা। তিনটি ছেলে ছাড়া কেউ নেই ওর দুনিয়ায়, ওরাই ওর কলজের টুকরো, ওরাই ওর সব। হ্যাল, হব আর ডিকন। ক্ষুধার তাড়নায় বড় ছেলেটা গতকাল রাতে হরিণ মেরেছিল একটা, আজ সকালে রক্তের দাগ ধরে ধরে এসে হাজির হয়েছে কয়েকজন জঙ্গল-রক্ষী, তিনজনকেই ধরে নিয়ে গেছে ওরা কিংস হেড সরাইখানায় বিশ্রামরত শেরিফের কাছে, আজই ঝুলিয়ে দেয়া হবে ফাঁসীতে।

'কিংস হেড সরাইখানায় ধরে নিয়ে গেছে ওদের, ঠিক জানো?' জানতে চাইলো লিটল জন।

'হ্যাঁ, বাবা,' বললো বুড়ি। 'ওরা বলছিল, রবিন হুডকে খুন করার জন্যে নাকি একজনকে পাঠানো হয়েছে শেরউডে, তারই অপেক্ষায় ওই সরাইখানায় বসে আছেন নটিংহামের শেরিফ।'

'হুম!' গম্ভীর হয়ে গেল লিটল জন। 'রবিন হুডকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই, নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে। আমি ভাবছি, এখনও হয়তো সময় আছে, হয়তো এক্ষুণি রওনা হয়ে গেলে তোমার ছেলেদের রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। একা যাব, নাকি দলবল সঙ্গে নেয়ার জন্যে ফিরে যাব শেরউডে···কিন্তু ওদিকে সময়ও তো নেই। ইশ্‌শ্‌! এখন রবিন থাকলে বলে দিতে পারতো কি করা উচিত।' নিজের মাথায় জোরে জোরে তিনটে টোকা দিল সে আঙুলের গিঠ দিয়ে, তারপর বললো, 'নাহ্‌, এক্ষুণি আমার রওনা হওয়া দরকার কিংস হেড সরাইখানার দিকে। আচ্ছা, বুড়ি মা, তোমার কাছে কিছু জামা কাপড় আছে? এই লিংকন গ্রীন ছেড়ে কোন ছদ্মবেশ না নিলে কাছেই ভিড়তে পারবো না শেরিফের।'

এই কথা শুনে পুরানো ট্রাঙ্ক থেকে মৃত স্বামীর কিছু জামা-কাপড় বের করে দিল বুড়ি। লিংকন গ্রীন ছেড়ে সেগুলো পরে নিল লিটল জন। উল দিয়ে নকল দাড়ি আর পরচুলা বানিয়ে পরে নিতেই তার খয়েরী চুল-দাড়ি ঢাকা পড়লো। এবার মাথার ওপর মস্ত এক টুপি চাপিয়ে পিঠে তীর-ধুনক আর হাতে লাঠি নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে কিংস হেড সরাইখানার উদ্দেশে।

শেরউড জঙ্গলের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে সামান্য কিছুটা দূরেই বিখ্যাত কিংস হেড সরাইখানা। মহা হৈ-চৈ চলেছে আজ সরাইখানায় সকাল থেকেই। জনা কুড়ি কনস্টেবল নিয়ে গাই অফ গিসবোর্নের ফিরে আসার অপেক্ষা করছেন শেরিফ এখানে। ভাল ভাল রান্না চড়ানো হয়েছে চুলোয়,ভালো মদ বের করা হয়েছে সেলার থেকে। একটা টেবিলে বসে খাচ্ছেন শেরিফ, কাছেই কয়েকটা বেঞ্চিতে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে আর মদ খাচ্ছে শেরিফের লোকজন, বাইরে এখানে-ওখানে বাঁধা রয়েছে ঘোড়াগুলো—লেজ নাড়াচ্ছে, আর পা ঠুকছে ওগুলো মাটিতে। এমনি সময়ে বিধবা বুড়ির তিন ছেলেকে নিয়ে হাজির হলো কয়েকজন জঙ্গল-রক্ষী। পিছমোড়া করে ছেলেগুলোর হাত বেঁধেই ক্ষান্ত হয়নি ওরা, গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে বেঁধেছে একজনের সাথে

আরেকজনকে। ভোজনরত শেরিফের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো ছেলেগুলো তাঁর ভ্রূকুটির বহর দেখে।

সব শুনে হুঙ্কার ছাড়লেন শেরিফ, 'রাজার হরিণ মেরে খাওয়া হচ্ছে, না? বড় বাড় বেড়ে গেছে তোমাদের! অনেকদিন কাউকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি দেখে ভেবেছো স্বরাজ মিলে গেছে! দাঁড়াও, তোমাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব আমি আজ। এ রকম অরাজকতা আর চলতে দেয়া যায় না। গেরস্ত যেমন অন্য কাকদের ভয় দেখাবার জন্যে দু'তিনটেকে মেরে ঝুলিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি ঝুলিয়ে দেব আমি আজ তোমাদের।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল বড় ছেলেটা, প্রচণ্ড এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিলেন শেরিফ। জঙ্গল-রক্ষীদের আদেশ দিলেন যেন ওদের বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে, খাওয়া-দাওয়া সেরেই ওদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন তিনি। তিনজনকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। হতাশ হৃদয়ে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করলো ওরা, যতক্ষণ না খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এলেন শেরিফ। ওদের আশা ছিল, হয়তো শেরিফ ওদের বক্তব্য শুনতে চাইবেন; কেন ওরা হরিণ মারতে বাধ্য হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা করে বলবার সুযোগ দেবেন, ক্ষমা প্রার্থনার একটা সুযোগ হয়তো ওরা পাবে। কিন্তু ওসবের ধার দিয়েও গেলেন না শেরিফ। বেরিয়ে এসে নিজ অনুচরদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই তিন বদমাশকে ফাঁসী দিতে হবে এক্ষুণি। কিন্তু এখানে নয়, ওই যে দেখা যাচ্ছে, শেরউড জঙ্গল, ওখানে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে ঝুলিয়ে দেব আমরা ওদের। এর ফলে ওই জঙ্গলের দুস্যগুলো টের পাবে, ধরা পড়লে কি শাস্তি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।'

কথাটা বলেই নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন শেরিফ, অন্যেরাও চড়লো যে-যার ঘোড়ায়, গলায় বাঁধা দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো বিধবার তিন ছেলেকে শেরউড জঙ্গলের ধারে। ঝট্‌পট্ গলায় ফাঁস পরিয়ে দড়ির অপর প্রান্তগুলো বিশাল এক ওক গাছের মোটা ডালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়া হলো। চোখে পানি এসে গেল ছেলেদের, হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে দয়া প্রার্থনা করলো শেরিফের কাছে। শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন শেরিফ টিটকারির হাসি।

'দয়া বা ক্ষমার ধার ধারি না,' বললেন তিনি। 'আমার কাজ আইন সংরক্ষণ। ক্ষুধার জ্বালায় মেরেছি, বা ওই রকম কোন আহ্লাদের কথা আমি শুনতে চাই না; দোষ করেছো শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু…' একটু যেন চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি, 'মরার আগে তোমাদের পাপ স্বীকার করে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। এখানে পাদ্রী পাবো কোথায়? উপায় নেই, পাপের বোঝা পিঠে নিয়েই রওনা দিতে হবে তোমাদের; সেন্ট পিটারের কাছে কাকুতি মিনতি করে দেখো, তাঁর দয়া হলে স্বর্গের গেট খুলে দিতেও পারেন।'

কথা শুনে হেসে উঠলো শেরিফের কয়েকজন কর্মচারী।

এইসব যখন চলছে, তখন কোত্থেকে এক বুড়ো এসে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো একপাশে। ধবধবে সাদা কোঁকড়ানো চুল-দাড়ি, পিঠে ইউ-ডালের বিশাল এক ধনুক–দেখলেই বোঝা যায়, যৌবনের স্মৃতি পিঠে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে বুড়ো, আসলে এখন এই ধনুকে ছিলা পরাবার সাধ্যও তার নেই। দড়ি টেনে ছেলেগুলোকে শূন্যে তোলার হুকুম দিতে গিয়ে চারপাশে একবার চাইলেন শেরিফ, চট্ করে চোখ পড়লো বুড়োর ওপর। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন তিনি তাকে। 'এদিকে এসো দেখি, তোমার সাথে দুটো কথা আছে।'

কাছে এসে দাঁড়ালো বুড়োর ছদ্মবেশে লিটল জন। 'বলুন, হুজুর।'

বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে কেমন চেনা চেনা মনে হলো শেরিফের, মনে হলো কোথায় যেন দেখেছেন। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে স্মরণ করবার চেষ্টা করে বললেন,

'তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে? কি নাম তোমার?'

কাঁপা কাঁপা ভাঙা গলায় বললো লিটল জন, 'আমার নাম, হুজুর, গাইল্‌স্ হব্‌ল্। কিছু বলবেন আমাকে?'

'গাইল্‌স্ হব্‌ল্, গাইল্‌স্ হব্‌ল,' বিড়বিড় করলেন শেরিফ। কিন্তু এই নামের কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না। বললেন, 'নাহ্, মনে আসছে না। শুধু মনে হচ্ছে দেখেছি কোথাও। যাই হোক, এই সুন্দর সকালে খুব কম খাটুনিতে ছয় পেন্স রোজগার হয়ে গেলে কেমন হয় বলো তো?'

'খুবই ভাল হয়, হুজুর,' গদ গদ কণ্ঠে বললো লিটল জন। 'অভাবে আছি, সৎ পথে যদি ছয় পেন্স উপার্জনের কোন সুযোগ পাই, সে-সুযোগ হাতছাড়া করবো না। বলুন, হুজুর, কি খেদমত করতে পারি আপনার?'

'ব্যাপারটা হচ্ছে, এই তিন ছোকরাকে ফাঁসীতে লটকে দেয়া খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি আমার বাহিনীর কাউকে জল্লাদে পরিণত করতে চাইছি না। তুমি কি পারবে কাজটা? একেক জনের জন্যে দুই পেন্স করে পাবে···করবে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, হুজুর,' বুড়ো মানুষের কাঁপা গলায় বললো লিটল জন, 'এ কাজ জীবনে করিনি আমি কখনও। কিন্তু ছয় পেন্সের বিনিময়ে এটা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে, একটা কথা, হুজুর, এই শয়তানগুলোর পাপের স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে?'

'না। তুমি ইচ্ছে করলে স্বীকারোক্তি নিতে পারো। কিন্তু যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে, এক্ষুণি ফিরতে হবে আমার সরাইখানায়।'

এগিয়ে গেল লিটল জন কম্পমান তিন ভাইয়ের দিকে। বড় ছেলেটার গালে গাল ঠেকিয়ে, যেন ওর পাপের স্বীকারোক্তি শুনছে, এমনি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললো, 'চুপচাপ থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, ভায়া! হাতের বাঁধন কেটে দিচ্ছি, কিন্তু আগেভাগেই নড়ে উঠো না। যখন দেখবে আমি আমার নকল চুল দাড়ি খসিয়ে ফেলেছি, ঠিক তক্ষুণি গলা থেকে ফাঁস খুলে ঝেড়ে দৌড় দেবে জঙ্গলের দিকে।' এই বলে সবার অলক্ষ্যে ক্ষুরধার ছোরার দুই পোঁচে কেটে দিল সে ওর হাতের বাঁধন। যেন এখনও বাঁধা রয়েছে, এমনি ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেটা। একই কথা বললো সে দ্বিতীয় ছেলেটার কানে কানে, তারপর কেটে দিল বাঁধন। আর এক মিনিটের মধ্যে বাঁধন-মুক্ত হলো তৃতীয় ছেলেটাও। ঘোড়ার ওপর বসে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে সবাই, কেউ খেয়াল করলো না কি ঘটে গেল ওদের অলক্ষ্যে।

কাজ সেরে শেরিফের দিকে ফিরলো লিটল জন। বললো, 'হুজুর, যদি অনুমতি দেন, এবার আমি আমার ধনুকটায় ছিলা পরাতে চাই। বুড়ো মানুষ তো, মনটা আমার বড্ডো নরম; বেশি কষ্ট যেন না হয়, সেজন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় একটা করে তীর ঢুকিয়ে দিতে চাই ওদের বুকের খাঁচায়।'

'বেশ তো,' বললেন শেরিফ। 'অতি উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু বাপ, যা করবার জলদি করো, সময় নেই আমার হাতে।'

ধনুকের এক মাথা পায়ের কাছে মাটিতে বাধিয়ে চাপ দিয়ে বাঁকিয়ে ছিলা পরিয়ে নিল লিটল জন। সবাই একটু অবাক হলো ওর গায়ের জোর দেখে। পিঠের তূণ থেকে একটা তীর চলে এসেছে বুড়োর ডান হাতে। তীরটা ছিলায় পরিয়ে চারপাশে তাকিয়ে পালাবার রাস্তাটা দেখে নিল সে, তারপর হঠাৎ একটানে নকল চুল-দাড়ি খসিয়ে প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়লো, 'দৌড়াও!'

চোখের পলকে গলা থেকে ফাঁস খুলেই তীরবেগে খিঁচে দৌড় দিল ছেলে তিনটে ফাঁকা ময়দানের ওপর দিয়ে সোজা জঙ্গলের দিকে। কালবিলম্ব না করে লিটল জনও ছুটলো ওদের পিছু পিছু। তাজ্জব হয়ে চেয়ে রয়েছে সবাই ওদের দিকে, এই

অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেছে একেবারে। শেরিফই সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেলেন। 'ধরো! ধরো ওকে!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। পরিষ্কার চিনতে পেরেছেন শেরিফ এবার লিটল জনকে।

শেরিফের কণ্ঠস্বর কানে গেল লিটল জনের। বুঝতে পারলো, ঘোড়ায় চেপে তাড়া করলে তিনজনকেই ধরে ফেলবে ওরা জঙ্গলে পৌঁছবার আগেই। ছেলেগুলোকে আগে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পাঁই করে ঘুরলো সে, তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরে গর্জন ছাড়লো, 'খবরদার! কেউ এক পা সামনে বাড়লে মারা পড়বে। ধনুকের ছিলা স্পর্শ করা মাত্র খুন হয়ে যাবে আমার হাতে!'

নড়ে চড়ে উঠছিল লোকগুলো, কিন্তু লিটল জনের হুমকি কানে যেতেই পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল সবাই। লিটল জনের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথা জানা আছে ওদের, জানে অবাধ্যতা করতে গেলেই এখন ঘটবে অবধারিত মৃত্যু। ধমক দিলেন ওদের শেরিফ, কাপুরুষ বলে লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করলেন, সবাইকে একসাথে এগোবার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু এক ইঞ্চি নড়লো না কেউ, মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছে লিটল জনের তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে পিছিয়ে যাওয়া। নিষ্ফল আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ, শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে দিশা হারিয়ে ফেললেন রাগে, কি করছেন ভালমত না বুঝেই জিনের রেকাবের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে ছুটলেন তিনি লিটল জনের দিকে। উপায়ান্তর না দেখে একটানে কানের পাশে নিয়ে এলো লিটল জন ধনুকের ছিলা। কিন্তু হায়! তীর ছোঁড়ার আগেই এতদিনের বিশ্বস্ত ধুনকটা হঠাৎ মড়াৎ করে ভেঙে গেল মাঝখান থেকে, তীরটা খসে পড়লো ওর পায়ের কাছে।

লিটল জনের ধনুক ভেঙে যেতেই চিৎকার করে উঠলো শেরিফের লোকজন, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওর দিকে। সবার আগে পৌঁছে গেলেন শেরিফ, সামনের দিকে ঝুঁকে সাঁই করে চালালেন তরবারী ওর মাথা লক্ষ্য করে। চট্ করে মাথা নিচু করে নিল লিটল জন; ফলে খানিকটা ঘুরে গেল শেরিফের তলোয়ার-ধরা হাত, ফলার চওড়া দিকটা খটাং করে লাগলো ওর চাঁদির ওপর। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সে মাটিতে।

'ভাগ্যিস মেরে ফেলিনি,' লোকজন এসে পৌঁছতে বললেন শেরিফ। 'এই হারামজাদাকে গাছের ডালে না লটকাতে পারলে খেদ থেকে যেত মনে। যাও তো, উইলিয়াম, ওই ঝর্ণা থেকে পানি এনে ঢালো এর মাথায়।'

মাথায় পানি ঢালা হতেই চোখ মেললো লিটল জন, ঘোর কাটেনি এখনও, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে চারপাশে। হাত দুটো ওর পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো, কয়েকজন মিলে ধরে তুলে দেয়া হলো একটা ঘোড়ার পিঠে লেজের দিকে মুখ করে, ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো পা দুটো। তারপর ওকে নিয়ে ফিরে এলো সবাই কিংস হেড সরাইখানায়।

শেরিফের আনন্দ আর ধরে না। মদের অর্ডার দিয়ে বসলেন তিনি টেবিলে। এতদিনে হাতের মুঠোয় পেয়েছেন তিনি লিটল জনকে। উহ্, বড় জ্বালান জ্বালিয়েছে লোকটা তাঁকে। 'নটিংহামের গেটের সামনে ঝুলিয়ে দেব কাল একে গাছের ডালে,' ভাবলেন তিনি, 'রবিন হুডের ডানহাতটা গুঁড়িয়ে দেব আমি এইভাবে।'

কিন্তু ক্যানারির পাত্রে লম্বা করে একটা চুমুক দিয়েই মত পরিবর্তন করে ফেললেন তিনি। হঠাৎ একটা চিন্তা ঢুকেছে তাঁর মাথায়। চট্ করে পাত্রটা নামিয়ে রেখে বিড় বিড় করে বললেন, 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি উচিত হবে? উইল স্টিউটলির বেলায় ওরা যা করেছিল···নাহ, যদি গাই অফ গিসবোর্নের হাতে ব্যাটা মারা না পড়ে? নিজের প্রিয় অনুচরকে বাঁচাবার জন্যে লোকটা কি বুদ্ধি বের করে কি অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেউ বলতে পারে? উঁহুঁ, দেরি করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না।' চেয়ার ঠেলে উঠে

দাঁড়ালেন তিনি, ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। লোকজনদের ডেকে বললেন, 'শোনো, ভুল করেছি আমরা! তক্ষুণি ওই গাছের ডালেই ঝুলিয়ে দেয়া উচিত ছিল একে। যাই হোক, আর দেরি করবো না আমরা, চলো, এক্ষুণি একে নিয়ে গিয়ে লটকে দেব ফাঁসীতে, যেখান থেকে ও উদ্ধার করেছিল ছোকরাদের, সেইখানেই।'

আবার রওনা হলো সবাই। সেই বিশাল ওক গাছটার নিচে এসে থামলো। লিটল জনকে নামানো হলো ঘোড়া থেকে। হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, 'কে লোকটা? ঐযে, এইদিকেই আসছে…গাই অফ গিসবোর্ন না?'

কপালে হাত ঠেকিয়ে রোদ আড়াল করে তাকালেন শেরিফ, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'তাই তো! ফিরে আসছে গাই অফ গিসবোর্ন। বদমাশটাকে মেরে রেখে আসতে পারলো কিনা কে জানে!'

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে অগ্রসরমান লোকটার দিকে চাইলো লিটল জন। দূর থেকেই লোকটার বিচিত্র পোশাকে রক্তের দাগ দেখে মনটা দমে গেল ওর, আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো বুকটা—রবিনের রক্ত নয় তো? পরমুহূর্তে লোকটার হাতে রবিনের ধনুক, তলোয়ার আর শিঙা দেখে ওর মনে হলো আস্ত একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ ওর বুকের মধ্যে।

'কি খবর?' গাই অফ গিসবোর্নের ছদ্মবেশে রবিন হুড কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ, 'দেখা পেয়েছিলে ওর? জামা-কাপড়ে এত রক্ত কেন?'

'আমার জামা কাপড় পছন্দ হচ্ছে না বুঝি আপনার!' গাই অফ গিসবোর্নের কর্কশ কণ্ঠ অনুকরণ করে চড়া গলায় বললো রবিন। 'রক্ত ভালো না লাগলে চোখ বুজে থাকতে পারেন। এ রক্ত ভালো লাগার কথাও নয়, দুনিয়ার সেরা বদমাশের রক্ত এগুলো, খুন করে রেখে এসেছি আমি ওকে।'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো লিটল জন। ধরা পড়ার পর এই প্রথম মুখ খুললো সে, 'ওরে, নীচ দুরাচার! কাকে খুন করেছিস তুই? তোর মত পাপিষ্ঠ, পিশাচের হাতেই নিভলো আজ রবিনের মত এতবড় এক মহান হৃদয়ের জীবন-প্রদীপ! হায়রে! খোদা, আর বাঁচার সাধ নেই আমার, আমাকে তুলে নাও তুমি এই নিষ্ঠুর দুনিয়া থেকে!' দুই গাল বেয়ে দর দর ঝরছে ওর তপ্ত নোনা অশ্রু।

রবিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন নটিংহামের শেরিফ। 'বাহ্, সাবাশ, গাই অফ গিসবোর্ন! এত আনন্দ আমি রাখবো কোথায়! যা বলছো তা যদি সত্য হয়, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন!'

'যা বলছি সব সত্য,' কর্কশ কণ্ঠে বললো রবিন। 'মিথ্যা কথা বলি না আমি। চেয়ে দেখুন, এগুলো রবিন হুডের তলোয়ার, ধনুক আর শিঙা না? আপনি বলতে চান আমি চাইতেই খুশি মনে আমার হাতে তুলে দিয়েছে এসব রবিন হুড?'

হা-হা করে হেসে উঠলেন শেরিফ। আনন্দ আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছেন না তিনি। 'কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ ভোরে! কল্পনাও কি করতে পেরেছিলাম, একই দিনে রবিন হুড আর তার প্রধান চেলাকে খতম করতে পারবো আজ? যা চাইবে তাই পাবে আজ তুমি আমার কাছে, গাই অফ গিসবোর্ন…যা খুশি!'

লিটল জনের দিকে ফিরলো রবিন হুড, পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলো ওকে, তারপর বললো, 'এই লোক রবিন হুডের ডান হাত বুঝি? ভাল, ভাল। আমাকে দু'শো পাউণ্ড দেয়ার কথা ছিল না আপনার?'

'ছিল,' বললেন শেরিফ। একটা থলি বাড়িয়ে দিলেন রবিনের দিকে, 'এই নাও, তোমার পুরস্কার।'

'লাগবে না,' শেরিফকে অবাক করে দিয়ে বললো রবিন। 'টাকা লাগবে না আমার। তার বদলে এই লোকটাকে খুন করার অনুমতি চাই। নেতাকে শেষ করেছি,

চেলাটাকেও নিজ হাতে পার করে দিতে চাই ওপারে।'

টাকা ক'টা বেঁচে যাচ্ছে দেখে আরো খুশি হয়ে উঠলেন শেরিফ, চট্ করে রাজি হয়ে গেলেন উদ্ভট চরিত্রের গাই অফ গিসবোর্নের কথায়। 'বেশ তো, আমার কোনো আপত্তি নেই, যেমন ভাবে খুশি খুন করতে পারো তুমি ওকে।'

'ধন্যবাদ,' বললো রবিন। 'তাহলে এই বদমাশকে ওই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করাতে বলুন আপনার লোকদের। আমাদের ওদিকে নিষ্ঠুর জবাই বলতে কি বোঝায় দেখাচ্ছি আমি আপনাদের।'

অসমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো শেরিফের বেশ কিছু লোক। লিটল জনকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিতে কারও কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু ওকে ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুর ভাবে জবাই করার প্রস্তাবে বিচলিত হয়ে উঠলো ওরা। তবে মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পেল না কেউ, শেরিফের হুকুম পেয়ে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল হাত-পা বাঁধা লিটল জনকে।

ওরা যখন এই কাজে ব্যস্ত, সবার অলক্ষ্যে দুটো ধনুকেই ছিলা পরিয়ে ফেললো রবিন হুড, তারপর কোমরে গোঁজা গাই অফ গিসবোর্নের ড্যাগারটা বের করে ধীর পায়ে মারাত্মক ভঙ্গিতে এগোলো লিটল জনের দিকে। কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিল সে শেরিফের লোকদের, 'অ্যাই! সরে দাঁড়াও। আরও, আরও দূরে!' ধমক খেয়ে বেশ অনেকটা পিছিয়ে গেল লোকগুলো, কেউ কেউ আবার মুখ ফিরিয়ে রেখেছে অন্যদিকে—এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে চায় না বলে।

'আয়, হারামজাদা! আয়!' হাঁক ছাড়লো লিটল জন, 'তোর ওই ছোরাকে আমি ডরাই না! আমার প্রাণের বন্ধুকে তুই মেরেছিস, আমার জীবনের আর কোন অর্থ নেই, যে মহান নেতার একটা মুখের কথায় প্রাণ দিতে পারতাম হাসিমুখে, যার একটা আদরের ডাকে ধন্য হয়ে যেত জীবন, তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিস তুই চিরতরে, তোর টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলে তারপর যদি মরতে পারতাম, তাহলে শান্তি পেতাম!'

লিটল জনের চোখে জ্বলন্ত ঘৃণার দৃষ্টি আর দুই গালে অশ্রুধারা দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলো রবিন কতখানি ভালবাসে মানুষটা ওকে। আশ্চর্য এক কৃতজ্ঞতা-বোধে ছেয়ে গেল ওর মনটা। কাছাকাছি গিয়ে নিচু গলায় বললো, 'তোমার জ্বালায় মরেও তো শান্তি পাব না দেখছি, উল্লুক কোথাকার! জ্যান্ত মানুষের জন্যে এত কাঁদাকাটি, সত্যিই মরে গেলে তখন কি করবে?' ওর গলার স্বর চিনতে পেরে লিটল জনের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চট্ করে বললো রবিন, 'আমার ধনুক, তূণ আর তলোয়ার রাখছি তোমার পায়ের কাছে, বাঁধন কেটে দেয়ার সাথে সাথেই তুলে নেবে ওগুলো।' ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে একবার সামনে বাড়ছে, আবার পিছিয়ে আসছে রবিন ছোরা হাতে, বার দুই পাক খেলো লিটল জনের চারপাশে। এরই ফাঁকে কখন যে লিটল জনের হাত-পায়ের বাঁধন কাটা হয়ে গেছে টের পেল না কেউ। হঠাৎ চমকে উঠলো উপস্থিত সবাই লিটল জনের হেঁড়ে গলার চিৎকার শুনে। চেয়ে দেখলো, না, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর আর্তচিৎকার নয়, ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটি থেকে তীর-ধনুক তুলে নিচ্ছে লিটল জন। আরও অবাক কাণ্ড, মুখের সামনে থেকে টুপিটা সরিয়ে দিয়েছে গাই অফ গিসবোর্ন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে গাইয়ের ছদ্মবেশ পরা রবিন হুডের মুখ। একটা তীর লাগিয়ে বাঁকা করে ফেলেছে সে ধনুকটা।

'সাবধান!' বললো রবিন হুড, 'এক পা এগোবে না কেউ। ধনুকে হাত দিলেই মারা পড়বে নির্ঘাৎ। আপনার ভাড়াটে খুনী খুন হয়ে গেছে আমার হাতে, মাননীয় শেরিফ। দেখবেন, আপনারও না আবার সেই রাস্তা ধরতে হয়!' আড়চোখে চেয়ে দেখলো ও প্রস্তুত হয়ে গেছে লিটল জন, অমনি শিঙাটা মুখে তুলে তিনবার ফুঁ দিল তাতে।

তীক্ষ্ণ শিঙাধ্বনি অন্তর কাঁপিয়ে দিল শেরিফের। গাই অফ গিসবোর্নের পোশাকে

সাক্ষাৎ যমদূতকে দেখছেন যেন তিনি। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে তাঁর। ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'রবিন হুড!' পরমুহূর্তে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়া। মনিবকে পালাতে দেখে কাল বিলম্ব না করে তাঁর পিছু নিল বিশজন অনুচর।

পিছন থেকে অনেক ডাকাডাকি করলো লিটল জন, 'এই যে শেরিফ সাহেব, কোথায় যান? আমরা তো মাত্র দু'জন। ফাঁসীটা দিয়েই না হয় যেতেন!' কিন্তু কে শোনে কার কথা! পিছনে ধুলোর ঝড় তুলে তুমুল বেগে ছুটেছেন শেরিফ নটিংহামের দিকে।

খুবই দ্রুত চলেছেন তিনি, কিন্তু তীরের চেয়ে তো আর দ্রুত নয়—কান পর্যন্ত ছিলা টেনে একটা তীর মেরে দিল লিটল জন। সোজা গিয়ে তীরটা বিঁধলো শেরিফের নিতম্বে। ফলে নটিংহামের গেট দিয়ে যখন তিনি ঢুকলেন, পিছনে বিঁধে থাকা তীরটা দেখে মনে হলো লাফাতে লাফাতে চলেছে এক লেজ তোলা কাঠবিড়ালী। শোনা যায়, কয়েক মাস নাকি অত্যন্ত নরম গদি ছাড়া শক্ত কিছুর ওপর বসতেই পারেননি নটিংহামের শেরিফ।

শিঙাধ্বনি শুনে উইল স্টিউটলির নেতৃত্বে রবিন হুডের দশ-বারোজন অনুচর যখন এসে পৌঁছলো, তখন ময়দান ফাঁকা; বহুদূরে ধুলোর পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না ওরা।

সবাই মিলে ফিরে গেল ওরা জঙ্গলে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল বুড়ির তিন ছেলে, ছুটে এসে চুমো খেলো ওরা লিটল জনের হাতে। ওদেরকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার জন্যে চললো সবাই।

জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বুড়ি। হ্যাল, হব্ আর ডিকনকে সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে দেখে আবার অশ্রু নামলো তার গাল বেয়ে। এবারে আনন্দের অশ্রু। লিটল জন ও রবিন হুডের মাথায় হাত রেখে হাজার হাজার বার আশীর্বাদ করলো সে।

'কিন্তু, বুড়ি মা,' বললো রবিন, 'তোমার এখানে এদের রাখা আর নিরাপদ বলে মনে করি না। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি এদের নিয়ে যেতে পারি আমার আস্তানায়।'

'তাহলে আমি বেঁচে যাই, বাবা,' বললো বুড়ি। 'ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

আস্তানার পথে রওনা হয়ে গেল সবাই।

আঠারো

বন্দী হলো রবিন

মে মাসের এক সুন্দর সকাল। ঝলমল করছে রোদ। শেরউডের গাছে গাছে নতুন নরম পাতাগুলো কাঁপছে মৃদু হাওয়ায়। চারদিকে বুনো ফুলের মিষ্টি সুবাস। দিনটা রোববার—শুধু রোববার নয়, হুইট সানডে (ঈস্টারের পরের সপ্তম রোববার)।

'কি সুন্দর সকালটা, তাই না?' বললো লিটল জন।

কোন জবাব দিল না রবিন হুড।

'কি হয়েছে, ওস্তাদ?' জানতে চাইলো লিটল জন। 'হাঁড়ি করে রেখেছো কেন মুখটা?'

'কতদিন গির্জায় যাইনি বলো তো?' হঠাৎ মুখ খুললো রবিন। 'মনে হচ্ছে, কলুষিত হয়ে রয়েছে দেহ-মন। আজকের এই দিনেও যদি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা না করতে পারি...'

'নটিংহাম ছাড়া কাছে পিঠে আর গির্জা কোথায়?' বললো মাচ।

'ওই নটিংহামেই যাব আমি!' হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলো রবিন। 'হ্যাঁ, সেইন্ট মেরির গির্জায় প্রার্থনা করবো আমি আজ।'

অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলো ওকে লিটল জন আর মাচ, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, ও যাবেই। বললো, 'নিশ্চিন্ত থাকো তোমরা, কেউ সন্দেহ করবে না। চারপাশের গ্রাম থেকে কত লোক ঢুকছে আজ শহরে। ওদেরই মত ছাই-রঙা সুট পরে ঢুকে পড়বো আমিও।'

'ঠিক আছে, যাবেই যখন, জনা বারো লোক নিয়ে যাও সাথে,' বললো মাচ। 'অস্ত্র থাকবে সবার সাথেই, কোন বিপদ হলে যেন আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়।'

'আরে না,' সাফ মানা করে দিল রবিন। 'তোমাদের মত দশ-বারোজন গুণ্ডা কিসিমের লোক সাথে নিয়ে শহরে ঢুকতে গেলেই বরং নজরে পড়ে যাব কারও। একমাত্র লিটল জনকে সাথে নিতে পারি আমার তল্পি-বাহক হিসেবে।'

তৈরি হয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা দু'জন। গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার আশা পূরণ হতে যাচ্ছে বলে খুশি হয়ে ওঠার কথা রবিনের, আসলে কিন্তু তা হলো না। মেজাজটা কেন জানি খিঁচড়ে রয়েছে ওর। ফলে যা হবার হলোঃ কিছুদূর যেতে না যেতেই সাধারণ এক-কথায় দু'কথায় তর্ক বাধিয়ে বসলো সে লিটল জনের সাথে। তর্কাতর্কিটা ক্রমে ঝগড়ার আকার নিল, শেষ পর্যন্ত নটিংহামের কাছাকাছি এসে এমনই চরমে পৌঁছলো যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হঠাৎ চড়াৎ করে একটা চড় কষিয়ে দিল সে লিটল জনের গালে।

অপমানে কালো হয়ে গেল ঢ্যাঙা দৈত্যের মুখ। চট্ করে হাতটা চলে গিয়েছিল তলোয়ারের বাঁটে, কিন্তু সামলে নিল। 'তুমি না হয়ে আর কেউ যদি··· থাক সে কথা। আমি চললাম। অনুচরের অভাব হবে না তোমার, রবিন হুড; কিন্তু আমাকে পাবে না আর!'

রবিন এগিয়ে চললো নটিংহামের দিকে, আর ধুপ-ধাপ পা ফেলে শেরউডের দিকে ফিরলো লিটল জন—আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় নেবে বন্ধু-বান্ধব সবার কাছ থেকে। কিছুদূর হেঁটেই সব রাগ পানি হয়ে গেল রবিনের, অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হেঁটে চললো সে, রাগের মাথায় এমন একটা কাজ করে বসা যে মোটেই উচিত হয়নি, বুঝতে পারছে এখন পরিষ্কার। এমন বিশ্বস্ত অনুচর সারা দুনিয়া খুঁজেও কি সে পাবে দ্বিতীয় আরেকজন? মনে মনে ঠিক করলো সেইন্ট মেরির বেদিমূলে প্রার্থনা করবে সে, যেন আবার ভাব হয়ে যায় ওর লিটল জনের সাথে।

গেট দিয়ে ঢুকতে কোন অসুবিধেই হলো না। সাধারণ কৃষকের পোশাক পরা রবিনের দিকে একবারের বেশি দু'বার চাইলো না তোরণ রক্ষীদের কেউ। সোজা হেঁটে গিয়ে গির্জায় ঢুকলো রবিন। পুরোহিত এসে দাঁড়িয়েছেন মঞ্চে, এখুনি শুরু হবে প্রার্থনা, হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লো সে একটা মোটা থামের পাশে।

পুরোহিতের বাণী পাঠ চলছে, মন দিয়ে শুনছে রবিন, আগ্রহের আতিশয্যে মাথার টুপিটা একটু পিছনে সরে গেছে। হঠাৎ কালো পোশাক পরা দীর্ঘকায় এক সাধুর নজর পড়লো ওর মুখের ওপর। ভিতর ভিতর চমকে উঠলো সাধু। আরে! এই লোক সেই দস্যু রবিন হুড না?

বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল সাধু। রাগ আর ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠলো তার চোখের দৃষ্টিতে। কাউকে কিচ্ছু না বলে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সে গির্জা থেকে।

এসব কিছুই টের পেল না রবিন, বুঝতে পারলো না কতবড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে ওর মাথার ওপর। কালো পোশাক পরা সাধুটি আর কেউ নয়, এমেট মঠের সেই

কোষাধ্যক্ষ—যার বিশ ক্রাউন কয়েকশো পাউণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল ঈশ্বরের ইচ্ছেয়।

প্রথমেই ছুটে গিয়ে নগর-তোরণের রক্ষীদেরকে নির্দেশ দিল সে গেট আটকে দেয়ার। শাসালো, যদি পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত একজন লোকও এই গেট দিয়ে ঢোকে কিংবা বেরোয়, তাহলে সরাসরি জবাবদিহি করতে হবে তাদের শেরিফের কাছে। সাধুর ক্ষমতা সম্পর্কে জানা আছে রক্ষীদের, দ্বিরুক্তি না করে ঘটাং-ঘট বন্ধ করে দিল গেট।

এবার ছুটলো সাধু সোজা শেরিফের বাসার দিকে। খবর দেয়ার ধার না ধেরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো সে হলঘরে। একটা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলেন ওখানে শেরিফ।

'উঠুন, স্যার শেরিফ। জলদি উঠে পড়ুন! সাংঘাতিক খবর নিয়ে এসেছি আমি! লোকজন ডাকুন, ওকে ধরতে হলে এক্ষুণি চলুন আমার সাথে গির্জায়।'

'হয়েছেটা কি? অত হড়বড় করছেন কেন?' একটু বিরক্তই হয়েছেন শেরিফ এভাবে আচমকা তন্দ্রাভঙ্গ হওয়ায়। 'আবার মুরগী চুরি গেছে মঠ থেকে?'

'মুরগী না!' উত্তেজনার বশে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সাধু, 'রবিন! রবিন হুড!'

নামটা কানে যেতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন শেরিফ। 'অ্যাঁ! রবিন হুড! নটিংহামে?'

'তবে আর কি বলছি!' অস্থির হয়ে উঠলো সাধু। 'এক্ষুণি দেখে এসেছি আমি ওকে গির্জায়। যদি লোকজন নিয়ে আমার সাথে···'

'রবিন হুড? গির্জায়? চিনতে ভুল হয়নি তো আপনার?'

'অযথা সময় নষ্ট করছেন আপনি, স্যার শেরিফ,' রেগে উঠলো সাধু। 'আমি ভুল করবো ওকে চিনতে? আটশো পাউণ্ড কেড়ে রেখে দিয়ে কি বিপদেই না ফেলেছিল, কি নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছে আমাকে মোহান্তের কাছে সে আপনি বুঝবেন না। ওর চেহারা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হাজারটা লোকের মধ্যে থেকে একনজর দেখেই বের করে দেব চিনে।'

ছোট্ট একটা রূপোর বাঁশী মুখে তুলে ফুঁ দিলেন শেরিফ, ছুটে এলো একজন পরিচারক। 'এক্ষুণি ত্রিশজন জঙ্গল-রক্ষীকে তৈরি হয়ে নিতে বলো, আমিও বেরোচ্ছি, হানা দিতে হবে এক জায়গায়।' শেরিফকে ত্রস্ত হাতে বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরতে দেখে ছুটে বেরিয়ে গেল পরিচারক। কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে যখন শেরিফ বাইরে বেরোলেন, দেখলেন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে রক্ষীরা। সাধুকে নিয়ে ছুটলেন তিনি গির্জার দিকে, পিছনে মার্চ করে চললো জঙ্গল-রক্ষীর দল।

গির্জার ভেতর এই সশস্ত্র অনুপ্রবেশে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে গেল। উঁচু গলায় ঘোষণা করলেন শেরিফ, 'আপনারা ভয় পাবেন না। ভাল মানুষের কোন ক্ষতি হবে না। আপনাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এক ভয়ানক দস্যু, তাকেই ধরতে এসেছি আমরা।'

'ওই যে! ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠলো সাধু, 'হাঁটু মুড়ে বসে আছে ছাই-রঙা পোশাক পরা লোকটা। ওই যে রবিন হুড!'

নিজের নাম শুনে তাজ্জব হয়ে গেল রবিন, আকাশ থেকে পড়লো যেন। এদিকে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেছে গোটা গির্জা জুড়ে। কেউ সামনে এগিয়ে এসে কাছ থেকে দেখতে চাইছে বিখ্যাত দস্যু রবিন হুডকে, কেউ আতঙ্কিত হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে দূরে। দরজার দিকে চেয়ে দেখলো রবিন, বেরোবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছে রক্ষীরা।

পরিষ্কার বুঝতে পারলো রবিন, এই গোলমালের মধ্যে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পথ করে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন। 'ইশশ!' ভাবলো সে, 'এখন যদি লিটল জনটা থাকতো পাশে!' সড়াৎ করে টান দিয়ে বের করে

ফেললো সে বিশাল তলোয়ারটা, তারপর সিংহ-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো রক্ষীদের ওপর। বিশটা তলোয়ারের বিরুদ্ধে একটা তলোয়ার, কিন্তু রবিনের অসাধারণ নৈপুণ্য আর তড়িৎবেগ কোথায় পাবে ওরা? তাড়াহুড়োয় নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যাচ্ছে ওদের, ঠিক যেখানে মারতে চাইছে সেখানে লাগছে না আঘাত; ওদিকে একের পর এক লোককে ঘায়েল করে চলেছে রবিনের ক্ষুরধার তরবারী। লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে; সামনে যাচ্ছে, পিছনে আসছে, আর সাঁই সাঁই চালাচ্ছে তলোয়ার–কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না রবিনকে। বার তিনেক পথ পরিষ্কার করে বেরিয়ে যেতে গিয়েও পারলো না, নতুন একদল এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

'মেরে ফেলো না!' কাছেই শেরিফের কণ্ঠ শোনা গেল। 'জখম করতে পারো, কিন্তু একেবারে মেরে ফেলো না ওকে! রাজার আদেশ আছে, জ্যান্ত ধরতে হবে!'

শেরিফের গলা চিনতে পেরে ঝট্ করে সেইদিকে ফিরলো রবিন হুড, প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে গিয়ে হাজির হলো তাঁর সামনে–হাতে উদ্যত তলোয়ার। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন শেরিফ, ঢালটা মাথার ওপর তুললেন আত্মরক্ষার জন্যে। ঝনাৎ করে তলোয়ারের আঘাত এসে লাগলো ঢালের গায়ে, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল ঢালটা। আঘাতের গতিবেগ থামলো না তাতে, প্রচণ্ড বেগে নেমে এলো শেরিফের মাথার ওপর। শিরস্ত্রাণটার কল্যাণে বেঁচে গেলেন শেরিফ এ যাত্রা, যদিও এই এক আঘাতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি মেঝের ওপর। সাধারণ লোহা হলে কেটে ঢুকে যেত রবিনের তলোয়ার, কিন্তু পাকা কারিগরের তৈরি ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ প্রচণ্ড আঘাতটা ঠেকিয়ে তো দিলই, দু'টুকরো করে দিল তলোয়ারটা।

ভাঙা তলোয়ারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একজনের হাতের মোটা লাঠিটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো রবিন, কিন্তু পিছন থেকে আর একজন ল্যাঙ মারতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে মেঝেতে। সাথে সাথেই দশ-বারোজন রক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর। হাত-পা ছুঁড়ে মুক্ত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করলো রবিন, কিন্তু এত লোকের চাপের নিচ থেকে বেরোতে পারলো না কিছুতেই। পিছমোড়া করে কষে বেঁধে ফেলা হলো ওকে।

উঠে দাঁড়িয়েছেন শেরিফ, টলছেন, মাথাটা ঘুরছে এখনও, কিন্তু হাত-পা বাঁধা রবিনকে দেখে খুশিতে প্রায় নাচতে শুরু করলেন তিনি। এতদিনে…এতদিনে পেয়েছেন তিনি দস্যু রবিন হুডকে তাঁর হাতের মুঠোয়।

'নিয়ে চলো!' হুকুম দিলেন শেরিফ। 'দুর্গের সবচেয়ে নিচের দুর্ভেদ্য কুঠরীতে আটকে দাও। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা দ্বিগুণ পাহারার ব্যবস্থা করো।'

দুর্গের নিচে সাত ফুট চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা কারাগার প্রকোষ্ঠে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হলো রবিনকে, লোহার বল্টু এঁটে ঝোলানো হলো বড় বড় তিনটে তালা।

'এখান থেকে বেরোক দেখি,' বললেন শেরিফ। 'বুঝবো বাপের ব্যাটা! আজ পর্যন্ত কেউ এই ঘর থেকে পালাতে পারেনি।'

'কিন্তু…' শেরিফের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হতে পারছে না কালো পোশাক পরা সাধু। 'ঝামেলাটা বাধিয়ে রেখে কি লাভ আমি বুঝতে পারছি না কিছুতেই। এক্ষুণি ওকে ফাঁসী দিয়ে দিলেই তো চুকে যায় ল্যাঠা।'

'যদি পারতাম, তাহলে আমি এক সেকেণ্ড দেরি করতাম মনে করেছেন? আমার হাতে সে-ক্ষমতা থাকলে ফাঁসীর ঝামেলাতেও যেতাম না, ওইখানে ওই গির্জার মধ্যেই খুন করে ফেলতাম ওকে।'

'ক্ষমতা নেই?' জানতে চাইলো কোষাধ্যক্ষ। 'গোটা নটিংহাম শায়ারে আপনার চেয়ে ক্ষমতা বেশি কার?'

'রাজার,' নিচু গলায় বললেন শেরিফ। 'রাজার আদেশ এসেছে ক'দিন আগে, যদি

কখনও ধরা পড়ে রবিন হুড, যেন তাকে শাস্তি দেয়ার আগে তাঁর অনুমতি নেয়া হয়। এই দস্যু সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন রাজা রিচার্ড, তিনি নিজ চোখে একবার দেখতে চান একে।'

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে কিছু ভাবলো কোষাধ্যক্ষ, তারপর বললো, 'আমিই ওকে তুলে দিয়েছি আপনার হাতে।'

'ঠিক, ঠিক,' বললেন শেরিফ।

'রাজার কানে ওর বন্দী হবার সংবাদটা পৌছানোর ব্যাপারে আমার দাবিই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।'

'তা উচিত,' বললেন শেরিফ। 'মনে হয় ভাল পুরস্কার মিলবে সংবাদদাতার কপালে।'

'রাজা যদি কোন পুরস্কার দেন, সেটা আমারই পাওয়া উচিত বলে মনে করেন না?'

'মনে করি। আপনি পেলে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং খুশি হব যদি রাজা আপনাকে কোন বড়সড় মঠের মোহান্ত-টোহান্ত করে দেন। আপনি আজ মস্ত উপকার করেছেন আমার। আপনার সহযোগিতার কথা উল্লেখ করবো আমি আমার চিঠিতে।'

'ধন্যবাদ!' খুশি হয়ে উঠলো সাধু। 'তাহলে কাল ভোরেই রওনা দেব আমি আপনার চিঠি নিয়ে। এখন চলি তাহলে? যাত্রার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে আমার আবার।'

সেই রোববার সারাটা দিন ধরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করলো গোটা নটিংহাম শহরে। সবার আলোচ্য বিষয়ঃ রবিন হুড। গ্রেফতারের সময় যারা গির্জায় ছিল তাদের প্রত্যেককে ঘিরে জটলা বাঁধলো শ্রোতার দল, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চায় সবাই। রবিনকে আটকে রাখা সম্ভব হবে কি হবে না তাই নিয়ে তুমুল তর্কের ঝড় উঠলো ঘরে ঘরে। কিন্তু এতসব আলোচনা-সমালোচনার একটি শব্দও বেরোতে পারলো না শহরের চার দেয়ালের বাইরে। প্রতিটি গেটের প্রহরা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন শেরিফ, কড়া হুকুম দিয়েছেন—রাজার নির্দেশ এসে পৌছানোর আগে কেউ শহরের বাইরে যেতে কিংবা ভেতরে আসতে পারবে না। কেউ যদি বাইরে বেরোতে না পারে, রবিন হুডও পারছে না; আর কেউ যদি ভেতরে আসতে না পারে, তার দলবলও আসতে পারছে না উদ্ধারের চেষ্টায়।

এত করেও কিন্তু সংবাদ আটকে রাখতে পারলেন না শেরিফ। মুচি লবের মাধ্যমে ঠিকই খবর পেয়ে গেল শেরউডের সবাই। সন্ধে হতেই রবিন হুডের দু'জন বিশ্বস্ত লোককে সাথে নিয়ে মই বেয়ে বাড়ির ছাতে উঠে সেখান থেকে নগর-প্রাচীরের মাথায় চড়েছে সে। একটা দড়ির সাহায্যে লবকে দেয়ালের বাইরে নামিয়ে দিয়েছে ওরা, নিচে নেমে বাঁধন খুলে দিতেই আবার টেনে তুলে নিয়েছে দড়িটা। সোজা রবিনের আস্তানার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে লব।

লব গিয়ে দেখলো দলের সবার মধ্যে চাপা একটা অস্বস্তির ভাব বিরাজ করছে। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কিন্তু অমঙ্গল আশঙ্কায় ভেতর ভেতর অস্থির হয়ে রয়েছে প্রত্যেকে। সবাই বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে রবিনের। কারণ, কিছু না বলে এভাবে বাইরে কোথাও এতক্ষণ থাকে না রবিন হুড। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে লিটল জনের, অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে সে রবিনকে একা নটিংহামে যেতে দিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে আসায়।

লবের মুখে সব শুনে একেবারে ভেঙে পড়লো দলের সবাই, ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ছে কেউ কেউ, রবিনের যে নির্ঘাৎ ফাঁসী হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কারও মনে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই—একমাত্র লিটল জন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলো না

যে রবিনের কোন ক্ষতি হতে পারে।

'শোনো,' সবাইকে ডেকে বললো সে। 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়েছিল রবিন সেইন্ট মেরির গির্জায়। সেই গির্জা থেকে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে কেউ ফাঁসী দিতে পারবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর ওকে সাহায্য করবেন। বহুবার মরতে মরতেও বেঁচে ফিরে আসেনি ও আমাদের মধ্যে? দেখে নিয়ো, এবারও আসবে। কাজেই হা-হুতাশ বাদ দিয়ে, এসো, আমাদের কর্তব্য ঠিক করে নেয়া যাক। আমার মনে হয় শহরটার ওপর নজর রাখা এখন বিশেষ ভাবে দরকার, একটা কিছু উপায় খুঁজে বের করতে হবে আমাদের যাতে ভেতরে ঢুকে ওকে মুক্ত করে আনতে পারি।'

পরদিন খুব ভোরে নটিংহামের দক্ষিণ-তোরণের কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে বসে আছে লিটল জন, সাথে মাচ। লিংকন গ্রীন ছেড়ে দু'জনেই পরেছে পশুপালকের চামড়ার পোশাক। এ পোশাকে কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে এই অঞ্চলের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারবে তারা। সূর্য ওঠেনি এখনও, কিন্তু উঠি উঠি করছে। আরেকটা সুন্দর সূর্যকরোজ্জ্বল দিন আসছে, ঘুম থেকে উঠে মিষ্টি গান জুড়েছে পাখিগুলো, অপূর্ব লাগছে মৃদু বাতাসে পাতার মর্মর—এই মুহূর্তে মাটির নিচের এক অন্ধকার কুঠরিতে বন্দী হয়ে রয়েছে রবিন, ভাবতে গিয়ে খচ্ করে কাঁটা বিঁধলো লিটল জনের বুকের ভেতর। হঠাৎ লক্ষ্য করলো ওরা, ধীরে ধীরে গেটের পাশের একটা গুপ্ত দরজা খুলে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে দেখা গেল তেজি একটা ঘোড়ায় চেপে কালো পোশাক পরা এক সাধু বেরিয়ে এলো বাইরে। তার পিছনেই একটা সাদা ঘোড়ায় রয়েছে অল্পবয়েসী এক পরিচারক। ওরা বেরিয়ে যেতেই বন্ধ হয়ে গেল গুপ্ত দরজাটা। সোজা এগিয়ে আসছে ঘোড়া দু'টো ওরা যে ঝোপটার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে সেদিকেই।

'ওই কালো সাধুটাকে চিনতে পারছো, মাচ?' ফিসফিস করে বললো লিটল জন, 'এ হচ্ছে সেই কোষাধ্যক্ষ, যাকে তুমি, আমি আর উইল স্কারলেট ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম রবিনের কাছে, বিশ ক্রাউনের বেশি আর কিছু নেই বলেছিল, কিন্তু বেরিয়েছিল আটশো পাউণ্ডেরও বেশি। মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকালো মাচ, তারপর উঠে পড়লো লিটল জনের ইঙ্গিত পেয়ে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে রাস্তায় গিয়ে উঠলো দু'জন, তারপর ধীর পায়ে এগোলো নটিংহামের দিকে।

চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলাতে বুলাতে ধীর গতিতে এগোচ্ছে সাধু আর পরিচারক, কোন দিকে বিপদের কোন আভাস দেখলেই তীরবেগে ছুটিয়ে দেবে ঘোড়া। একটা মোড় ঘুরতেই দেখা গেল দু'জন নিরীহ পশুপালক চলেছে শহরের দিকে। এদেরকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করলো না সাধু, যেমন চলছিল তেমনি হাঁটার গতিতে এগিয়ে চললো সামনে।

'সুপ্রভাত, হোলি ফাদার,' মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলো লিটল জন কালো সাধুকে। 'নটিংহাম শহর থেকে আসছেন বুঝি?'

'ঠিকই ধরেছো,' বললো সাধু গম্ভীর কণ্ঠে।

'ওখানকার খবর কি, ফাদার? কানাঘুষোয় শুনলাম, সেই জঘন্য চরিত্রের দস্যুটা নাকি ধরা পড়েছে কাল?'

'কার কথা বলছো তুমি?'

'দস্যু রবিন হুড।'

'সর্বনাশ!' এক হাতে কপাল চাপড়ালো সাধু। 'খবরের কি পাখা আছে নাকি! কি করে যে গুজব ছড়ায়, আশ্চর্য! যাই হোক, মিথ্যা শোনোনি, সত্যিই কাল সেইন্ট মেরির গির্জা থেকে ধরা পড়েছে ভয়ঙ্কর লোকটা।'

'যাক!' হাঁফ ছাড়লো লিটল জন। 'শুনে আনন্দ হচ্ছে। আমাদের দু'জনের কাছ

থেকে একবার টাকা কেড়ে নিয়েছিল শয়তানটা। ঠিক হয়েছে এখন, ভাল হয়েছে।'

'তোমাদের আর কয়টা টাকা, আমার কাছ থেকে আটশো পাউণ্ড কেড়ে নিয়েছিল দস্যুটা। তবে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছি আমি কাল। আমিই আবিষ্কার করি ওকে গির্জার মধ্যে, আমিই দৌড়ে গিয়ে খবর দিই শেরিফকে। ওর গ্রেফতারের ব্যাপারে কাউকে যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, আমাকে দিতে পারো।'

'আপনার প্রাপ্য থেকে যেন ঈশ্বর আপনাকে বঞ্চিত না করেন,' বললো লিটল জন। 'কখনও যদি সুযোগ হয়, আমরাও পুরস্কৃত করবো আপনাকে। চলুন, আপনাকে পাহারা দিয়ে কিছুদূর অন্ততঃ এগিয়ে দিয়ে আসি। আশে-পাশের জঙ্গলে লোকজন আছে রবিন হুডের, ধরতে পারলে খুন করে ফেলবে ওরা আপনাকে।'

'জানি আমি,' বললো কালো সাধু। 'সেজন্যে প্রস্তুতও আছি আমরা। বিপদের সামান্য আভাস পেলেই তীর বেগে ছুটে পালাবো।'

'বিপদের আভাস সব সময় টের পাওয়া যায় না, ফাদার,' বললো লিটল জন। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো গম্ভীর মুখে। 'বিপদ জিনিসটা চেনা মুশকিল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।'

রওনা হয়ে গেল ওরা। নিজের কৃতিত্বে এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছে সাধু যে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে চললো নিজের বাহাদুরির কথা। রাজার কাছে যে শেরিফের চিঠি বয়ে নিয়ে চলেছে, বললো সেকথাও।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে জঙ্গলের একটা অন্ধকার মত জায়গায় এসেই হঠাৎ সাধুর ঘোড়ার রাশটা টেনে ধরলো লিটল জন। মুহূর্তে বুঝে নিল সাধু বিপদ কোথায়, চট্ করে কালো আলখেল্লার ভেতর থেকে একটা ছোরা বের করে বিঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো লিটল জনের বুকে। লাফিয়ে সরে গেল লিটল জন, পোশাকের নিচে লুকিয়ে রাখা তলোয়ারটা বের করলো একটানে, সাঁই করে চালালো সেটা কালো সাধুর গলা লক্ষ্য করে। এক আঘাতেই ঘোড়ার ওপর থেকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সাধু, বার কয়েক হাত-পা ছুঁড়েই ত্যাগ করলো শেষ নিঃশ্বাস।

'এই হারামজাদাই সমস্ত নষ্টের গোড়া,' বললো লিটল জন। 'রাজার কাছে গিয়ে কৃতিত্ব জাহির করার সাধ মিটিয়ে দিয়েছি জন্মের তরে।'

পরিচারক ছোকরাটার ঘোড়ার রাশ ধরে রেখেছিল মাচ, এক হাতে শিঙাটা মুখে তুলে তাতে ফুঁ দিল তিনটে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারপাশ থেকে হুড়মুড় করে এসে হাজির হলো জনা বিশেক যুবক। কালো সাধুকে কবর দেয়ার নির্দেশ দিল লিটল জন, বললো, মাচ আর ও ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয় ছোকরাকে। তারপর সাধুর পকেট থেকে চিঠি বের করে নিয়ে চেপে বসলো সে তার ঘোড়ায়। মাচ চড়লো পরিচারকের ঘোড়াটায়। ছুটলো ওরা লণ্ডনের উদ্দেশে।

লণ্ডনে পৌঁছে সোজা রাজ প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলো ওরা। দ্বার-রক্ষীকে বললো, 'নটিংহামের শেরিফের জরুরী চিঠি এনেছি মহামান্য রাজা রিচার্ডের কাছে। রাজা ছাড়া আর কারো হাতে দেয়া যাবে না এ চিঠি।'

মস্ত এক হলঘরে কারুকার্য খচিত বিশাল এক চেয়ারে বসে আছেন সিংহ-হৃদয় রাজা রিচার্ড। আশেপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কয়েকজন লর্ড। লিটল জন আর মাচকে নিয়ে আসা হলো সেখানে। হাঁটু ভাঁজ করে বসে কুর্নিশ করলো লিটল জন রাজাকে, তারপর বাড়িয়ে ধরলো চিঠি।

'ঈশ্বর মঙ্গল করুন,' বললো সে। 'মহামান্য রাজার হৃদয়ে বর্ষিত হোক স্বর্গের শান্তি।'

মৃদু হাসলেন রাজা। চিঠিটা নিয়ে খুলে মন দিলেন পড়ায়। প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লিটল জন রাজার মুখের দিকে। দু'চোখ ভরে দেখছে না, যেন গোগ্রাসে গিলছে

সে রাজাকে। মুখটা সুদর্শন, উজ্জ্বল নীল চোখ দু'টোতে রাজ্যের দুঃসাহস, এক নজরেই বোঝা যায় মস্ত একটা উদার হৃদয় রয়েছে তাঁর বুকের ভিতর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে নিচ্ছে লিটল জন, যাতে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা যায় শেরউডে ফিরে।

হঠাৎ একটা হাত তুললেন রাজা, জোরে একটা চাপড় দিলেন চেয়ারের হাতলে। বোঝা গেল কোন কারণে খুবই খুশি হয়ে উঠেছেন তিনি। একটু বাদেই চিঠি থেকে মুখ তুলে উপস্থিত সবার দিকে চাইলেন রাজা।

'সুখবর আছে একটা,' বললেন তিনি। 'নটিংহামের শেরিফ খবর দিচ্ছেন, ধরা পড়েছে শেরউডের সেই দুঃসাহসী দস্যু রবিন হুড। তার সম্পর্কে আমার কি ইচ্ছা জানতে চেয়েছেন তিনি।'

'দারুণ খবর, হুজুর! দারুণ খুশির খবর!' চেঁচিয়ে উঠলেন কাছে দাঁড়ানো হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ। 'বহুদিন থেকে সবাইকে জ্বালিয়ে মারছে বদমাশটা। আপনাকে তো বলেছি ওর কুকীর্তির কথা, কি রকম নাজেহাল করেছিল আমাকে। অবশেষে ধরা তাকে পড়তেই হলো। কী যে খুশি লাগছে, হুজুর! এক্ষুণি আদেশ দিয়ে দিন ওকে ফাঁসীতে লটকে দেবার।'

মৃদু হাসলেন রাজা। আবার মনোনিবেশ করলেন চিঠিতে। বিশপের উল্লসিত পরামর্শ যেন শুনতেই পাননি তিনি। আর একবার চিঠিটা পড়ে নিয়ে বললেন, 'অনেকদিন থেকেই শখ ছিল আমার একে দেখার। আমি দেখতে চাই কেমন মানুষ সে। আমি শাসন করছি গোটা দেশ, কিন্তু ওর এলাকায় ও-ই সর্বেসর্বা। ওর শাসন মেনে নিচ্ছে মানুষ খুশি মনে। আমি জানতে চাই, কেন? কি আছে রবিন হুডের মধ্যে যে রাজার সম্মান দেয়া হচ্ছে ওকে শেরউডের জঙ্গলে?'

কেউ কোন কথা বললো না। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন রাজা লিটল জনের চোখের দিকে। 'চিঠিতে দেখছি এমেট মঠের কোষাধ্যক্ষ বয়ে নিয়ে আসছে এটা। কোথায় গেল সে? তার বদলে তোমরা কেন?'

উত্তরটা আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিল লিটল জন। বললো, 'ইয়োর ম্যাজেস্টি, সেই সাধু মারা গেছেন পথে; চিঠি পৌছানোর দায়িত্ব পড়েছে আমার কাঁধে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাজা। এ নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামালেন না। যেভাবেই পৌছে থাক, পৌছেছে চিঠি। বললেন, 'রবিন হুডকে দেখতে চাই আমি। তোমরা দু'জন যখন সংবাদ নিয়ে আসতে পেরেছো, আমার বিশ্বাস, ওকেও এনে হাজির করতে পারবে। তোমাদের ওপরই দায়িত্ব দিচ্ছি আমি; আমার নির্দেশ গিয়ে জানাবে নটিংহামের শেরিফকে; বলবে, ওকে পাহারা দেবার জন্যে যেন চল্লিশজন তীরন্দাজ দেয় তোমাদের সাথে। আমার এই সীলটা রাখো, দেখাবে শেরিফকে।'

রাজার সীল হাতে নিয়ে উপযুক্ত সম্মানের সাথে চুমো খেল তাতে লিটল জন, ঢুকিয়ে রাখলো বুক-পকেটে। ওদের প্রত্যেককে বিশ পাউণ্ড করে বখশিশ দিলেন রাজা। বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা নটিংহামের উদ্দেশে।

কোথাও বেশিক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে প্রায় একটানা ঘোড়া চালিয়ে এসে পৌছলো ওরা নটিংহাম শহরের গেটের সামনে। যেমন ছিল তেমনি বন্ধ রয়েছে গেট, তালা মারা। দমাদম দরজা পিটালো লিটল জন, হাঁক-ডাক ছাড়লো তোরণ-রক্ষী-প্রধানের উদ্দেশে। দেয়ালের ওপর থেকে মাথা বের করে নিচের দিকে চাইলো রক্ষী-প্রধান, জানতে চাইলো কি চায় ওরা।

'ব্যাপারটা কি!' তাজ্জব হয়ে যাওয়ার ভান করলো জন। 'দিন দুপুরে গেটে তালা দিয়ে ঘুমাচ্ছো নাকি তোমরা?'

'না,' জবাব দিল তোরণ-রক্ষীদের প্রধান। 'রবিন হুডকে আটকে রাখা হয়েছে দুর্গ-কারাগারে। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার জন্যে আটকে দিয়েছি আমরা গেট, যাতে ওর

লোকজন ঢুকে পড়ে কোন গোলমাল না করতে পারে। চারদিক থেকে শহরটাকে ঘিরে রেখেছে ওরা, দেয়ালের ওপর আমাদের কাউকে দেখলেই তীর মারছে।' একটু থেমে জানতে চাইলো সে, 'তোমরা কারা?'

'আমরা লণ্ডন থেকে এসেছি। রাজার তরফ থেকে বাণী নিয়ে এসেছি নটিংহামের শেরিফের কাছে।'

এই কথা শুনে গেটটা সামান্য ফাঁক করে ওদের দু'জনকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দেয়া হলো, ওরা ঢুকে পড়তেই আবার তালা মেরে দেয়া হলো দরজায়। গেটে কড়া পাহারার নমুনা দেখে ছোট্ট করে শিস দিল লিটল জন। বললো, 'এক্ষুণি শেরিফের সাথে দেখা করতে চাই আমি। কোন্‌দিকে তার বাড়িটা···একজন লোক দিতে পারবে আমাদের সাথে?'

লোক দিল রক্ষী-প্রধান। সোজা গিয়ে দেখা করলো ওরা শেরিফের সাথে। রাজার সীলটা দেখাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শেরিফ, মাথা থেকে হুড সরিয়ে কুর্ণিশ করলেন সীলটাকে–যেন রাজা স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে।

'মহামান্য রাজা রিচার্ডের কাছ থেকে কি নির্দেশ বয়ে এনেছেন আপনারা?' জানতে চাইলেন শেরিফ।

গড় গড় করে বলে গেল লিটল জন। মাথা ঝুঁকিয়ে জানালেন শেরিফ, তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার পর কি ঘটবে দস্যুটার কপালে, কিছু শুনেছেন কারও মুখে?'

'শুনেছি, কিছু বাছা বাছা কথা শোনাবেন রাজা বদমাশটাকে, তারপর ওকে ঝুলিয়ে দেয়া হবে ফাঁসী কাঠে।'

'বেশ, বেশ!' খুশি হয়ে উঠলেন শেরিফ। 'আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, রাজা আবার ওকে ক্ষমা-টমা করে দেন না কি! কিন্তু এমেটের সেই সাধু কোথায় গেলেন, রাজার অনুগ্রহ পাবার আশায় নিজেই যেচে পড়ে সংবাদ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি··· পুরস্কার কিছু মিলেছে?'

'হ্যাঁ, মিলেছে,' বললো লিটল জন। 'এতই ভাল পুরস্কার যে এমেট মঠে আর ফিরতে হবে না তাঁকে কোন দিনই। যথাযোগ্য পুরস্কারই মিলেছে তাঁর।'

'টাকা, না জমি?'

'জমি। যতটা দরকার, ঠিক ততটাই,' বললো লিটল জন। 'কিন্তু, মাননীয় শেরিফ, অনেক পথ চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা; একটা সরাইখানা খুঁজে নিয়ে বিশ্রাম করবো আমরা এখন। কাল আবার সকাল-সকাল রওনা হতে হবে তো, একটু জিরিয়ে না নিলে···'

'আরে না, না!' চেঁচিয়ে উঠলেন শেরিফ, 'কি যে বলেন! সরাইখানায় যাবেন কেন? আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি। বিরাট এক ভোজের আয়োজন করছি আমি আপনাদের সম্মানে, যেন রাজা জানতে পারেন, উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছি আমরা তাঁর দূতদের।'

সত্যিই, খুবই জাঁকজমকের সাথে মস্ত এক ভোজের আয়োজন করে সম্মান দেখালেন শেরিফ রাজার দূতদেরকে। খানাপিনা চললো অনেক রাত পর্যন্ত। আকণ্ঠ মদ খেয়ে প্রায় বেহুঁশ হবার দশা হলো সবার, গ্লাসের পর গ্লাস রাজার 'স্বাস্থ্য পান' করতে করতে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল থাকলো না আর কারো। টলতে টলতে অতিথিদের বিশ্রামের ঘর দেখিয়ে দিলেন শেরিফ।

ঘণ্টাখানেক চুপচাপ অপেক্ষা করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো লিটল জন আর মাচ। টুঁ শব্দ নেই কোথাও, বোঝা যাচ্ছে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খোলা তলোয়ার হাতে পা টিপে বেরিয়ে এলো ওরা ঘর থেকে। হলঘরের সতরঞ্চির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে

শুয়ে আছে অনেকে, মদের প্রভাবে ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। ওদের কাউকে ডিঙিয়ে, কাউকে পাশ কাটিয়ে শেরিফের ঘরে গিয়ে হাজির হলো ওরা। গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছেন শেরিফও, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। তাই তাঁর হাতের আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিতে মোটেই অসুবিধে হলো না লিটল জনের। ব্যাস, এখানকার কাজ শেষ, পা টিপে বেরিয়ে এলো ওরা বাড়ির বাইরে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে দ্রুত পায়ে ছায়ার মত হেঁটে সোজা এসে হাজির হলো ওরা কারাগারের সামনে। বাইরে কাউকে দেখতে না পেয়ে লোহার গেটের গায়ে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে খটাখট আওয়াজ শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতি হাতে গেটের ওপাশে এসে দাঁড়ালো জেলার। জানতে চাইলো কারা ওরা, কি চায় এত রাতে।

'জেল ভেঙে পালিয়েছে রবিন হুড!' দোষারোপের ভঙ্গিতে বললো লিটল জন, 'কেমন জেলার তুমি?'

'খুবই ভাল জেলার,' জবাব দিল লোকটা। 'জ্যান্ত একটা মিছে কথা কোথায় কুড়িয়ে পেলে, হে? এইমাত্র দেখে এলাম আমি, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দিব্যি বসে বসে ঝিমাচ্ছে রবিন হুড।'

'যাই হোক, নিজের চোখে সেটা দেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই আমরা,' বললো লিটল

জন। 'সত্যিই ও কুঠরিতে আছে কিনা নিজের চোখে দেখবো আমরা।'

'কে তোমরা?'

'লণ্ডন থেকে এসেছি আজ আমরা, রাজার দূত,' উত্তর দিল লিটল জন। শেরিফের আংটিটা বের করে দেখালো। 'শেরিফের অনুমতি নিয়ে এসেছি আমরা, এই দেখো তার প্রমাণ।'

আংটিটা দেখা মাত্র ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে গেট খুলে দিল জেলার। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে একলাফে ভেতরে ঢুকে গলা টিপে ধরলো লিটল জন জেলারের, যাতে টুঁ শব্দ না বেরোতে পারে গলা দিয়ে। চটপট জেলারের হাত-পা বেঁধে ফেললো মাচ, মুখ বেঁধে ফেললো ভেতরে কাপড় ঠেসে দিয়ে। ওর কোমর থেকে চাবির গোছাটা চলে গেল লিটল জনের হাতে।

'এখন আমিই জেলার!' বললো লিটল জন। জেলার হিসেবে তার প্রথম কাজ হলো প্রাক্তন জেলারকে একটা কুঠরিতে পুরে বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া। মাচকে সিঁড়ির মাথায় পাহারায় রেখে বাতি হাতে তর তর করে নেমে গেল সে সিঁড়ি বেয়ে। সবচেয়ে নিচের কুঠরির লোহার দরজায় বিরাট আকারের তিনটে তালা দেখে বুঝলো সে, এরই মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে রবিন হুডকে।

একের পর এক চাবি লাগিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করছে লিটল জন। সপ্তম, অষ্টম ও নবম চাবিতে খুলে গেল পর পর তিনটে তালা। ভারি বল্টুগুলো খুলে ফেললো সে ঘটাং ঘট, তারপর ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল লোহার দরজা। একগাদা খড়ের ওপর আধশোয়া হয়ে বসে আছে একজন হাত-পা বাঁধা লোক। বাতির আলোয় পরিষ্কার চিনতে পারলো লিটল জন রবিনকে।

'ওস্তাদ! আমি এখানে! উঠে পড়ো, পালাতে হবে এক্ষুণি।'

'লিটল জন!' চাপা, বিস্মিত কণ্ঠে ডাকলো রবিন। গলাটা চিনতে পেরেছে সে লিটল জনের, কিন্তু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে যেন ভরসা পাচ্ছে না।

'হ্যাঁ, ওস্তাদ, আমি!' একটা ছোরা বের করে ত্রস্তহাতে সমস্ত বাঁধন কেটে দিল লিটল জন। তারপর কাপড়ের নিচে লুকিয়ে আনা আরেকটা তলোয়ার বের করে গুঁজে দিল রবিনের হাতে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো রবিন হুড, হাতে তলোয়ার পেয়ে শারীরিক-মানসিক সমস্ত শক্তি ফিরে পেল সে এক-মুহূর্তে।

ঠিক এমনি সময়ে ওপর থেকে মাচের চিৎকার ভেসে এলো। একলাফে কুঠরি থেকে বেরিয়েই এক-এক লাফে তিন ধাপ করে ডিঙিয়ে ছুটলো ওরা উপর দিকে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই দেখতে পেল ওরা উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে পাঁচজন গার্ড কোণঠাসা করে ফেলেছে মাচকে। প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো লিটল জন ওদের উপর। রবিনও ছুটে গেল তলোয়ার হাতে। যে কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল গার্ডরা, সেই কামরায় ওদের ফেরত পাঠাতে বেশিক্ষণ লাগলো না ওদের তিনজনের। মুখ বাঁধাবাঁধির সময় নেই এখন, কাজেই বাইরে থেকে দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিয়েই হাঁক ছাড়লো লিটল জন, 'জলদি! জলদি কেটে পড়তে হবে এখন! লোকজন জেগে উঠবে এখনই গার্ডদের চিৎকার শুনে। দৌড় লাগাও!'

দৌড়ে বেরিয়ে এলো ওরা কারাগারের খোলা গেট দিয়ে। ওদিকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে গার্ডরা।

'পশ্চিম তোরণের দিকে চলো!' বললো রবিন। 'ওদিকে গার্ডের সংখ্যা কম হবে।'

'চলো ওদিকেই,' বললো লিটল জন। 'কিন্তু গার্ড কোনও দিকেই কম নেই। প্রত্যেক গেটেই দ্বিগুণ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রীতিমত যুদ্ধ করে বেরোতে হবে আমাদের।' কিছুদূর দৌড়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তিনজন একসাথে। ঢং ঢং করে বেজে উঠেছে কারাগারের পাগলা-ঘন্টি। বীভৎস আকার ধারণ করলো লিটল

জনের মুখ। বললো, 'ওই হারামজাদা গার্ডগুলোর কাজ! গোটা শহরের প্রত্যেককে কাজে লাগাবে ওরা এবার আমাদের বিরুদ্ধে। এক্ষুণি হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে সব লোক। জলদি! এসো আমার সাথে!' বলেই একটা অন্ধকার গলি ধরে ছুট লাগালো সে। কিছুদূর গিয়ে অন্ধকার এত গাঢ় হয়ে উঠলো যে একে অন্যের হাত ধরে চলতে হলো ওদের। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে আরও সংকীর্ণ গলিতে চলে এলো লিটল জন। বড় রাস্তা থেকে যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে একটা দেয়ালের পাশে চালার নিচে দাঁড়ালো ওরা।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, ঢং ঢং পাগলা-ঘন্টি বেজে চলেছে এখনও, গোটা শহর জেগে উঠেছে, শোরগোল বাড়ছে ক্রমে, ব্যাপার কি জানার জন্যে আলো হাতে বেরিয়ে পড়ছে মানুষ রাস্তায়।

'রাস্তার লোকজন আর একটু বাড়ুক,' বললো লিটল জন। 'তারপর আমরাও মিশে যাবো ভিড়ের মধ্যে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। পাগলের মত ছুটোছুটি করছে লোকজন খবরের জন্যে। আধঘন্টা অপেক্ষা করে আলগোছে লোকজনের মিছিলে জুটে গেল ওরা তিনজন। লিটল জনের পিছন পিছন হাঁটছে মাচ আর রবিন হুড। কিছুক্ষণ হাঁটার পরই টের পেল ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে ওদের লিটল জন। এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে কারও সন্দেহের উদ্রেক না করে ক্রমে মুচি লবের দোকানের দিকে নিয়ে চলেছে সে ওদের। গলির মুখে দাঁড়িয়ে শুনলো ওরা একজন উঁচু গলায় হাঁক ছেড়ে আরেকজনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, 'পালিয়েছে রবিন হুড। জেল ভেঙে পালিয়েছে ঠিকই, কিন্তু গেট ডিঙাতে পারবে না; রাতটা এই শহরেই কাটাতে হবে ওকে। কাল ভোরে বাড়ি বাড়ি সার্চ করে খুঁজে বের করা হবে ওকে।'

'তাহলে তো সকালের আগেই নটিংহাম ছেড়ে বেরোতে হয়,' বললো লিটল জন। লম্বা পা ফেলে আবার এগোলো সে। লবের দোকানের পিছনে ছোট্ট কুঠরিটার জানালায় কয়েকটা মৃদু টোকা দিতেই ভিতর থেকে লবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল লিটল জন। 'লব, বাসায় তুমি একা?'

'আরে! লিটল জন নাকি?' ফিস ফিস করে জানতে চাইলো লব। 'এত রাতে তুমি কোত্থেকে? এসো, এসো, একাই আছি।'

দরজা খুলে দিতেই অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো তিনজন। বাতি জ্বেলে রবিন হুডকে তার ঘরে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল লব; কিন্তু যতটা না অবাক হলো তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হলো সে ওকে মুক্ত দেখে।

'কিভাবে কি ঘটেছে শুনে নিয়ো তুমি কাল লোকের মুখে,' বললো লিটল জন। 'এক্ষুণি আমাদের পার করার ব্যবস্থা করো, লব। তুমি যেভাবে আমাদের খবর দিতে গিয়েছিলে, সেই একই কৌশলে পালাতে চাই আমরা শহর ছেড়ে। জলদি!'

'বেশ তো,' বললো লব। 'মইয়ের মাথায় তৈরি আছে দড়ি। চলো, ছাতে চলো।'

মই বেয়ে লবের বাড়ির ছাতে, তারপর সেখান থেকে প্রাচীরের ওপর উঠে পড়লো ওরা। কোমরে দড়ি বেঁধে প্রথমে নামানো হলো রবিনকে, তারপর নামলো মাচ; লবের পক্ষে ওর ওজন সামলানো সম্ভব নয় বলে দড়ির ধার ধারলো না লিটল জন, দুই হাতে প্রাচীরের প্রান্ত ধরে ঝুলে পড়লো প্রথমে, তারপর লাফ দিয়ে নেমে পড়লো নিচে। দ্রুত হাতে রশি গুটিয়ে নিল লব, দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল ওরা তিনজন শেরউডের উদ্দেশে। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই তখন।

এদিকে সকালের অপেক্ষায় অস্থির পদে পায়চারি করছেন শেরিফ। পাগলা-ঘন্টি শুনে নেশা ছুটে গেছে তাঁর। জেল ভেঙে রবিন হুডের পালাবার খবর শুনে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন তিনি, তারপর সব দিকের গেটে পাহারার ব্যবস্থা আরো দ্বিগুণ জোরদার

করে দিলেন। এতে রাগ কিছুটা প্রশমিত হলো বটে, কিন্তু সেই জায়গা দখল করলো আশঙ্কা–বাড়ি বাড়ি সার্চ করেও যদি ওকে পাওয়া না যায়! কিভাবে মুখ দেখাবেন তিনি রাজার কাছে? রাজা যে রকম রাগী মানুষ, তাঁকেই না আবার লটকে দেয় ফাঁসীতে! পুবাকাশ কিছুটা ফর্সা হয়ে আসতেই শুরু হলো ঘরে ঘরে তল্লাশির কাজ, নিজে ছুটোছুটি করে তদারক করলেন শেরিফ প্রত্যেকটি দলের কাজ। কিন্তু হায়! কোথায় রবিন হুড! গোটা শহর তোলপাড় করে প্রত্যেকটি বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট-গুদাম তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাশি করেও পাওয়া গেল না রবিন হুডকে।

কি করে পাওয়া যাবে, সে তখন পৌছে গেছে শেরউডে। নেতাকে এতবড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে ফিরে আসতে দেখে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে তাকে প্রিয় অনুচরেরা, মুহুর্মুহ হর্ষধ্বনি দিচ্ছে ধনুক উঁচিয়ে। দু'হাতে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল রবিন লিটল জন আর মাচের গালে।

'ওস্তাদ,' বললো লিটল জন, 'আমার কর্তব্য আমি করেছি। কারাগারে বন্দী থেকে তুমি কষ্ট পাবে, সেটা কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না, তাই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি তোমাকে এই গ্রীনউডের নিচে। এখন তুমি নিরাপদ। আমারও কাজ শেষ। এবার তাহলে বিদায় দাও। তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন···আমি চললাম।'

লিটল জন সত্যিই চলে যাচ্ছে দেখে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো রবিন হুড। ছুটে এসে ওর হাত ধরলো। 'আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না, জন! সেদিন ভারি অন্যায় করেছিলাম আমি, তার জন্যে মনে মনে কষ্টও পেয়েছি অনেক। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, আমাকে মাফ করে দাও, জন। আসলে নেতা হওয়ার যোগ্যতা আমার একটুও নেই। আজ থেকে তুমিই আমাদের নেতা, আমরা সবাই কাজ করবো তোমার নির্দেশ মত।'

রবিনকে কাঁদতে দেখে পানি এসে গেল লিটল জনের চোখেও, দূর হয়ে গেল সমস্ত অভিমান। প্রবল বেগে মাথা নাড়লো সে, 'তা হয় না, ওস্তাদ। তুমিই আমাদের নেতা। তোমার আদেশ তো আর অমান্য করতে পারি না, ঠিক আছে, থাকবো আমি, যাব না। তাছাড়া, ওস্তাদের হাতে দুয়েকটা চড় খেলে কি হয়!···এটা তো অনেকটা আশীর্বাদের মত! কেঁদো না, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি।'

দুই বন্ধু জড়িয়ে ধরলো পরস্পরকে।

ভুঁড়ি দুলিয়ে এগিয়ে এলেন সন্ন্যাসী টাক। 'বাহ্, এই পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে বড়সড় একটা ভোজের আয়োজন করে ফেললে কিন্তু মন্দ হয় না। কি বলো তোমরা?'

'ঠিক আছে,' বললো রবিন। 'আপনি আয়োজন করুন, দুটো হরিণ মেরে নিয়ে আসছি আমি আর লিটল জন।'

মহা ধুমধামের সাথে ভূরিভোজ হলো সেদিন শেরউডে।

খবর চাপা থাকে না, শেরিফের কানে গিয়ে পৌছলো সংবাদঃ মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে রবিন হুড শেরউড জঙ্গলে। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখলেন তিনি রাজার কাছে। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা তো করলেনই, শেষের দিকে উল্লেখ করতে ভুললেন না যে লিটল জনের হাতে রাজার ব্যক্তিগত সীল দেখেই আস্থা স্থাপন করেছিলেন তিনি ওদের ওপর।

চিঠি পড়ে ভয়ানক রেগে গেলেন রাজা রিচার্ড। জ্বলে উঠলো তাঁর নীল চোখ দুটো, লাল হয়ে উঠলো সুদর্শন মুখটা। কল্পনাও করতে পারেননি তিনি এভাবে তাঁকে ঠকাবার স্পর্ধা থাকতে পারে কারো। গুম হয়ে থাকলেন তিনি বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু রাগ বেশিক্ষণ থাকে না সিংহহৃদয় রিচার্ডের। অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেলেন তিনি, এবং দেখে মুগ্ধ হলেন।

'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?' পারিষদবর্গের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, 'ভেবে দেখেছেন, লোকটা তার প্রভুর প্রতি কী আশ্চর্য রকম একনিষ্ঠ? টের পাচ্ছেন, কী রকম

ভালবাসে ওরা রবিন হুডকে? আহা, অমন বিশ্বাসী অনুচর যদি আমি পেতাম! রাজাকে কলা দেখাতেও দ্বিধা করলো না লোকটা প্রিয় নেতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে। নাহ্, সত্যিই, এই রবিন হুড লোকটার সাথে যেমন করে হোক দেখা করতেই হবে আমার। আমি জানতে চাই, কী আছে ওর মধ্যে, যে-জন্যে এমন ভালবাসা, ভক্তি আর আনুগত্য পায় সে মানুষের কাছ থেকে।' মুচকি হাসলেন রাজা যখন মনে পড়লো তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে নিজেদের নেতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাদেরই খুশি হয়ে বিশ পাউণ্ড করে পুরস্কার দিয়েছিলেন তিনি।

কালো সাধুর সঙ্গের সেই পরিচারকটির কাছে জঙ্গল-জীবন এতই ভাল লেগে গেল যে নটিংহামে আর ফিরতে চাইলো না কিছুতেই, রয়ে গেল সে দস্যুদলের সাথে, ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো স্বাধীনচেতা, সত্যিকার মানুষ হিসেবে।

উনিশ

রাজা এলেন শেরউডে

বেশ কিছুদিন পর রবিন হুডের সাথে দেখা করার আশায় রাজা নিজেই চলে এলেন নটিংহাম শহরে। কয়েকজন নাইটকে সাথে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন রাজা, সবুজ মাঠে চরে বেড়ানো হরিণ দেখলেন, বিশাল ওক-ডালের দোলন দেখলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন পাখির মিষ্টি গান শুনে, আমোদিত হলেন বুনো ফুলের গাঢ় সুবাসে–কিন্তু রবিন হুডকে খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা এক টুকরো লিংকন গ্রীনও দেখতে পেলেন না শেরউডের কোথাও।

দিনের পর দিন লোক-লস্কর নিয়ে রাজা যান শেরউডে, দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন রবিন হুডের, ঘুরে ঘুরে বিফল হয়ে ফিরে আসেন নটিংহামে। 'বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার,' বললেন একদিন রাজা। 'শুনেছিলাম এদের চোখ এড়িয়ে জঙ্গলের এইসব রাস্তা দিয়ে একজন ভিখারীরও পার হয়ে যাবার উপায় নেই…কোথায়? গেল কোথায় ওরা? দেখতে পাচ্ছে না আমাদের?'

রাজা জানেন না, আসলে দেখতে ওরা ঠিকই পাচ্ছে; রবিনের কড়া নির্দেশ দেয়া আছে সবার ওপর, যেন রাজার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করে না বসে, যেন আত্মগোপন করে থাকে জঙ্গলের আড়ালে। সিংহ-হৃদয় রাজা রিচার্ডকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে রবিন হুড। প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে হৃদয় জয় করে নিয়েছেন তিনি রবিনের। নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সবাই; বহুবার দলবলসহ রাজাকে আসতে দেখে চট্ করে সরে গেছে ওরা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে, হাসিমুখে দেখেছে রাজার খোঁজাখুঁজি, আওতার মধ্যে পেয়েও একটা তীর পরায়নি কেউ ধনুকের ছিলায়।

একদিন রাজাকে দুঃখ করতে শুনে বুড়ো এক জঙ্গলরক্ষী হেসে বললো, 'এভাবে খোঁজাখুঁজি করে ভুল করছেন আপনি, ইয়োর ম্যাজেস্টি। ওর সাথে দেখা করার অন্য উপায় আছে।'

'তাই নাকি? কি উপায়?'

'খুবই সহজ উপায়, হুজুর। ধনী মোহান্তের ছদ্মবেশে যদি কয়েকটা মালবাহী ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যান, দেখবেন মাটি ফুঁড়ে আপনার চারপাশে হাজির হয়ে যাবে দস্যু রবিনের দলবল।'

কথাটা মনে ধরলো রাজার। এই ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর দারুণ

উৎসাহ। পরদিনই মোহান্তের ছদ্মবেশ পরে নিলেন তিনি, জনা ছয়েক অনুসারীকে পরতে বললেন সন্ন্যাসীর পোশাক; গোটা দুই ঘোড়ার ওপর মালপত্র চাপিয়ে গোপনে রওনা হয়ে গেলেন শেরউডের উদ্দেশে।

জঙ্গলের মধ্যে মাইল তিনেক যেতে না যেতেই বাধা পেলেন তিনি। রাস্তার একটা বাঁক নিয়েই দেখলেন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লিংকন গ্রীনের পোশাক পরা সুদর্শন এক যুবক, হাতে বিশাল এক ধনুক, পিঠে তীর-ভর্তি তূণ। এগিয়ে এসে রাজার ঘোড়ার রাশ ধরলো লোকটা, চকচকে চোখে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখলো তাঁকে, তারপর বিনীত ভঙ্গিতে বললো, 'স্যার মোহান্ত, কিছু যদি মনে না করেন, আমাদের সাথে একটু খাওয়া-দাওয়া করতে হবে আজ আপনাদের।' কথাটা বলেই মাথার ওপর ধনুক তুলে ইশারা করলো লোকটা। সাথে সাথেই চারপাশ থেকে এক কুড়ি প্রাণ-চঞ্চল, বলিষ্ঠ যুবক ঘিরে ধরলো রাজার দলটাকে। এদের মধ্যে বিরাট লম্বা-চওড়া দৈত্যের মত এক লোকের ওপর চোখ পড়তেই চিনতে পারলেন রাজা–লিটল জন।

'শাঁসালো শিকার মনে হচ্ছে, ওস্তাদ!' হাসিমুখে বললো লিটল জন।

যাকে ওস্তাদ সম্বোধন করে এই কথাটা বলা, সেই প্রথম যুবকের দিকে ফিরলেন রাজা, বুঝতে পারলেন, শেষ পর্যন্ত রবিন হুডের দেখা পেয়েছেন তিনি।

'কে তুমি?' গুরু গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন রাজা। 'আমার পথ আটকেছো কেন?'

মোহান্তের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্বের সুর টের পেয়ে একটু চমকে গিয়ে ভাল করে তাঁর চেহারাটা দেখার চেষ্টা করলো রবিন, কিন্তু মস্ত টুপি আর হুড থাকায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না মুখটা। জবাব দিল, 'আমরা এই জঙ্গলেই থাকি, গাছের নিচে ঘুমাই, রাজার হরিণ মেরে খাই। টাকা পয়সার বড়ই অভাব আমাদের, তাই আপনাদের মত ধনী মোহান্ত বা সন্ন্যাসী পেলে আদর করে ডেকে নিয়ে যাই আমাদের আস্তানায়। সেখানে ভোজ খাওয়ানো হয় অতিথিদের, সেইসাথে কিছু চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে; সব শেষে খরচ-খরচা বাবদ আমরা কিছু পেয়ে থাকি। আমার নাম রবিন হুড।'

'কিন্তু আমার কাছে চল্লিশ পাউণ্ডের বেশি যে নেই,' বললেন রাজা। 'রাজা রিচার্ড এসেছেন নটিংহামে, শুনেছো নিশ্চয়ই। তাঁর সম্মানে ভোজ দিয়ে আমার সব টাকা শেষ হয়ে গেছে।'

'রাজাকে সত্যিই ভালবাসেন আপনি? মানেন তাঁকে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি,' বললেন রাজা রিচার্ড। 'মেনেও চলি। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে এক কদম ফেলি না ডাইনে বা বাঁয়ে।'

'ঠিক আছে, এই এক কথায় অর্ধেক টাকা বেঁচে গেল আপনার, স্যার মোহান্ত। বিশটা পাউণ্ড দিলেই চলবে। চলুন, রওনা হওয়া যাক।'

একটু অবাক হলেন রাজা। বললেন, 'রাজাকে ভালবাসি বা তাঁকে মান্য করি, তাতে তোমার কি? তুমি আইন অমান্যকারী দস্যু, তুমি কেন ছেড়ে দেবে অর্ধেক টাকা?'

'চলুন, স্যার মোহান্ত,' হাসি মুখে বললো রবিন। 'চলতে চলতেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো।' মনে মনে গুছিয়ে নিল সে কথাগুলো, 'কঠিন একটা প্রশ্ন করে বসেছেন আজ আপনি আমাকে। আমি অত্যাচারী শেরিফকে মানি না, তার অন্যায়, অবিচার আর দুঃশাসনে বাধ্য হয়েছি আমরা আইন অমান্য করতে। গরীবের রক্তচোষা, নীচ, ধনী, লোভী ধর্ম-ব্যবসায়ীদের আমি পছন্দ করি না, তাদের টাকা কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিই গরীব-দুঃখীদের মধ্যে, তাই আমি দস্যু। যাদেরই স্বার্থহানি ঘটছে তারাই আমাকে আইন অমান্যকারী দস্যু বলছে। বলুক। তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। কিন্তু আমি নিজের মনের মধ্যে জানি, এদেশে অন্যায় অবিচার অত্যাচার যদি না

থাকতো, দস্যু হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না আমার। রাজার দোষ দিই না আমি, রাজাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি–রাজ্যের খুঁটিনাটি সব কাজ তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, লোক দিয়ে করাতে হবে; সেই লোকগুলো যদি খারাপ হয়, রাজার খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। আমাদের রাজা নিশ্চয়ই চান না তাঁর প্রতিনিধিরা নির্যাতনে জর্জরিত করে তুলুক জনসাধারণকে। কিন্তু এদের মজ্জায় ঢুকে গেছে দুর্নীতি, হুট করে একদিনেই শুধরে দেয়া যায় না সবার অন্তর; এদের নিয়েই চলতে হবে তাঁকে। এদিক থেকে আমি রাজার চেয়েও অনেক স্বাধীন। এদের ওপর আঘাত হানতেও দ্বিধা করছি না, রাজাকে ভালবাসতেও আমার বাধছে না কোথাও। আমাদের মহান রাজা রিচার্ডকে যে সত্যিই ভালবাসে, সে অন্যায় করতে পারে না, সেজন্যে তার কাছ থেকে বেশি টাকা আদায় করার কোন দরকার নেই আমার; শুধু খরচ বাবদ বিশটা পাউণ্ড রাখবো আমরা আপনার কাছ থেকে।' আশ্চর্য সুন্দর একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো রবিনের মুখে। বললো, 'আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে পেরেছি, স্যার অ্যাবট?'

অবাক হয়ে রবিনের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন রাজা রিচার্ড, কোন জবাব দিলেন না, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্যে। এ কী কথা শুনছেন তিনি সাধারণ এক দস্যুর মুখে? এই লোক দস্যু, না দার্শনিক? এসব কথার আর কোন জের টানলো না রবিন, আস্তানায় পৌঁছেই শিঙা বাজিয়ে সবাইকে ডেকে উৎসব আর ভোজের আয়োজন করার নির্দেশ দিল।

রাজা দেখলেন, সবাই এসে হাঁটু ভাঁজ করে সৌজন্য প্রকাশ করছে নেতার প্রতি, প্রত্যেকের চেহারায় ফুটে রয়েছে সপ্রতিভ একটা ভাব, সেই সাথে চোখে-মুখে উজ্জ্বল বুদ্ধির দীপ্তি। কই, দূর থেকে এদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন বা ভেবেছিলেন তা তো নয় এরা! সেনা বাহিনীর শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা··· কোনটারই তো অভাব দেখা যাচ্ছে না এদের মধ্যে।

যথেষ্ট সম্মানের সাথে গ্রীনউড গাছের নিচে সবুজ ঘাসের উপর সতরঞ্চি পেতে বসানো হলো অতিথিদের। এদের কুস্তি, লাঠি আর তলোয়ার খেলা দেখে মুগ্ধ হলেন রাজা। এবার শুরু হলো তীর-ধনুকের খেলা। বহুদূরে একটা লাঠি গেড়ে তীরন্দাজদের আদেশ দিল রবিন সেটা চিরে দেখাতে। তারপর আরো দূরে একটা লতাপাতা আর ফুলের তৈরি মালা ঝুলিয়ে দেয়া হলো ওকের শাখায়, ফুল বা পাতা স্পর্শ না করে তীর লাগাতে হবে মালার ভেতর।

'সর্বনাশ!' বললেন রাজা রিচার্ড, 'দেখছি অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করছো তোমরা! আমার মনে হচ্ছে টার্গেটটা পঞ্চাশ কদম কাছে টাঙানো উচিত ছিল।'

'সহজ টার্গেট প্র্যাকটিস করে কি লাভ?' হাসলো রবিন। 'অতদূরেই দেখবেন ঠিক লক্ষ্য-ভেদ করবে এরা। চড়ের ভয় আছে না?'

'চড়ের ভয়? মানে?'

'তিনটে করে তীর ছুঁড়বে প্রত্যেকে। একটা তীর যার মালার বাইরে লাগবে প্রচণ্ড এক থাবড়া খেতে হবে তাকে।'

'এই ধরনের শাস্তির ফলে তোমার লোকজনের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না?'

'হতে পারতো,' হাসলো রবিন। 'কিন্তু হয় না। আসলে এটাকে খোদার মার মনে করে এরা।'

'কি রকম?'

'চাপড়টা খেতে হয় আমাদের হোলি ফাদার সন্ন্যাসী টাকের হাতে। এতে কেউ কিছু মনে করে না। ফাদার টাক, তৈরি হয়ে দাঁড়ান, শুরু হচ্ছে খেলা।'

প্রথমে তীর ছুঁড়লো ডংকাস্টারের ডেভিড। তিনটে তীরই জায়গা মত বিঁধলো।

বাহ্, ভাল মেরেছো ডেভিড!' বললো রবিন। 'রোজ তোমাকে দিয়েই শুরু হয়, আজ বড় বাঁচা বেঁচে গেলে!' এরপর মারলো মিজ দ্য মিলার। সে-ও উতরে গেল সহি সালামতেই। এরপর মাচের পালা; দুটো তীর ঠিকমতই লাগলো, কিন্তু তৃতীয় তীর লাগলো গিয়ে মালার বাইরে। অপরাধীর ভঙ্গিতে সন্ন্যাসী টাকের সামনে এসে দাঁড়ালো মাচ, চোখ-মুখ এমন ভাবে কুঁচকে রেখেছে, যেন এখনই ভোঁ-ভোঁ করছে কানটা। আস্তিন গুটালো সন্ন্যাসী টাক, পেশীবহুল হাতটা দেখে মনে হচ্ছে যেন জায়গায় জায়গায় গিঁঠ পড়া প্রাচীন ওকের গুঁড়ি। চড়াৎ করে পড়লো চড়। কয়েক ডিগবাজি খেয়ে উঠে বসলো মাচ ঘাসের উপর, এক হাতে কান ডলছে, মিটমিট করছে চোখ, দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র আকাশ থেকে পড়েছে সে, কোথায় পড়েছে জানে না। হো হো করে হেসে উঠলো সবাই।

হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল রাজার। একের পর এক আসছে তীরন্দাজ, কেউ বেকসুর খালাস পাচ্ছে, কেউ বা থাবড়া খেয়ে গড়াচ্ছে মাটিতে। কপাল খারাপ লিটল জনের, প্রথম তীরটাই তার আজ হঠাৎ হাত খানেক বাইরে গিয়ে পড়লো মালা থেকে। তীর-ধনুক ফেলে পালাবার তাল করছিল লিটল জন, সবাই মিলে ঠেসে ধরে নিয়ে এলো ওকে সন্ন্যাসী টাকের সামনে। অতবড় দৈত্যটা যখন চড় খেয়ে সটান শুয়ে পড়লো মাটিতে, হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই। সবশেষে রবিনের পালা। সবাই জানে, কোনদিন হয়নি, আজও একটা তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না রবিনের। কিন্তু তারও তৃতীয় তীরটা যখন কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মালার এক ইঞ্চি বাইরে লাগলো, তুমুল হর্ষধ্বনিতে কেঁপে উঠলো জঙ্গল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, হাসতে হাসতে বসে পড়লো, যারা বসে ছিল তারা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে হাসির দমকে।

যুক্তিতর্ক দেখাবার চেষ্টা করলো রবিন, বোঝাবার চেষ্টা করলো যে ক্রুটি ছিল তীরটায়, কিন্তু কে শোনে কার কথা, ঠেসে ধরে নিয়ে আসা হলো তাকে সন্ন্যাসী টাকের সামনে।

'যদি খোদার তরফ থেকে শাস্তি পেতেই হয়,' বললো রবিন হাসতে হাসতে। 'ধর্মীয় পোশাক পরা আরো মানুষ আজ উপস্থিত আছেন এখানে, আমাকে অন্ততঃ বাছাই করার সুযোগ দেয়া উচিত। আমার শাস্তিটা আমি স্যার মোহান্তের হাত থেকে নিতে চাই।'

'ওসব ধানাই-পানাই ছাড়ো, বৎস!' হাতের তালুতে খানিক থুতু দিয়ে দুই হাত ঘষে নিল সন্ন্যাসী টাক। 'লক্ষ্মী ছেলের মতো এখানে এসে দাঁড়াও। ওই মোটা মোহান্ত কি মারবে? চড় মারতে গিয়ে নিজের হাতটাই ভেঙে বসবে শেষে। ও তো ননীর পুতুল!'

'অত বড়াই করো না, ফ্রায়ার,' বললেন রাজা রিচার্ড। 'তোমার চেয়ে কম জোর নেই আমার গায়ে।'

'বলে কি ব্যাটা!' বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো সন্ন্যাসী টাক। 'তোমার চড় খেলে আমি তো টেরই পাব না মেরেছো কি মারোনি।'

'তাই নাকি!' উঠে দাঁড়ালেন রাজা। 'বেশ তো, দেখা যাক তুমি আমাকে মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়াতে পারো, নাকি আমি পারি তোমাকে।'

'আগে আমাকে মারতে দেবে তো?' উদগ্রীব কণ্ঠে জানতে চাইলো সন্ন্যাসী টাক।

'বেশ, তুমিই মারো আগে।'

খুশিতে বাগে বাগ হয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী টাক। ছদ্মবেশী মোহান্ত এসে দাঁড়ালেন তার সামনে। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ালো আর সবাই মজা দেখার জন্যে। দড়াম করে প্রাণপণ শক্তিতে মারলো সন্ন্যাসী টাক। আশ্চর্য! যেমন ছিলেন, পাথরের

মূর্তির মত তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন মোহান্ত–মাথা থেকে টুপিটা শুধু ছিটকে গিয়ে পড়লো বিশ গজ দূরে।

হৈ-হৈ করে উঠলো সমস্ত লোকজন, পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো প্রশংসায়। এই প্রথম একজন লোক সন্ন্যাসী টাকের ভয়ংকর চাপড় খেয়েও দু'পায়ে খাড়া রইলো। হাঁ হয়ে গেছে সন্ন্যাসী টাকের মুখটা। 'এবার আমার দান, ব্রাদার,' বললেন মোহান্ত। বিনা বাক্য ব্যয়ে সামনে এসে দুই পা ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী টাক।

রাজা যখন আস্তিন গুটালেন, তাঁর হাতের থোকা থোকা পেশী দেখে বিস্ময়ের গুঞ্জন

উঠলো সবার মধ্যে। চাপড় যখন পড়লো, বাজ পড়লো যেন–চড়াৎ আওয়াজের সাথে সাথেই বিশাল মোটা সন্ন্যাসী টাক তিন ডিগবাজি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়লো মাটিতে। হা হা করে হেসে উঠলো সবাই, বিশেষ করে যারা এতদিন সন্ন্যাসী টাকের হাতে চাপড় খেয়েছে তাদের আন্তরিক উল্লাসে কোন খাদ নেই–আনন্দে নাচতে শুরু করেছে তারা। হাসি নেই শুধু রবিনের মুখে।

'এবার তুমি এসো,' তর্জনী নেড়ে ডাকলেন রাজা রবিনকে।

'কি ভুলটাই যে করলাম!' বিড়বিড় করে বললো সে। 'এ দেখছি হোলি ফাদারের চেয়ে দ্বিগুণ ভয়ংকর!' মোহান্তের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ-মুখ বিকৃত করে ফেললো সে। 'বাবা রে…!'

শরীরটাকে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মারলেন রাজা। এতই জোরে মারলেন যে তাঁর মাথার হুডটা সরে গেল পিছনে। বলা বাহুল্য, ততক্ষণে ঘাসের উপর সটান শুয়ে নিজের দৈর্ঘ্য মাপছে রবিন হুড। উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলো চারপাশে। হো হো করে হাসছে সবাই, কিন্তু কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না ও। চোখের সামনে ঝিলমিল করছে অসংখ্য নক্ষত্র। কানটা একবার ছুঁয়ে দেখলো সত্যিই ওটা জায়গা মত আছে কিনা। তারপর উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণে অনুচরদের হাসির আওয়াজ কিছু কিছু কানে আসছে তার।

স্যার মোহান্তের দিকে চাইলো রবিন। অপূর্ব সুন্দর দেখতে মানুষটা, নীল চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায় দুর্দান্ত সাহস রয়েছে এঁর বুকে, ঠোঁটের কোণে লেগে রয়েছে ছোঁয়াচে হাসি–দেখলে হাসি এসে যায় নিজের মুখেও। অবাক হয়ে ভাবলো সে, এই রকম একজন সুপুরুষ কি সত্যিই কোন মঠের মোহান্ত হতে পারে? আরও অবাক হলো সে, যখন দেখলো ছুটে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে লিটল জন স্যার মোহান্তের সামনে।

'ক্ষমা, ক্ষমা চাই, হুজুর!' বলছে লিটল জন।

'কিসের ক্ষমা, লিটল জন?' এগিয়ে এলো রবিন। 'তোমার শাস্তি তো হয়ে গেছে সন্ন্যাসী টাকের হাতেই। আবার এঁর হাতে চাপড় খেতে হবে, সেই ভয় পাচ্ছো? না, না, সে-ভয় নেই।'

রবিনের কথা লিটল জনের কানে ঢুকলো কিনা বোঝা গেল না, আবার চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'আমাদের সবার হয়ে ক্ষমা চাইছি আমি, মাই লর্ড!'

ওর এই বিচিত্র ব্যবহারে অবাক হলো সবাই। বোকা হয়ে চেয়ে রয়েছে লিটল জন আর মোহান্তের দিকে। হঠাৎ দেখা গেল ঘোড়ায় চেপে এইদিকেই আসছেন লী-র স্যার রিচার্ড। কাছাকাছি এসেই মোহান্তকে দেখে রাশ টেনে ঘোড়া থামালেন তিনি, তারপর এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন লিটল জনের পাশে।

'মহামান্য রাজার অনুগত নাইটের প্রতি কোন আদেশ থাকলে শুধু মুখে একটু উচ্চারণ করুন, মাই লর্ড! আপনার যে-কোন আদেশ আমার শিরোধার্য!'

'রাজা!' অবাক হয়ে গেল রবিন হুড।

'সত্যিই তো!' চেঁচিয়ে উঠলো মাচ, 'ইনিই তো মহামান্য রাজা রিচার্ড!'

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে রাজা রিচার্ডের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো রবিন, দেখাদেখি তার সাতকুড়ি অনুচর। মাথা হেঁট করে বললো রবিন, 'আপনার দয়া প্রার্থনা করছি আমি, মহামান্য লর্ড! আমাদের সবার হয়ে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি!'

'বেশ। ক্ষমা করে দিলাম,' বললেন রাজা রিচার্ড। 'তোমাদের মত সাহসী, সুশৃঙ্খল একদল যুবককে আবিষ্কার করবো এখানে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কি বলো, রবিন হুড? তোমার লোকজন নিয়ে যোগ দেবে আমার সেনাদলে? তোমাদের পেলে আমি খুবই খুশি হবো।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, ইয়োর ম্যাজেস্টি,' বললো রবিন হুড। 'আজ থেকে

আমরা যোগ দিলাম আপনার সশস্ত্র বাহিনীতে। আশা করি, আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে সন্তুষ্ট করতে পারবো আপনাকে।'

সবাই সমস্বরে সমর্থন করলো রবিনের ঘোষণা।

'বেশ,' হাসলেন রাজা। 'কিন্তু তোমাদের ভোজের কতদূর? খিদেয় যে নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে!' রবিনকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে বললেন, 'আর শোনো, এই পুরোহিতের পোশাক বড়ই বিচ্ছিরি লাগছে, বাড়তি লিংকন গ্রীন আছে তোমাদের কাছে?'

'অনেক, অনেক আছে, মাই লর্ড! আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।'

ছুটলো রবিন। জঙ্গলের সবুজ রঙের পোশাক পরানো হলো রাজাকে, দারুণ লাগছে দেখতে। দস্তরখান বিছানো হতেই খেতে বসলো সবাই মিলে। পেট পুরে খেলেন রাজা, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন ওদের প্রিয় অক্টোবর এল-এর। খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো রাজার। মুগ্ধ হয়ে গেলেন রাজা অ্যালান-এ-ডেলের অপূর্ব কণ্ঠে প্রেম, বীরত্ব আর মহিমার গান শুনে।

বিকেলে রাজার পিছন পিছন জয়ধ্বনি দিতে দিতে রওনা হয়ে গেল সবাই নটিংহামের দিকে।

শেরিফ প্রথমে ভেবেছিলেন, রাজাকে হত্যা করে নটিংহাম শহর দখল করে নিতে আসছে রবিন হুড তার দলবল নিয়ে। যখন আসল ঘটনা জানলেন, মুখটা কালো হয়ে গেল তাঁর রবিন হুডের সাথে রাজার সখ্যতা দেখে। সেই রাতে মস্ত এক ব্যাংকোয়েটের আয়োজন করলেন রাজা রিচার্ড শেরউডের দস্যুদের সম্মানে। চমৎকার খাওয়াদাওয়া হলো। অ্যালান-এ-ডেলের গান শুনে পানি এসে গেল নিষ্ঠুর শেরিফের চোখেও। ছোট্ট একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপাধি দেয়া হলো রবিন হুডকে—আর্ল অফ হান্টিংডন।

দলবল সহ চলে গেল রবিন হুড রাজার সাথে লণ্ডনে।

বিশ

রবিনের শেষ তীর

রাজা রিচার্ডের সাহচর্যে কিছুদিন পরমানন্দে কাটলো রবিনের। তারপর আবার দেশের বাইরে গেলেন রাজা। রাজ্য শাসনের ভার পড়লো রাজার ছোট ভাই যুবরাজ জনের ওপর। এই লোকটাকে মোটেই পছন্দ করতে পারলো না রবিন হুড। ফলে রাজ-দরবার আর ভাল লাগে না ওর, কেমন অস্বস্তি আর ফাঁপর লাগে। নীচমনা, ভীরু, নিষ্ঠুর শাসকের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া সবার পক্ষে সহজ হয় না।

শাসনভার হাতে পেয়েই সিংহাসনটা দখল করে নেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়লেন যুবরাজ জন। রবিন হুডের কাছে দূত পাঠালেন ওকে বাজিয়ে দেখার জন্যে, রাজা রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপারে দলবল সহ রবিন হুড তাঁকে সাহায্য করবে কিনা জানতে চাইলেন। বলাই বাহুল্য, রবিন হুডের প্রত্যাখ্যান চটিয়ে দিল জনকে, ভয়ানক তিক্ততার সৃষ্টি হলো দুজনের সম্পর্কে।

একদিন অপূর্ব সুন্দর এক মে-সকালে লণ্ডনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রিয় শেরউডের কথা মনে পড়তেই খচ্ করে কাঁটা বিঁধলো রবিনের বুকে। কী জীবন ছিল সেটা! দীর্ঘশ্বাস ফেললো রবিন, ভাবলো, আর কি জীবন এই ইঁট পাথরের লণ্ডনে! ফিনসবারি ময়দানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো সে। কয়েকজন যুবক শূটিং প্র্যাকটিস করছে। অনেকদিন পর ধনুকের টঙ্কার শুনে বুকের ভেতরটা টন

টন করে উঠলো অব্যক্ত বেদনায়। কতদিন শোনেনি সে এই মিষ্টি আওয়াজ! ঠিক করলো, কিছুদিনের জন্যে হলেও শেরউডে যেতে হবে ওকে। যেমন করে হোক।

বাড়ি ফিরে এসে কথাটা বলতেই আনন্দে নেচে উঠলো মেরিয়ান। লিটল জন আর উইল স্কারলেটকে ডেকে নিজের ইচ্ছের কথা জানালো রবিন। দুই কানে গিয়ে ঠেকলো ঢ্যাঙা দৈত্যের হাসি, উইল স্কারলেটও এক পায়ে খাড়া। পরদিনই খুব ভোরে লণ্ডন ছেড়ে চুপিচুপি রওনা হয়ে গেল ওরা চারজন কাউকে কিচ্ছু না বলে। কারণ, যুবরাজ জনের কানে গেলে বাধা দেবেন তিনি। রাজার অনুপস্থিতিতে সীমাহীন ক্ষমতা তাঁর হাতে।

জঙ্গলে পৌছে ওদের আনন্দ আর ধরে না। বুনো পথ ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে হরিণের দল, গাছের ডালে বসে মনের সুখে গাইছে পাখি মুক্ত, স্বাধীন গান; সূর্যটাও যেন জ্বল-জ্বল করছে এখানে দ্বিগুণ তেজে। সেই গ্রীনউড গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো ওরা। কী শান্তি!

কয়েকটা দিন যেন হাওয়ায় ভেসে কেটে গেল, মনের সুখে শিকার করছে ওরা তিনজন, রান্না করে তাজা হরিণের মাংস খাওয়াচ্ছে ওদের মেরিয়ান। শেরউড ছেড়ে আবার লণ্ডনে ফিরে যাবার কথা ভাবলেই খিঁচড়ে উঠছে ওদের মন। এমনি সময় হঠাৎ একদিন দেখলো ওরা কে যেন দৌড়ে আসছে ওদের আস্তানার দিকে। কাছে আসতেই চেনা গেল লোকটাকে—মাচ।

'দুঃসংবাদ, ওস্তাদ!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মাচ। 'সাবধান! রাজা রিচার্ড মারা গেছেন ফ্রান্সে। রাজা হয়েছে কাপুরুষ জন।'

'এহ্-হে!' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো রবিন, 'দেশটা উচ্ছন্নে যাবে এবার! বিশেষ করে আমার জন্যে এটা সত্যিই ভয়ানক দুঃসংবাদ।'

'ঠিক বলেছো,' বললো মাচ। 'আমি খবর নিয়ে এসেছি, রাজা হওয়ার পর জনের প্রথম আদেশ হচ্ছে, যেখান থেকে পারো, ধরে নিয়ে এসো রবিন হুডকে।'

'হুম!' ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো রবিন, তারপর হাসলো। 'আবার আমি শেরউডের দস্যু হয়ে গেলাম। আবার আমি দস্যু রবিন হুড! আবার আমি মুক্ত, স্বাধীন—জঙ্গলের রাজা! তোমাদের যার খুশি যোগ দিতে পারো আমার সঙ্গে।'

খুশিতে লাফিয়ে উঠে তাক-ধিনাধিন নাচ শুরু করে দিল লিটল জন। উইল স্কারলেট আর মাচের অবস্থাও তথৈবচ। বেশিদিন লাগলো না, খবর পেয়ে একে একে সব চেনা মুখ ফিরে এলো রবিন হুডের কাছে। আবার জমজমাট হয়ে উঠলো শেরউড আগের মত।

কিন্তু আগের সেই শান্তি ফিরে এলো না আর। একের পর এক সৈন্যদল পাঠাতে শুরু করলেন রাজা জন, জেদ চেপে গেছে তাঁর, রবিন হুডকে শায়েস্তা করা তাঁর চাই-ই। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো বছরের পর বছর। কখনও জিতছে রবিনের দল, কখনও রাজার সেনাবাহিনীর সামনে টিকতে না পেরে বাধ্য হচ্ছে পিছু হটতে, রাজার অসংখ্য সৈন্য মারা পড়লো, প্রাণ দিল রবিনের অনেক বিশ্বস্ত অনুচর; কিন্তু পরাজয় মানলো না ওরা কিছুতেই। বীরের মত লড়াই করে চললো ওরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অবশেষে একদিন খবর এলো, মারা গেছেন রাজা জন। গোটা ইংল্যাণ্ড খুশি হয়ে উঠলো নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজার মৃত্যুতে, সবচেয়ে বেশি খুশি হলো শেরউডের দস্যুরা। কিছুটা শান্তি আসবে এবার ওদের জীবনে। কিন্তু কই, সেই আনন্দ তো আর ফিরে আসছে না!

কেমন যেন বদলে গেছে রবিন। হাসি নেই ওর মুখে। অনেক ঘনিষ্ঠ সহচর এখন চির বিশ্রাম নিচ্ছে মাটির নিচে,ওর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে নেই মেরিয়ানও—রজার নামের এক গুপ্তঘাতক লেস, ফিতে আর আংটি বিক্রি করতে এসে ছুরি মেরে খুন করেছে ওকে। প্রতিশোধ অবশ্য নিয়েছে সে, কিন্তু মনটা ভেঙে গেছে রবিনের। কোনো কাজে আর মন বসে না ওর। কিছুই ভাল লাগে না। শেষে একদিন দল ভেঙে দিল সে।

এদিক-ওদিক কাজ জুটিয়ে নিয়ে একে একে চলে গেল সবাই। কিন্তু রবিনকে ছেড়ে কিছুতেই কোথাও গেল না লিটল জন। জঙ্গল থেকে হরিণ মেরে আনে সে, রান্না করে নিজে খায়, জোর-জুলুম করে রবিনকে খাওয়ায়। কিছু খাওয়ার রুচিও নষ্ট হয়ে গেছে রবিনের।

শরীর ভেঙে গেল রবিনের। বুঝতে পারলো সে, আগের সেই জোর আর নেই গায়ে, বিশাল ধনুকটা টেনে বাঁকা করতে রীতিমত কষ্ট হয় আজকাল, আগে যতদূর যেত ততদূরে যায় না তীর। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো রবিন। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, লিটল জনও বার বার করে বলছে, রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে, চিকিৎসা দরকার। মনে পড়লো, শেরউডের কাছেই কার্কলির মঠে থাকে ওর এক দূর সম্পর্কের বোন, চিকিৎসা-বিদ্যার অনেক কলা-কৌশল জানা আছে তার। লিটল জনকে ডেকে একদিন বললো রবিন, 'ঠিক আছে, জন, তুমি যখন এত করে বলছো, চিকিৎসা করাবো আমি। কাল ভোরে উঠে চলে যাব কার্কলির মঠে।'

পরদিন রওনা হয়ে গেল রবিন। অনেকটা পথ গিয়ে পা আর চলতে চায় না। এতটা দুর্বল হয়ে গেছে শরীর, টের পায়নি ও আগে। একবার ভাবলো শিঙায় ফুঁ দিয়ে ডাকবে লিটল জনকে, কিন্তু খানিক বিশ্রাম নিয়ে যখন কিছুটা শক্তি ফিরে পেলো, তখন একাই রওনা দিল আবার। বহুকষ্টে পৌঁছলো সে কার্কলির মঠে।

কতবড় শত্রুর হাতে নিজের চিকিৎসার ভার সঁপে দিতে এসেছে সে, জানে না রবিন। খুবই আদর-যত্নের ভান করলো ওর বোন, মঠের দোতলায় একটা ঘর ছেড়ে দিল ওর জন্যে। আশ্বাস দিল—কোন চিন্তা নেই, শরীর থেকে খানিকটা দূষিত রক্ত বের করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে যখন শিরা কাটবার জন্যে ছুরি নিয়ে হাজির হলো ওর বোন, সরল বিশ্বাসে হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। রবিনের ওপর তার কিসের রাগ, কেন এই চরম শত্রুতা করতে গেল মহিলা, কি কারণে প্রতিহিংসার আগুনে

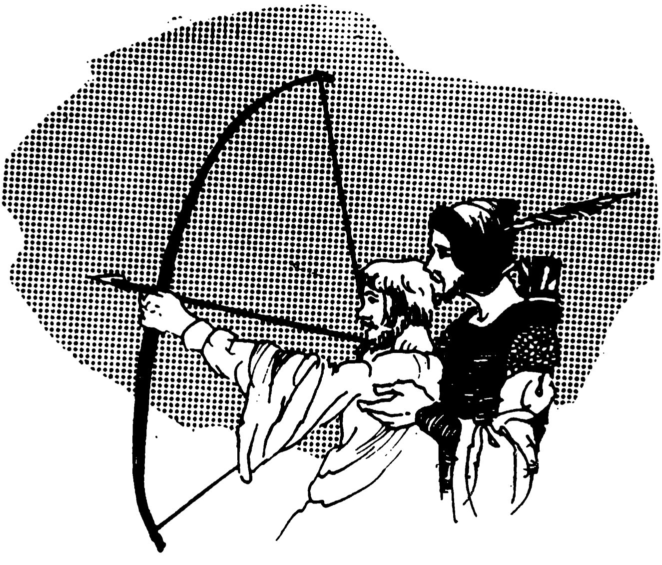

জ্বলছিল সে, কেউ জানে না–ঘ্যাচ করে কেটে দিল সে রবিনের হাতের শিরা। রক্ত ঝরতে শুরু করলো দরদর করে। নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে, দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, যাবার সময় দরজাটা আটকে দিতে ভুললো না। রক্ত ঝরছে তো ঝরছেই, ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়লো রবিন। হঠাৎ তার মনে হলো, এতক্ষণ ধরে গেছে, এখনও ফিরে আসছে না কেন তার বোন? ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া গেল না কারও। অবশেষে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে গিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করেই বুঝতে পারলো সে সব। বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হয়েছে দরজায়। অনেক ধাক্কাধাক্কি করলো সে দরজার গায়ে, অনেক ডাকাডাকি করলো, কিন্তু কেউ এলো না। নির্জন ঘরে অসহায় অবস্থায় ওকে অবধারিত মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে সরে পড়েছে ওর বোন।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না রবিন। শুয়ে পড়লো মেঝেতে। শরীরের রক্ত নিঃশেষ হয়ে এসেছে প্রায়, মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্যে। অনেক কষ্টে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে জানালার কাছে গিয়ে পৌঁছলো, জানালাটা খুললোও, কিন্তু লাফিয়ে নিচে নামার শক্তি নেই। তবে একটা জিনিস আছে এখনও ওর কাছে–বিপদের বন্ধু সেই শিঙাটা। কতবার কত বিপদে এই শিঙার ডাক শুনে ছুটে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে ওর বিশ্বস্ত সহচরেরা। কাছাকাছিই জঙ্গলে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে লিটল জন, জানে রবিন। শিঙাটা মুখে তুলে তিনটে ফুঁ দিল তাতে। অত্যন্ত দুর্বল ভাবে বাজলো শিঙা, ফুঁ দেয়ার শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে ওর।

কিন্তু সজাগ ছিল লিটল জন, রবিনের শিঙার দুর্বল আওয়াজ পৌঁছলো তার কানে। 'ব্যাপার কি! এত আস্তে আওয়াজ কেন!' বলেই প্রাণপণে দৌড় দিল সে মঠের উদ্দেশে।

মঠে পৌঁছে হলঘরের দরজায় দমাদম ঘুসি মারলো লিটল জন। ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে লাথি মারলো, কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না। কিছুক্ষণ দরজা পিটিয়েই বুঝে ফেললো সে, কেউ খুলবে না দরজা, কিছু একটা চক্রান্ত রয়েছে এর পেছনে। কিভাবে ভেতরে ঢোকা যায় দেখার জন্যে একটু সরে এলো পিছনে। জানালা দিয়ে ঢোকা যাবে না; একে ছোট, তার ওপর লোহার শিক দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়েছে ওগুলোকে। উঠানে মস্ত একটা ওক গাছের গুঁড়ি দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। দু'জন লোকের পক্ষে যেটা উঁচু করা কষ্টকর, হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল সেটা লিটল জন। প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল ওটা দিয়ে দরজার গায়ে। দড়াম করে খুলে গেল বিশাল দরজা, কব্জা থেকে খুলে ছিটকে পড়লো হলঘরের মাঝখানে। 'রবিন! রবিন!' হাঁক ছাড়লো সে, 'কোথায় তুমি, ওস্তাদ?'

উত্তর শুনতে পাবার আশায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে কিছুক্ষণ, কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। আবার আরও জোরে ডাকলো সে। এবার মনে হলো দোতলা থেকে যেন ক্ষীণ একটা উত্তর ভেসে এলো। কয়েক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতলায় উঠে এলো লিটল জন, আবার শুনতে পেল রবিনের ক্ষীণ কণ্ঠ। ছুটে গিয়ে দড়াম করে লাথি দিয়ে খুলে ফেললো সে তালা-মারা দরজাটা।

ঘরের ভেতর একনজর চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল লিটল জনের। রক্তের গঙ্গা বইছে মেঝেতে। 'কি ব্যাপার, রবিন? এত রক্ত কেন? কিসের চিকিৎসা–তোমাকে খুন করছে এরা!'

দুর্বল ভাবে মাথা ঝাঁকালো রবিন হুড। 'হ্যাঁ, লিটল জন। মেরে ফেললো···সময় ঘনিয়ে এসেছে ···আমি চলে যাচ্ছি।'

হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো লিটল জন তার প্রভুর পাশে। কাঁপা গলায় বললো, 'চলে যাচ্ছো? তাহলে যাবার আগে শুধু একটা কাজের অনুমতি দিয়ে যাও আমাকে, ওস্তাদ!'

'কিসের অনুমতি, লিটল জন?'

'জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চাই আমি এই মঠ, নিজ হাতে খুন করতে চাই পিশাচিনীটাকে!'

দুর্বল ভাবে মাথা নাড়লো রবিন। 'এ অনুমতি আমি দিতে পারি না, জন। মনে নেই আমাদের শপথের কথা? স্ত্রীলোকের কোনো ক্ষতি করবো না আমরা।' ম্লান হাসলো সে, 'আমার ধনুকটা একটু দেবে আমার হাতে, লক্ষ্মী জন?'

কোন প্রশ্ন না করে রবিনকে উঁচু করে তুলে ধনুকটা ধরিয়ে দিল লিটল জন ওর হাতে।

'একটা তীর!' হাত বাড়ালো রবিন।

নিজের তূণ থেকে বের করে একটা তীর দিল লিটল জন রবিনের হাতে।

'জানালার কাছে নিয়ে চলো আমাকে।' ধরে ধরে জানালার কাছে নিয়ে এলো লিটল জন রবিনকে। রবিন বললো, 'ওই দেখো, জন, আমাদের শেরউড জঙ্গল দেখা যায়। শেষ একটা তীর ছুঁড়ব আমি। তীরটা যেখানে পড়বে, ঠিক ওইখানে কবর দিয়ো আমাকে।'

দু'চোখ ভরে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে রবিন শেরউডকে। দুলছে বিশাল ওকের শাখা, যেন হাতছানিতে ডাকছে ওকে—আয়, রবিন, আয়। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে শেষ তীরটা ছুঁড়লো রবিন। ছিলার টংকার শুনে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে শেরউডের দিকে। অনেক, অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'কী সুন্দর ছিল আমাদের জীবনটা; তাই না, জন? কত মজা করেছি আমরা একসাথে! শোনো, গভীর করে খুঁড়ো কিন্তু কবরটা, ঠিক যেখানে তীরটা গিয়ে বিঁধবে, সেইখানে। সবুজ একটা ঘাসের চাপড়া দিয়ো আমার মাথার নিচে, আর···আর আমার এই ধনুকটা শুইয়ে দিয়ো পাশে।' একটি কথাও বলতে পারলো না লিটল জন, মাথা ঝাঁকালো কেবল। ফোঁপাচ্ছে ও, চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না চোখের পানি।

বুকের ভেতর কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে রবিনের, কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, 'শেষ একটা কথা ঃ কেঁদো না, লক্ষ্মী জন···তোমাকে···তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পেয়েছিলাম আমি—সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

প্রাণাধিক বন্ধুর বুকে মাথা রেখে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো রবিন হুড।

—০—